প্রথম আলো
বইমেলা ২০২৩

বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ
সাক্ষাৎকার • আনিসুজ্জামান

অপ্রকাশিত
রফিক আজাদ

প্রেতচর্চায় মনীষী
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় • পরলোক ও রবীন্দ্রনাথ

পৌরাণিক
জয়তী রায় • মহাভারতের শকুন্তলা

কবি ও সমালোচক
শুভ চক্রবর্তী • সঙ্গ নিঃসঙ্গতা

দারোগার দরবার
সৌগত চ্যাটার্জি • পুলিশের ডায়েরি

ভ্রমণ
জবা চৌধুরী • আমার চোখে মাসাইমারা

বিস্মৃত ইতিহাস
স্বর্ণাভা কাঁড়ার • মেরুপ্রদেশের প্রথম বাঙালি

জীবনের জলছবি
জয়ন্ত ঘোষাল • মনের ডায়েরি

সাংবাদিকদের খেলাঘর
গৌতম ভট্টাচার্য • ব্ল্যাকলিস্টেড আপনি

ধ্রুপদী
সত্যম রায়চৌধুরী • মেঘে ঢাকা দিনলিপি

• এক গুচ্ছ কবিতা
সাদাত হোসাইন
আনিসুর রহমান
বীথি চট্টোপাধ্যায়

• গল্প নাসরীন জাহান
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় মাজহারুল ইসলাম
দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত চুমকি চট্টোপাধ্যায়
দীপান্বিতা রায় ভারতী মিত্র

• কবিতা
অরুণকুমার চক্রবর্তী অসীম সাহা জাহানারা পারভিন
মুহম্মদ সামাদ কালীকৃষ্ণ গুহ প্রীতি স্যান্যাল
পঙ্কজ সাহা সেবন্তী ঘোষ পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণতি ঠাকুর তাপস রায় সুজিত ভৌমিক পম্পা দেব
সিদ্ধার্থ সিংহ দীপশিখা পোদ্দার ত্রিদিবেশ চৌধুরী
অঞ্জনা সাহা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
তপনদেব চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়
অমিত কাশ্যপ কনাইলাল জানা অচিন মিত্র
গৌতম ভরদ্বাজ আশিস চৌধুরী মামুন রশিদ
নমিতা চৌধুরী শশাঙ্কশেখর অধিকারী
দেবযানী বসুকুমার শান্তশ্রী চৌধুরী দিলীপ চক্রবর্তী
রুদ্রশংকর অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সমুদ্র বসু
সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় হারিসুল হক বুবুসীমা চট্টোপাধ্যায়
কিশোর ভট্টাচার্য সমরেশ চৌধুরী মৃণালকান্তি দাশ
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশান্ত ভট্টাচার্য
কস্তুরী চট্টোপাধ্যায় দিলীপ সাঁতরা কালিদাস ভদ্র
ধীমান ভট্টাচার্য সুমিত সেনগুপ্ত বিমল মণ্ডল
সুশীল মণ্ডল বিপ্লব পাল সৌমিত্র দেব কৃষ্ণপদ দাস
অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী দিশা চট্টোপাধ্যায় স্বপন শর্মা
জয়তি চ্যাটার্জি সপ্তর্ষি চ্যাটার্জি
অনিন্দিতা বসু সান্যাল সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

দু-হাজার সাত সালের শুরু সেটা। বইমেলা নিয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ। বাঙালি মধ্যবিত্তর মধ্যে শুরু হোলো বিপুল তর্ক বিতর্ক। বইমেলা ময়দানে করা চলবেনা। বা ময়দানে বইমেলা করতে হলে এমন কিছু নিয়ম মানতে হবে যা মেনে মেলা করা কার্যত অসম্ভব। এমনটাই রায় ঘোষণা করল জাতীয় পরিবেশ আদালত।

কলকাতার ফুসফুস ময়দান। তেরোদিন ধরে বইমেলা হলে সেখানে ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। শহরে ছড়াচ্ছে দূষণ। তখনও দূষণ নিয়ে এত সচেতনতা ছড়ায়নি। বায়ুদূষণ যে কত প্রাণঘাতী আর ভয়াবহ হতে পারে তার রূপ তখনও এত প্রকটভাবে আমাদের অনেকের চোখে পড়েনি। তাই বেশিরভাগ মানুষ বইমেলা ময়দানে চাই -- এই দাবিতে মুখর হলেন। অবশ্য শুধু আবেগ নয় যুক্তিও ছিল তাঁদের কথায়। যাঁরা ময়দানে বইমেলা চাইলেন তাঁরা বললেন, কই এত যে রাজনৈতিক ভা হয় ব্রিগেডে তখন কি দূষণ হয়না?

আবার অনেকে বললেন বিদেশেও বইমেলা হয় কিন্তু সেখানে বই বিক্রি হয়না। শুধু খোঁজখবর থাকে বইয়ের বই পছন্দ করে এলে বাড়িতে পৌঁছে যায় সেই বই। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেন্টারে মেলা হয়, সেখানে দূষণের প্রশ্ন নেই। টানা হতে লাগল ফ্রাঙ্কফ্রট বইমেলার তুলোনা। প্রথমসারির কাগজে বইমেলা ও বইমেলার স্বপক্ষে থাকা বাঙালিকে ব্যঙ্গ করে লেখা হতে লাগল দুরন্ত ফিচার, চেনা অচেনা ড্রয়িংরুমে হাসির রোল উঠল সেসব লেখা পড়ে।

ময়দানে বইমেলা হবেনা। নবীন কবি থেকে কলেজের ছাত্রী সবার মুখে মেঘের ছায়া। মিছিল হচ্ছে। লেখালিখি হচ্ছে কিন্তু আদালতের নির্দেশ। হোলোনা বইমেলা। অনেকে বলল, আইনকে হাতিয়ার করে বইমেলার অনেক বিরুদ্ধ লবি কাজ করেছে আড়ালে।

সম্পাদক
বীথি চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক
মোহর চট্টোপাধ্যায়

স্বত্বাধিকারী বীথি চট্টোপাধ্যায়
রাজবাড়ি
১৯ আর, ডোভার প্লেস, ফ্ল্যাট-২এ
কলকাতা-৭০০ ০১৯
মোবাইল : ০৯৮৩০১১৭৪৬৩৫
E-mail : bithirmail@yahoo.com

পরিকল্পনা ও সহায়তা
সত্যম রায়চৌধুরী

বাংলাদেশ প্রতিনিধি
মাজহারুল ইসলামসেলিনা হোসেন

৫০ টাকা

সেবার ময়দানে প্রতীকি উদ্বোধন হোলো বই মেলার। আমরা মঞ্চে উঠলাম। একটা অস্থায়ী মঞ্চে, সুনীলদা, শরৎদা, বিজয়াদি, নবনীতা দেবসেন, মল্লিকা সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকন। সুনীলদা হাঁটু অপারেশন করিয়ে গৃহবন্দী ছিলেন। এলেন হুইল চেয়ারে চেপে। সুনীলদার চেয়ারের একপাশে দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা একপাশে আমি। একজন সুরসিক ব্যঙ্গকার লিখলেন 'দুজন কবি তাঁরা আবার ঘটনা চক্রে মহিলা ও দশাশই তাঁরা কে স্টেজের ফোরফ্রন্টে আসবে সেই নিয়ে গুঁতোগুঁতি করে গেল কারণ প্রতিকী উদ্বোধন চলছে। সব কাগজে ছবি বেরোবে। ' এইরকম ব্যঙ্গ, পাল্টা ব্যঙ্গ। প্রতিবাদের মাঝখানে কেউ কেউ ভাবল আর বইমেলা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবেনা। তার মেরুদন্ড ভেঙে গেছে এবারে।

কিন্তু ময়দান ছেড়ে বইমেলা চলে গেল তবু মানুষ বইমেলাকে ছাড়লনা। পরের বছর মিলনমেলা প্রাঙ্গনের বইমেলায় হোলো রেকর্ড ভিড় চর রেকর্ড বই বিক্রি।

বাঙালি এয়ারকন্ডিশনে ঘুরে বই পছন্দ করতে চায়না। তারা মাঠে ঘুরে ঘুরে ব্যাগে বই কিনে ভরে বাড়ি ফিরতে চায়। এটা নিয়ে তারপর থেকে আর কোনও তর্কের অবকাশই রইলনা।

সূচি

বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ ৫

সাক্ষাৎকার
আনিসুজ্জামান

প্রেতচর্চায় মনীষী ৪৫

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
পরলোক ও রবীন্দ্রনাথ

পৌরাণিক ৪৮

জয়তী রায়
মহাভারতের শকুন্তলা

কবি ও সমালোচক ৫৩

শুভ চক্রবর্তী
সঙ্গ নিঃসঙ্গতা

দারোগার দরবার ৫৭

সৌগত চ্যাটার্জি
পুলিশের ডায়েরি

ভ্রমণ ৫৯

জবা চৌধুরী
আমার চোখে মাসাই মারা

বিস্মৃত ইতিহাস ৬২

স্বর্ণাভা কাঁড়ার
বিশাল মেরু প্রদেশে প্রথম বাঙ্গালী

জীবনের জলছবি ৬৭

জয়ন্ত ঘোষাল
আমার মনের ডায়েরি

সাংবাদিকদের খেলাঘর ৭০

গৌতম ভট্টাচার্য
ব্ল্যাকলিস্টেড আপনি!!

ধ্রুপদী ৭৫

সত্যম রায়চৌধুরী
মেঘে ঢাকা দিনলিপি

একগুচ্ছ কবিতা ৭৮—৯০

সাদাত হোসাইন
আনিসুর রহমান
বীথি চট্টোপাধ্যায়

গল্প ৯১—১১৪

নাসরীন জাহান ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় মাজহারুল ইসলাম দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত
\চুমকি চট্টোপাধ্যায় দীপান্বিতা রায় ভারতী মিত্র

কবিতা ১১৫—১৩৯

অরুণকুমার চক্রবর্তী অসীম সাহা জাহানারা পারভিন মুহম্মদ সামাদ কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রীতি সান্যাল পঙ্কজ সাহা সেবন্তী ঘোষ পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায় প্রণতি ঠাকুর
তাপস রায় সুজিত ভৌমিক পম্পা দেব সিদ্ধার্থ সিংহ দীপশিখা পোদ্দার ত্রিদিবেশ চৌধুরী
অঞ্জনা সাহা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তপনদেব চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়
অমিত কাশ্যপ কনাইলাল জানা অচিন মিত্র গৌতম ভরদ্বাজ আশিস চৌধুরী মামুন রশিদ
নমিতা চৌধুরী শশাঙ্কশেখর অধিকারী দেবযানী বসু কুমার শান্তশ্রী চৌধুরী দিলীপ চক্রবর্তী
রুদ্রশংকর অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সমুদ্র বসু সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় হারিসুল হক
বুবুসীমা চট্টোপাধ্যায় কিশোর ভট্টাচার্য সমরেশ চৌধুরী মৃণালকান্তি দাশ অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রশান্ত ভট্টাচার্য কস্তুরী চট্টোপাধ্যায় দিলীপ সাঁতরা কালিদাস ভদ্র ধীমান ভট্টাচার্য
সুমিত সেনগুপ্ত বিমল মণ্ডল সুশীল মণ্ডল বিপ্লব পাল সৌমিত্র দেব
কৃষ্ণপদ দাস অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী দিশা চট্টোপাধ্যায় স্বপন শর্মা
জয়তি চ্যাটার্জি সপ্তর্ষি চ্যাটার্জি অনিন্দিতা বসু সান্যাল সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

আনিসুজ্জামান
প্রজ্ঞার দ্যুতি

বিদ্বৎসাধনার ক্ষেত্রে অতুলনীয় কীর্তি যাঁর, যাঁর কণ্ঠস্বরে বেজে ওঠে বাংলা ও বাঙালির বিবেক, একজীবনে যিনি পূর্ণতার সাধনায় মগ্ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় আমাদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের স্বরূপ অন্বেষণে আগুয়ান, জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটসন্ধিক্ষণে এগিয়ে এসে যিনি অন্ধকারবাসী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছেন–দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে যাঁর অনন্য ভূমিকা, 'বাংলাদেশ' নামক নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা, নানা সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ–সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের সুপরিচিত ও দক্ষ সংগঠক...। তিনি আনিসুজ্জামান।

সময়ের বাতিঘর হিসেবে গণ্য মহীরুহসম এই মানুষটির নানা কীর্তির ওপর আলো ফেলার তাগিদে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের উদ্যোগ গ্রহণ করে অন্যদিন।

আনিসুজ্জামানের মুখোমুখি হন চারজন স্বনামধন্য মানুষ। তাঁরা হলেন শফি আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মফিদুল হক এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ।

দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। ধারণযন্ত্র থেকে এই সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করেছেন জোবায়দা লাবণী এবং নাদিম মজিদ। সমন্বয়: মোমিন রহমান।

মুক্তিযুদ্ধ

আনিসুজ্জামান অতি সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক তাদের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক উপাধি 'পদ্মভূষণ'–এ ভূষিত হয়েছেন। এই বিরল সম্মাননা লাভ তাঁর একক কৃতিত্ব যদিবা, কিন্তু আমরা সকলেই যেন এর অংশীদার হয়ে উঠেছি। তাঁর এই সম্মান আমাদের জাতীয় অর্জন বলেই পরিগণ্য হয়েছে। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের যে অমিত অনাদি অহংকার, তার সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে অতিক্রম করে অথবা তাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংহত করে আমাদের কপালে এক রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় তিলক জুটেছিল

উনিশ শ' একাত্তর সালে। নয় মাসের এক অকুতোভয় অভূতপূর্ব অসমসাহসী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মধ্য–ডিসেম্বরের এক অপরাহ্নে পশ্চিমের আকাশে সূর্য যখন অস্তাচলে, বাঙালি জাতির এক অবিশ্বাস্য নবজাগরণ ঘটেছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে যাঁরা নেপথ্যে স্বাধীনতাসংগ্রামের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, আনিসুজ্জামান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেসময় মধ্য–তিরিশের এই মানুষটি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন ষাটের দশকে আমাদের দেশে সংস্কৃতিজগতের প্রগতি আন্দোলন, যা হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের বীজতলা। সারা দেশ যেন এক রাজনৈতিক অভিযাত্রায় সামিল, তার অনিবার্য গন্তব্য স্বাধীনতা, তার সঙ্গে নিজেকে বাঙালি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক অদম্য সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত ছিল।

আনিসুজ্জামান সেই দিনগুলির এক বিদগ্ধ ও বিশ্বস্ত সাক্ষী। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। দেশের সীমানা পার হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের শিক্ষককুলকে বিদেশের মাটিতে স্বাধীনতার এই আন্দোলনে সমবেত করা বা তাদের সামান্য জীবিকার সন্ধানে তিনি সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর নিজের জবানবন্দিতে আজ থেকে চার দশকের বেশি আগের সেই গৌরবময় দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে আমাদের সেদিনের উত্তেজনা, স্বপ্নবুনন, সংগ্রাম, অনিশ্চয়তা, যূথবদ্ধতা ও 'দাবায়ে রাখতে' পারা যাবে না এমন বিশাল জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধজয়ের প্রণোদনার কথা জানতে পারব।

শফি আহমেদ: ড. আনিসুজ্জামান, আপনি আমাদের দেশের নানান সময়ের অগ্রযাত্রায় কালের সাক্ষী। আজকে এ বিশেষ সময়ে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলাপ করব, তা হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে এর আগের কথাগুলো এবং এর পরের কথাগুলো উঠে আসবে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির জন্য একটা অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াবে, এটি আপনি কবে নাগাদ বুঝতে পেরেছেন?

আনিসুজ্জামান: আসলে অনেকের চাইতে এ বোধ আমার অনেক পর জেগেছে। আমি '৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আস্থাবান ছিলাম। ছয় দফা সমর্থন করেছি ঠিকই কিন্তু তখনো মনে হচ্ছিল নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। তার মধ্য দিয়ে দেশে এক ধরনের গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক পটপরিবর্তন ঘটবে।

শফি আহমেদ: একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম, '৬৯ সালে আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এই যে মাঝের

সময়গুলোতে নানা ঘটনা ঘটছিল, সামরিক শাসন চলছিল—

আনিসুজ্জামান: তখনো আমি সম্পূর্ণ বিচলিত হইনি। '৬৯–এ যে দ্বিতীয়বার মার্শাল ল হলো, ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় টিভিতে আমরা বন্ধুবান্ধবরা শুনছিলাম, তখন আমি প্রথমবার বললাম যে এদের সঙ্গে থাকা যাবে না।

তার আগে বহুবার মনে হয়েছিল আদৌ পাকিস্তান টিকবে কি না! এটা মনে হচ্ছিল যে, যদি ছয় দফা দাবি মেনে নেয় পাকিস্তানের শাসকেরা, তাহলে হয়তো এক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি সমাধান পাওয়া যাবে এবং প্রত্যাশা ছিল যে তা হবে। কিন্তু সেই সময় যা ঘটল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা,গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন চেতনা দেখা দিল এবং সেটা আবার দমন

করতে দ্বিতীয় বার সামরিক শাসন জারি করা হলো। তখন মনে হলো যে আর কোনো উপায় থাকল না।

আমার মনে আছে যে আমি শিকাগো গেলাম '৬৪ সালে। এক বছরের একটু কম ছিলাম। আমি ওখানে পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন অব শিকাগোর সভাপতি, নানারকম কাজ করি, আমার যে সেক্রেটারি এবিএম শফিউল্লাহ, সে পাকিস্তানে কাজ করছে বটে, কিন্তু সে বলছে পাকিস্তান তো থাকবে না। আমি তাকে বলি, দেখেন, আমরা তো একবার আলাদা হলাম। তাতে কি সমস্যার সমাধান হলো ? আরেকবার আলাদা হলে সে সমস্যার সমাধান হবে? আমরা সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের মুক্তির কথা ভাবি না কেন?

শফি আহমেদ: পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সমস্যা উত্তরণের জন্য বৃহৎ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কোনো প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল?

আনিসুজ্জামান: অনেকগুলো চেষ্টা হয়েছিল। '৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলো। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বাইরে কথাটি উঠল, সারা পাকিস্তানে জাতীয়ভাবে একটি ছাত্র সংগঠন করা যায় কি না!

ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন এদিকে, ওদিকে লাহোরভিত্তিক ছাত্র সংগঠন, এদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। All Pakistan Students' Organization (APSO) নামে সংগঠনের নামও ঠিক হয়েছিল।

শফি আহমেদ: তখন পশ্চিমের দিক থেকে কারা ছিলেন, পূর্বের দিক থেকে কারা ছিলেন, আপনার মনে পড়ে?

আনিসুজ্জামান : যদ্দুর মনে পড়ে আমার, আমাদের দিক থেকে একসময়কার ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি আবদুস সাত্তার, সৈয়দ আহমদ হোসেন খানিকটা ছিলেন; ছাত্রলীগ থেকে ছিলেন আবদুল আওয়াল, তিনি পরে জাসদে গিয়েছিলেন।

তার আগে কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র লীগের মধ্যে কিছু সদস্য রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যার ছাত্র ইউনিয়নে যাওয়ার কথা, তাকে ছাত্রলীগে রাখা হলো, এটি করা হয়েছিল বৃহত্তর ঐক্যের জন্য, ছাত্রলীগ–ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্যের কথা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু নিখিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তখন কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক। আওয়ামী লীগও নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাদের ওই চেষ্টাটি ছিল।

শফি আহমেদ: পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালী খান বা ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ?

আনিসুজ্জামান: ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগটা আকস্মিকভাবে হয়। তিনি বহুদিন জেলে ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সব ধরনের কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে ছাপ্পান্ন সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে এশীয় লেখক সম্মেলন হয়। তখন তিনি এলেন। ফয়েজ আহমেদ, কাতিল শিফায়ী, ইজাজ বাটালভী আরও কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন। ভারতে তখন ফয়েজ আহমেদের খুব জনপ্রিয়তা ছিল।

এখান থেকে আমরা বোধহয় এগারোজন গিয়েছিলাম। বেগম সুফিয়া কামাল, কবি গোলাম মোস্তফা, সরদার

জয়েনউদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, কন্যাকুমারী–খ্যাত আবদুর রাজ্জাক, ফয়েজ আহমদ, সৈয়দ নুরউদ্দিন, কাজী দীন মুহম্মদ, আতোয়ার রহমান, সানাউল্লাহ নূরী এবং আমি। আমরা ঠিক করলাম পাকিস্তানের একটা ডেলিগেশন হবে। ফয়েজ আহমদকে নেতা, বেগম সুফিয়া কামালকে উপনেতা এবং সৈয়দ নুরউদ্দিনকে সম্পাদক করা হয়। এইখানে ফয়েজের সঙ্গে পরিচয় হলো। বছরখানেক পরে তিনি যখন ঢাকায় আসেন, আমাকে খবর পাঠালেন, আমি গেলাম দেখা করতে।

শফি আহমেদ: ১৯৬৫ সালে যখন ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছিল প্রফেসর এবিএম হাবিবউল্লাহ সাহেব নাকি

বলেছিলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার এটাই মোক্ষম সময়।

আনিসুজ্জামান: আমি বলতে পারব না। ওই যে বললাম, চৌষট্টিতে বাইরে গিয়েছিলাম, পঁয়ষট্টিতে ফিরলাম।

যুদ্ধের সময় লন্ডনে। যখন ফিরে আসি তখন তাসখন্দ চুক্তি হয়ে গেছে। কাজেই ফিরে এসে শান্তি এবং মৈত্রীর পক্ষে কথা বললাম, যুদ্ধের সময় থাকলে, নিশ্চয়ই যুদ্ধের পক্ষে কথা বলার জন্য চাপ থাকত। এ কাজটি থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।

শফি আহমেদ: ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। তখন আমাদের দেশে যাদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করা হতো, যারা ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মাঝে এমন ধারণা কি লক্ষ করেছেন, চাইলে আমরা স্বাধীন হতে পারি?

আনিসুজ্জামান: পঁয়ষট্টির পরে এমন একটি ঢেউ এসেছিল। বিশেষ করে শেখ মুজিব যখন বলেন, এ যুদ্ধের পুরো সময় পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল। পাকিস্তানিরা বলত, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করছে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর। এদেশের মানুষ অনুভব করে যে আমাদের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি।

আমাদের জানাশোনার মধ্যে যুদ্ধের সমর্থক খুব–একটা ছিল না। দুয়েকজনও যে ছিল না, তা না। অনেকে মনে করেছেন যে, ভারত অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধের পক্ষে কথা বলা উচিত। আমার মনে আছে, মাহমুদ আলী, যিনি একাত্তর সালে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন, আমি ফিরে আসার পর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করে বলেন, ওরা কেন যুদ্ধের পক্ষে কাজ করছে? আমি বলি, দেশপ্রেম থেকে। উনি বলেন, কিসের দেশপ্রেম? এটি দেশরক্ষার যুদ্ধ? এটি তো একেবারেই ক্ষমতা রক্ষার যুদ্ধ। আইয়ুবের ক্ষমতা রক্ষার যুদ্ধ। এরা কেন উত্তেজিত হবে? এরকম একটা চিন্তাও ছিল।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে চলে এসেছি। সত্তর সালে যে নির্বাচনটা হলো, নির্বাচনের প্রস্তুতি জুলাই মাসে শুরু হলো। আমার মনে আছে, আগস্ট মাসে এখানে নির্বাচন হবে এ কথা শুনতেই উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আগস্ট মাসে কোনো এক পাকিস্তানি পত্রিকায় আমি নিজে পড়েছি। পুরো পাকিস্তানে কী রেজাল্ট হবে, তা তখনই বলে দেওয়া সম্ভব ছিল। তারপর ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল। তারপরও যে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এতটা আসন না পেলেও প্রায় কাছাকাছি আসন পাবে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

শফি আহমেদ: নির্বাচন তখনো হয় নি, এমন একটি ফলাফল হলেও শেখ মুজিব ক্ষমতা পাবে না, এমন কোনো সন্দেহ আপনার বা আপনার বন্ধুদের কারও ছিল?

আনিসুজ্জামান: প্রথমত এটা মনে হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। আর ওই যে ঊনসত্তরে বলেছিলাম, এদের সঙ্গে থাকা যাবে না। তখন থেকে মনে হয়েছিল যে শুধু আওয়ামী লীগই পারবে সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে। মাওলানা ভাসানী যা বলছেন, তা আর ভালো লাগছিল না। ভোটের আগে ভাত... ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। প্রথম নির্বাচন, তাও যদি পিছিয়ে যায়, তা ভালো লাগছিল না। বদরুদ্দীন ওমরের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল, এটা আমার মনে আছে। উনি একবার চট্টগ্রামে আমার বাসায় ছিলেন। তিনি নির্বাচনের বিপক্ষে ছিলেন। এটা মনে হচ্ছিল যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। আমি নিজে ইলেকশন ডিউটি করলাম বলে আগাম ভোট দিলাম। নির্বাচনে মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। ইলেকশন ডিউটি করতে গিয়ে দেখেছি যে গণনার সময় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য প্রার্থীদের এজেন্ট খুঁজে পাওয়া যায় না, তাদের ধরে নিয়ে এসে সই নিতে হচ্ছিল।

শফি আহমেদ: আপনি কোথায় ইলেকশন ডিউটি করেছিলেন?

আনিসুজ্জামান: হেয়াকো নামে একটা জায়গায়, চট্টগ্রামের উত্তর দিকে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে

গেলে এ জায়গা দিয়েই রামগড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ভারতে চলে গিয়েছিলাম। নির্বাচনের পরেই ক্ষমতার পালাবদলের পালা। জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের নেতারা শপথ নিলেন যে ছয় দফার ভিত্তিতে তাঁরা সংবিধান রচনা করবেন। তখনই মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা সহজ হবে না। কেননা সামরিক শাসকদের ইচ্ছা থাকবে না, ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হোক এবং বঙ্গবন্ধু সবাইকে শপথ পড়িয়ে নিয়েছিলেন যাতে আপসের কোনো পথ না থাকে। তখনই মনে হয়েছিল একটা বিরোধ তৈরি হবে। বিরোধটা কী মাত্রার হবে তা বোঝা যাচ্ছিল না। এমনকি পঁচিশে মার্চ সকালে আমার মনে হচ্ছিল যে মিলিটারি অ্যাকশন হতে যাচ্ছে। মিলিটারি অ্যাকশন কী এ নিয়ে ধারণা ছিল না। লোকে রাস্তায় গাছ ফেলে প্রতিরোধ করতে চাইছিল। তারপর তো ভয়াবহ অবস্থা! যারা ছয় দফা না এক দফা নিয়ে বিতর্কে ছিলেন, তাদেরও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা ছিল না।

শফি আহমেদ: আমলাতন্ত্রের উপরতলায় বাঙালি খুব কম ছিল। যেমন সচিব পর্যায়ে। কিন্তু তার একটু নিচে বাঙালি ছিল। আপনি কি একটা ধারণা পেতেন যে তারাও আমলাতন্ত্রের ভেতর থেকে পাকিস্তানকে রিজেক্ট করেছে? আনিসুজ্জামান: অতটা না হলেও চলমান অবস্থা তাদেরকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে এটা বলা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে হলো, তার আলোচনার জন্য, সিভিল সার্ভেন্টদের একটা বোর্ড ছিল। আমাদের এখান থেকে চারজন ছিল। পাকিস্তানের প্ল্যানিং নিয়ে তারা যুক্তি দিয়ে আপত্তি তুলেছিল। ঘটনাটার উল্লেখ আছে খালিফ বিন সাইদের পলিটিক্যাল সিস্টেম অব পাকিস্তান বইয়ে। এই বইয়ে লেখক বলেছেন যে আমলারা যা করল তা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যখন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেই দায়িত্ব আমলারা নিয়ে নেয়। এটা তার একটি নিদর্শন। তারা যে কাজটি করল, এটা একটা পলিটিক্যাল ডকুমেন্টের মতো। এভাবে কিছু কিছু হয়েছে। সার্বিকভাবে বলা কঠিন। তাদের যারা ঘনিষ্ঠ তারা নিজেদের মধ্যে হয়তো আলাপ-আলোচনা করত।

শফি আহমেদ: পঁচিশে মার্চ রাতে এত বড় একটা ক্র্যাকডাউন হবে, তা কি বুঝতে পেরেছেন?

আনিসুজ্জামান: ক্র্যাকডাউন হবে এটা মনে হয়েছে। কিন্তু এতটা ভয়ংকর হবে সেটা বুঝতে পারি নি। ২৩ তারিখের দিকে আমরা চট্টগ্রাম শহরে একটা সভা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে সভা চলা মধ্যে খবর এল সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানো নিয়ে একটা গোলমাল হচ্ছে। আর্মি পথে নেমে পড়েছে। তাদের প্রতিরোধ করতে জায়গায় জায়গায় আর্মি ব্যারিকেড দিয়ে দিয়েছে। আমরা তো ক্যাম্পাসে থাকি। ফলে সভা দ্রুত শেষ করে ফিরে আসি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আটকা পড়েছিলেন।

ক্যান্টনমেন্টের উত্তর দিকে হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাস। ক্যান্টনমেন্টের লাগোয়া সায়েন্স ল্যাবরেটরি। সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ওয়াচ করার ব্যবস্থা ছিল। আমরা ওই সূত্রে জেনেছি যে মুভমেন্ট হচ্ছে ভেতরে। ২৪ তারিখে যদি ক্যান্টনমেন্টে মুভমেন্ট হয়, তাহলে ক্র্যাকডাউন আসন্ন। কিন্তু ঠিক কখন হবে জানা ছিল না। আমরা একটু ভয় পাচ্ছি। খাবার-দাবার মজুদ করার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু কেউ বোঝে নি যে অবস্থা এত ভয়াবহ হবে।

শফি আহমেদ: ৭ মার্চের যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, এ ভাষণ শুনেছেন কখন?

আনিসুজ্জামান: আমরা শুনেছি ৮ তারিখে। ৭ তারিখে রেডিওতে বক্তৃতা প্রচার হতে দেয় নি।

শফি আহমেদ: সেই সময় আপনার ভেতর কেমন অনুভূতি হয়েছিল ? আপনি এ ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছেন?

আনিসুজ্জামান: ভাষণটা শোনামাত্র মনে হয়েছিল এটি স্বাধীনতার ঘোষণা। আমাদের সেনা-কর্মকর্তা অনেকেও তা মনে করেছিলেন। জিয়াউর রহমান, শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ। এঁরা বলেছিলেন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর

ভাষণকে আমরা গ্রিন সিগন্যাল হিসেবে ধরে নিয়েছি। কিন্তু তারপরেও আলাপ-আলোচনা কী হয়, যদি সফল হয়। ভুট্টো একবার বলল, দুই গণপরিষদ করো। দুই দিকে দুইজন। সেটাও একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হওয়ার পথ। যদি কিছু হয়।

শফি আহমেদ: ৭ই মার্চের পরে আপনি চট্টগ্রাম ছিলেন। তখন টেলিফোন বা অন্য মাধ্যমে ঢাকায় কার কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল?

আনিসুজ্জামান: মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পারি নি। মুনীর চৌধুরীকে ফোন করলাম। ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছিল উনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। আমরা ২৫ মার্চ রাতে চেষ্টা করলাম ইত্তেফাক পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার। গাফ্‌ফার চৌধুরীর বাড়িতে ফোন করা, পূর্বদেশ অফিসে ফোন করা—এগুলো চেষ্টা করা হলো। চাটগাঁর সাংবাদিকেরা তখনো কিছু জানেন না। মইনুল আলম বললেন যে, না না, এইসব কিছুই হচ্ছে না।

শফি আহমেদ: চট্টগ্রাম এবং ঢাকার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ?

আনিসুজ্জামান: রাত বারোটা থেকে টেলিফোন কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আমরা কথা বলতে বলতে লাইন কেটে গেল। এত আমরা ধরে নিয়েছিলাম ক্র্যাকডাউন শুরু হয়ে গেছে। আমরা খবর পাচ্ছিলাম রাত বারোটার আগেই ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। ব্যারিকেডের খবর থেকে মনে হয়েছে আর্মি নেমে গেছে।

শফি আহমেদ: যেটুকু জানলেন বা শুনলেন, সেরকম সময় আপনি কি মনে মনে ভাবলেন যে দেশত্যাগ করবেন?

আনিসুজ্জামান: না, দেশত্যাগ করার চিন্তা আরও পরে এসেছে। পঁচিশে রাতে ডক্টর মল্লিক বললেন, আমি শুনলাম, ঢাকায় অনেক মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। তোমরা যার যার সোর্স থেকে খবর নেওয়ার চেষ্টা করো। তখন সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন, এম কে রহমান, ম্যাথমেটিক্সের রশীদুল হক ছিলেন। আমি ছিলাম। আবদুল করিম ছিলেন। মাহবুব তালুকদার ছিল।

ছাব্বিশের রাতে ডক্টর মল্লিক এসে বললেন, বর্ডার থেকে ইপিআরের বাঙালি সৈন্যরা আসছে, তারা ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে রাখবে, আমাদেরকে তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আই চৌধুরী ছিলেন, উনি এক হলের প্রভোস্ট, আমি এক হলের প্রভোস্ট। হলের বাবুর্চিকে বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কমনরুমে থাকার ব্যবস্থা করলাম। আশপাশের মানুষজনও এগিয়ে এল। কেউ চারটা ডিম নিয়ে এল, কেউ দুটো মুরগি নিয়ে, এরকম।

শফি আহমেদ: আপনাদের ক্যাম্পাস ক্যান্টনমেন্টের পাশে ছিল। তখন আপনাদের মাঝে কোনো ভীতি কাজ করত কি না বা আপনাদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল?

আনিসুজ্জামান: আমরা ধরে নিয়েছিলাম, যদি পাকিস্তানি আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের ওপর আক্রমণ হবে। ঢাকায় আক্রমণের খবর আমাদের কাছে এসেছে। আক্রমণের বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। আর্মি বের হতে পারলে আক্রমণ হবে। মার্চের ২৯ তারিখ থেকেই ইপিআরের লোকজন সরে যেতে লাগল, তারপর শহরে জিয়াউর রহমান বা বাঙালি সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগটা থাকল। পুলিশ বলছে, আমাদের যেসব আর্মি প্রতিরোধ করেছিল, তারা কাপ্তাইয়ের দিকে চলে গিয়েছে। তখন শিক্ষকরাও অনেকে খুব ভয় পাচ্ছিলেন। আমি গিয়ে ডক্টর মল্লিককে বললাম। উনি বললেন, এক কাজ করো। আমরা সবাইকে ইভাকুয়েট করার ব্যবস্থা করি। দুই বাসে করে লোকজন সরানো হলো। একটা গেল উত্তরের দিকে ফটিকছড়ি, আরেকটা গেল কুণ্ডেশ্বরী। কুণ্ডেশ্বরীর প্রফুল্ল সিংহ বললেন, এম আর সিদ্দিকীকে বর্ডার পার করে দিয়ে এসেছি। তিনি ইন্ডিয়ার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছেন।

সেটাই ছিল প্রথম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ।

তারপর আমরা গেলাম কুণ্ডেশ্বরীতে, প্রথমত ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিলাম ৩০ মার্চ। ৩০-৩১ তারিখ রেজিস্ট্রার ও আমি থাকলাম ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে। ভাইস চ্যান্সেলর ফ্যামিলি নিয়ে থাকলেন। ১ এপ্রিল সকালে আমরা মুভ করলাম। আমার সঙ্গে তখন আমার শ্যালক ছিল। ওই-ই বলল যে, যেখানেই আমরা যাই বর্ডারের দিকে যেতে হবে। বর্ডার দিয়ে কী হবে? বলল, ওপারে চলে যাওয়া যাবে। আমি বললাম, পাগল হয়েছ নাকি? গিয়ে কী খাব? দেশের মধ্যে লুকিয়েটুকিয়ে থাকব। ও বলল, দরকার নেই এখানে থাকার। খাওয়ার চিন্তা ওখানে গিয়ে করব। তারপরই তো গ্রামে গেলাম। কাটিরহাট নামে একটি গ্রামে। ওখানে আমার বন্ধু আবদুল আলীর সেজো ভাই আবদুল আউয়াল এলেন। উনি রামগড় টি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। উনি ভাইয়ের খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে নিয়ে একবার চেষ্টা করলেন শহরে আসতে। সেটা হলো না। আমরা ক্যাম্পাস পর্যন্ত এলাম। এসে ক্যাম্পাস থেকে ফোন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

শফি আহমেদ: তখন সেই এলাকার অবস্থা কেমন ছিল? মানুষজন চলাফেরা করছিল?

আনিসুজ্জামান: চলাফেরা করছে অল্পস্বল্প। দোকানপাটও কিছু খোলা আছে। কেনাবেচা হচ্ছে। ফোনে কাজ হলো না। শহরে যাওয়ার ব্যাপারে সবাই বারণ করছে। তারপর ক্যাম্পাসের রাজপথ থেকে মেইন রোডে পৌঁছতেই দেখা গেল, ক্যান্টনমেন্টের মধ্য থেকে গুলি হচ্ছে রাস্তার ওপর। লোকেরা দৌড়াচ্ছে। আবার একটু পর যখন গুলি থেমে যাচ্ছে, তখন পথে নামছে। আমরা ফিরে এলাম। উনি বললেন, আমার সঙ্গে চলো।

রামগড়ে গেলাম। ওইখানে জিয়াউর রহমান তখন দলবল নিয়ে ছিলেন। পরে আমরা বুঝে গেলাম ওখানেও থাকা যাবে না। আগরতলায় থাকার জায়গা ঠিক করে এসে ফিরে গেলাম ২৬ এপ্রিল।

শফি আহমেদ: তখন তো বুঝেছেন আমাদের ফেরার আর জায়গা নেই? আমরা বাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব অথবা মুক্তি পাব?

আনিসুজ্জামান: না, পঁচিশের রাতেই বুঝেছি। এখান থেকে ফেরার আর কোনো জায়গা নেই। ডু অর ডাই অবস্থা।

শফি আহমেদ: আগরতলায় গিয়ে নিশ্চয় বাংলাদেশ নিয়ে কিছু করার কথা ভেবেছেন?

আনিসুজ্জামান: ততদিনে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়ে গেছে। ১৭ তারিখে শপথ নেওয়া হয়ে গেল। আমি তাহেরুদ্দিন ঠাকুরকে বলেছিলাম যে তাজউদ্দিন আহমদকে আমার আগরতলায় আসার খবর জানাতে। উনি জানলে নিশ্চয়ই আমাকে কিছু জানাতেন। কিন্তু কোনো খবর পাই না। পরে জানলাম তাজউদ্দিনকে তিনি বলেনই নি। এখানে ইয়ুথ ক্যাম্পে লোকজন নিচ্ছে, অনেক ছাত্ররা এসে বলছে যে আমাদের নিচ্ছে না, বলে দেন...ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপরে মাহবুবুল আলম চাষী এসে একদিন বললেন, যারা ইয়ুথ ক্যাম্পে আসছে ওদের একটা তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া দরকার। না হলে এরা অস্ত্র চালানো শিখে অন্যরকম হয়ে যাবে। আপনারা একটা সিলেবাস করে দেন। আমি আর ওসমান জামাল মিলে একটা সিলেবাস করলাম।

শফি আহমেদ: সিলেবাসটা কী নিয়ে ছিল?

আনিসুজ্জামান: কিছু রাজনীতি, কিছু অর্থনীতি, কিছু ইতিহাস, কিছু সাধারণ জ্ঞান ছিল।

মাজহারুল ইসলাম: আপনি আগরতলায় কত দিন ছিলেন?

আনিসুজ্জামান: আগরতলায় গিয়ে আমরা ওখানে ওদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করলাম। ওরা ওদের একটা পরিত্যক্ত এডুকেশন কলেজ বা ইনস্টিটিউট আমাদের ছেড়ে দেয়। ওখানে আমাদের প্রত্যেককে ঘর দেওয়া হয়। মল্লিক সাহেবকে একটা বাংলো মতো দিয়েছিল। আলী আহসান এক ঘরে, আমি

এক ঘরে, শামসুল হক এক ঘরে, তারপর আমাদের আর্মির লোকদের মধ্যে শফিউল্লাহর পরিবার এক ঘরে, মীর শওকত আলীর পরিবার এক ঘরে। শওকতের বাবা ছিলেন ওর ফ্যামিলির সঙ্গে।

শফি আহমেদ: আগরতলায় যারা সরকারে ছিল, তাদের সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ ছিল?

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ, নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তখন তাঁরা রাত পর্যন্ত অফিস করতেন। সকাল থেকে আরম্ভ করতেন।

শফি আহমেদ: আগরতলায় কতদিন থাকলেন?

আনিসুজ্জামান : মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

শফি আহমেদ: তারপর কলকাতায় যে গেলেন, তখন কী ভেবে গেলেন?

আনিসুজ্জামান: কলকাতা যাওয়ার প্রধান কারণ হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি বিজ্ঞাপন দিল কাগজে। বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের যোগাযোগ করতে বলল, ওই যোগাযোগ করতেই কলকাতায় যাওয়া।

শফি আহমেদ: তখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয় নি?

আনিসুজ্জামান: না। কলকাতায় গিয়ে সহায়ক সমিতির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হলো। তারপর ক'দিন পরে ওরা বলল, আপনাদের শিক্ষক সমিতি বানাতে হবে। তারপর আমরা বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি করি।

শফি আহমেদ: তখন তো সেখানে অমলেন্দু বাবুরা ছিলেন?

আনিসুজ্জামান : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সত্যেন সেন মূলত কাজটা করতেন। অমলেন্দু বাবুরা হয়তো সাংগঠনিকভাবে কাজ করেন নি, কিন্তু তাঁদের সাপোর্টটা ছিল। আমরা তখন শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে গিয়েছি।

শফি আহমেদ: তখন আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে কাকে কাকে পেয়েছিলেন?

আনিসুজ্জামান: রাজশাহী থেকে মোশাররফ সাহেব, সনৎ সাহা। আলী আনোয়ার তখন গিয়েছেন। গোলাম মুরশিদ গেছেন। তারপর ঢাকা থেকে আমাদের কিছু কিছু শিক্ষক গেছেন। একটু পরে গেল অজয় রায়। তখনো গিয়ে পৌঁছায় নি। কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা গিয়েছেন। রাজশাহী থেকে ম্যাথমেটিক্সের খলিল সাহেব গেলেন। আবার রাজশাহীর দুয়েকজন ফিরেও এসেছেন।

শিক্ষক সমিতি গঠনের কাজ যখন এগিয়ে এসেছে, তখন সভাপতি কে হবে তা নিয়ে কথা চলছে।

কামরুজ্জামান এমএনএ ছিলেন, ওঁর ইচ্ছা উনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি হবেন, আমরা মল্লিক সাহেবকে চাইছিলাম। তখন উনি তাজউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগটা করিয়ে দিলেন।

শফি আহমেদ: মল্লিক সাহেব?

আনিসুজ্জামান: না, কামরুজ্জামান। আমাকে বললেন, প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ডেকেছেন। শুনে মল্লিক সাহেব বললেন, আমি যাব তোমার সঙ্গে। গেলাম আর কি। তখন তাজউদ্দিন বললেন ওঁর অফিসে জয়েন করতে। আর মল্লিক সাহেব আমাকে বলে দিয়েছিলেন, খবরদার, রাজি হবে না। সব আওয়ামী লীগের হাতে চলে গেছে, শিক্ষক সমিতিও চলে গেলে হবে না। তখন আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে বললাম, আমি পারছি না। শিক্ষক সমিতিকে আমার সময় দিতে হবে। আমার কথা শুনে উনি খুবই দুঃখিত হলেন। পরে কথা হলো যে কিছুদিন আমি শিক্ষক সমিতি করে তারপর ওঁর সঙ্গে আসব। তা-ই করলাম।

শফি আহমেদ: শিক্ষক সমিতিতে আপনারা কী কাজ করেছেন?

আনিসুজ্জামান: আমাদের একটা কাজ ছিল শিক্ষকদের জন্য চাকরি খোঁজা। কেউ কেউ পেলেন, কেউ পান নি। শামছুল হক পেয়েছিলেন, জিয়াউদ্দিন পেয়েছিলেন,

রাজশাহীর ম্যাথমেটিক্সের শিশির পেয়েছিলেন। চাকরি–বাকরির খোঁজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র দিচ্ছি, গভর্মেন্টকে দিচ্ছি। আমরা একটা মুভ নিয়েছিলাম শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্কুল করা যায় কি না। বাচ্চা ছেলেগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। কোথাও হলো, কোথাও হতে পারল না। বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির যে ফান্ড ছিল, সেখান থেকে দুঃস্থ শিক্ষকদের টাকাপয়সা দেওয়া হতো। অনেকে পেয়েছেন, অনেকের কাজেও লেগেছে। কারও স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, কারও স্ত্রী অসুস্থ। এইসব টাকা কাজে লেগেছে। মোটামুটি এরকমই ছিল তখন। জনমত সৃষ্টি করার কাজও করেছি। ইউনিভার্সিটিগুলোতে বক্তৃতা দিতে হয়েছে।

শফি আহমেদ: প্ল্যানিং কমিশন কবে নাগাদ গঠিত হয়?

আনিসুজ্জামান: প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হলো জুনের শেষে, জুলাইয়ের আগেই। 'প্ল্যানিং সেল' নাম দিয়ে হলো। সারোয়ার মুরশিদ, মোশাররফ হোসেন, স্বদেশ বোস আর আমি। তারপর আগস্টে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী কলকাতায় এলেন, তখন ওঁকে ভাইস চেয়ারম্যান করে প্ল্যানিং কমিশন করা হলো। সনৎ কুমার সাহা স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগ দিলেন।

শফি আহমেদ: ওই যে প্ল্যানিং কমিশন হলো, তখন আপনারা কোন ভাবনাগুলোতে জোর দিচ্ছিলেন?

আনিসুজ্জামান: আমাদের ম্যান্ডেট হচ্ছে তিনরকম প্ল্যান করা—শর্ট টার্ম, লং টার্ম, মিড টার্ম। আমি বলেছিলাম লং টার্ম আমরা করবই না। কেননা দেশ স্বাধীন হলে তখন যে কমিশন হবে তারা করবে। আমরা শর্ট টার্মটাই করি। দেশ স্বাধীন হলে সঙ্গে সঙ্গে কী করা যায়। কিছু কিছু কাজ করা গিয়েছিল। কিন্তু বেশি না। কারণ আমরা খুব বেশি সহযোগিতা পাই নি। এক নম্বর, আমরা ক্ষয়ক্ষতির একটা হিসাব চেয়েছিলাম।

আমাদের ডিফেন্স মিনিস্ট্রকে বলা হলো, তারা সেক্টর কমান্ডারদের বলল। সেক্টর কমান্ডাররা বলল, আমরা একটা রিপোর্ট পাঠাই গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে, একটা রিপোর্ট পাঠাই গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশকে। আবার যদি একটা রিপোর্ট দিতে হয় প্ল্যানিং কমিশনকে, তাহলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করাই কঠিন হবে। তারপর অনেকে ভাবলেন যে, কিসের প্ল্যানিং এখন! যুদ্ধ চলছে। কবে যুদ্ধ জয় হবে! অনেকে ভাবছেন তাজউদ্দিন সাহেব ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের একটা কাজ দেওয়ার জন্য এটা করেছেন। আরেকটা সমালোচনা ছিল কেবিনেটের মধ্যে, বামপন্থীদের নিয়ে এটি করা হয়েছে।

শফি আহমেদ: যোগাযোগের আরেকটি মাধ্যম ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আপনি এখানে কী ভূমিকা রেখেছিলেন?

আনিসুজ্জামান: প্রথমে চাটগাঁয় সম্প্রচার শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। ওখান থেকে ট্রান্সমিটার নিয়ে চলে গেল ওরা আগরতলায়। সেখানকার ট্রান্সমিশন প্রায় শোনা যেত না। তারপর কলকাতা থেকে সম্প্রচার শুরু হলো ২৫ মে। আমি তখন গিয়ে পৌঁছেছি কয়েকদিন হলো। আমাকে বলা হলো, আজকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আবার চালু হবে। আপনাকে কিছু বলতে হবে। বালিগঞ্জে গেলাম। সেখানে বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও ছিল। সেদিন ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ, নজরুল সম্পর্কে বললাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।

শফি আহমেদ: প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ওসমানী সাহেবের যোগাযোগে কি ঠান্ডা ভাব ছিল?

আনিসুজ্জামান: ওসমানীর সঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেবের সম্পর্ক খুব একটা সহজ ছিল না। যদ্দুর মনে পড়ে জুন মাসের শেষে, জুলাই মাসের গোড়াতেও হতে পারে, সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং হয়। সেখানে জিয়াউর রহমান ওসমানীর বিরুদ্ধে কথা বলেন। কেউ কেউ জিয়াউর রহমানকে সমর্থনও করেন। এতে ওসমানী পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পরে তাজউদ্দীন তাঁকে বুঝিয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করান। তারপর সবাই যার

যার মতো কাজ করছে। আমার জানামতে আবার হলো, ইন্ডিয়া–বাংলাদেশ জয়েন্ট ফোর্সেস হলো নভেম্বরে।

শফি আহমেদ: নভেম্বরের শেষের দিকে।

আনিসুজ্জামান: নভেম্বরের শেষের দিকে, কুড়ি–একুশের সময়ে। এখানে কমান্ড লিড করবে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান, এটা ওসমানীর খুব লাগে। এক হচ্ছে উনি কবে কমিশন পেয়েছেন, এরা কবে কমিশন পেয়েছে, সবাই ওঁর ছোট, জুনিয়র। উনি যাঁদের চিনতেন, তাঁদের নাম ধরে ডাকেন, উনি বলছেন, আমি হচ্ছি একটা দেশের আর্মির চিফ। ও হচ্ছে একটা উইংয়ের চিফ। ও কী করে লিড দেয়? তাজউদ্দীন বললেন, এটা বাস্তব অবস্থা। আমরা এ দেশের আশ্রয়ে আছি। আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমাদের সঙ্গে নিতে চাই। সেখানে ওদের ম্যান অ্যান্ড রিসোর্সেস অনেক বেশি। আপনার সিনিয়রিটি মান্য করা অতটা বাস্তবসম্মত হবে না। তাজউদ্দীনের এই কথাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন। উনি পদত্যাগ করেন। তারপর কী হয় আমি জানি না।

শফি আহমেদ: ঠিক দেশ মুক্ত হওয়ার সময় মানে ষোলই ডিসেম্বর ওসমানী সাহেব কী করলেন?

আনিসুজ্জামান: দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন উনি কলকাতা ছেড়ে হেলিকপ্টার নিয়ে সিলেট চলে গেলেন। উনি বলেও যান নি। খোঁজ করতে করতে অনেক পরে জানা গেল, উনি সিলেটের দিকে গেছেন। আমার ধারণা মতে, উনি সারেন্ডার সেরিমনিতে দ্বিতীয়জনের ভূমিকায় থাকতে চান নি বলে সরে গেলেন। তখন এ. কে. খন্দকারকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

শফি আহমেদ: স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শেখ সাহেবের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

আনিসুজ্জামান: এটা আমি বলতে পারব না। উনি তো বঙ্গবন্ধুর কেবিনেটের মন্ত্রী হলেন। মূল কিছু কিছু বিষয়ে উনি বিরক্ত প্রকাশ করলেন।

শফি আহমেদ: কিন্তু একইসঙ্গে তিনি প্রবলভাবে অ্যান্টি–পাকিস্তানি ছিলেন।

আনিসুজ্জামান: সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আন্তরিক ছিলেন। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, জাতীয়করণের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন তিনি। আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে কেবিনেটের একটাই মিটিং হয়। সেখানে ওসমানী উপস্থিত ছিলেন। উনি দুটো পয়েন্টে কথা বলেন, আমি মনে করি, দুটো পয়েন্ট এখনো প্রযোজ্য। উনি বলেন যে, আমাদের বড় সেনাবাহিনী দরকার নেই, ছোট আর্মি থাকবে, কিন্তু মিলিটারি ট্রেনিংটা সবাইকে কমপ্লিট করতে হবে। যাতে প্রয়োজনের সময় সকলকে পাওয়া যায়। সেকেন্ডলি, উনি উদাহরণ দেন, ইজিপ্টে কটন ইন্ড্রাস্টি জাতীয়করণ করা হয়েছে। আমাদের এখানেও বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে। জুট, বড় সংস্থা ইত্যাদি। স্বাধীনতার পরে শিল্প বা ব্যাংক যে জাতীয়করণ হলো তাতে ওসমানী সাহেবের জোরালো সমর্থন ছিল।

শফি আহমেদ: এটা খুব বড় রকমের জাতীয়তাবাদী চিন্তা।

আনিসুজ্জামান: কিন্তু তাঁর একটা ইগো ছিল, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার যখন সদস্য, তখন তো সংবিধান তৈরি করছি। একদিন বললেন যে, প্রফেসর সাহেব, বাহিনীর অন্য শব্দ হয় না? আমি বললাম, কেন বলুন তো? তিনি বললেন, লালবাহিনী, নীলবাহিনী যেখানে কাজ করে সেখানে সেনাবাহিনী ভালো শোনায় না।

শেষকালে, তখন আমি ছিলাম না, কাজেই তখনকার মনোভাব আমি জানি না। চতুর্থ সংশোধনী যেটা হলো, আমার মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, এতে গণতন্ত্রের হানি হচ্ছে। ফলে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু পরে উনি মোশতাকের উপদেষ্টা হতে যে রাজি হলেন...।

শফি আহমেদ: আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ডিসেম্বরে শুরুতে আমরা যখন কলকাতায়, ২-৩ তারিখের দিকে

বুঝতে পারছিলাম, আমরা কিছুদিনের মধ্যে স্বাধীন হতে যাচ্ছি।

আনিসুজ্জামান: ৩ তারিখে ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল।

শফি আহমেদ: আমার মনে হচ্ছিল ডিসেম্বর মাস শেষ মাস। আপনার কি মনে হচ্ছিল?

আনিসুজ্জামান: যুদ্ধের পুরো সময়টা ডক্টর মল্লিক বলতেন যে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীন হয়ে যাব।

এপ্রিলে যখন রামগড় হয়ে আগরতলা যাচ্ছিলেন, তখন উনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, চিন্তা কোরো না, আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে এই পথ দিয়েই ফিরব। কলকাতায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে দেখা হলো জুন মাসে। সিদ্ধার্থশংকর রায় জিজ্ঞেস করলেন, কদ্দিন লাগবে আপনাদের স্বাধীন হতে? ড. মল্লিক বললেন, আমরা ডিসেম্বরে স্বাধীন হয়ে যাব। সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। মল্লিক সাহেব বললেন যে আমি আপনাকে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে ক্রিসমাস পার্টির নিমন্ত্রণ করছি। তারপর আমরা মিসেস গান্ধীর সঙ্গে যেদিন দেখা করতে গেলাম, ওইদিন রাতে কোনো–একজন মন্ত্রীর বাড়িতে আমরা নিমন্ত্রিত।

শফি আহমেদ: তারিখ মনে আছে?

আনিসুজ্জামান: জুনের বারো–চোদ্দ এ রকম হবে। ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, মোহন কুমারমঙ্গলম, নন্দিনী শতপথী— ওঁরা মল্লিক সাহেবকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। উনি জবাব দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। তারপর ওঁরা যখন থামলেন, মল্লিক সাহেব বললেন, আপনারা অনেক প্রশ্ন করেছেন, এখন মন্ত্রীদেরকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

আপনারা কি এভাবে আমাদের রক্তক্ষয় হতে দেবেন? না যুদ্ধ থামাবার জন্য আরও এফেক্টিভ কিছু করবেন? তখন ওঁদের একজন বললেন যে শরণার্থীদের এই ব্যয় নির্বাহ করা আমাদের পক্ষে মুশকিল। কাজেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিছু না করলেও আমাদের করতে হবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের নিজেদের সময়টুকু স্থির করতে হবে। যেটা আমাদের দেশের জন্য সুবিধাজনক। আপনারা জানেন যে এখন দুই দেশের মধ্যে বিরোধ দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা অনেক দূর ছড়িয়ে যায়। তাই আমাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অন্য দেশের সৈন্য আমাদের দেশে ঢুকে না পড়ে। তার জন্য শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শফি আহমেদ: হিমালয়ে যখন বরফ পড়বে।

আনিসুজ্জামান: ড. মল্লিক আবার বললেন, ডিসেম্বর। কিন্তু আমি ততটা আশাবাদী ছিলাম না। তেসরা ডিসেম্বর মিসেস গান্ধী কলকাতায় যে বক্তৃতা দেন, এটার মধ্যে কোনো কিছুই ছিল না, আমরা খুব হতাশ হলাম। ছোট বক্তৃতা ছিল। রাতে শুনলাম যে পাকিস্তান ভারতের বিমান ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করেছে এবং ইন্দিরা তারপর ভাষণ দিলেন। তখন আমার মনে হলো একটা পরিণতির দিকে আমরা যাচ্ছি। কাজেই চার তারিখ থেকে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠি। ষোল তারিখে আমি গেছি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। আমি গিয়ে খোঁজ করছি প্রথমে তাজউদ্দীন সাহেবকে। বলা হলো, উনি একটু ব্যস্ত আছেন। একটু পরে আসেন। আমি ওদিক–এদিক করে এ কে খন্দকারের খোঁজ করলাম। কেউ বলে, জানি না। একজন বলল, উনি তো ঢাকায় চলে গেছেন। আমি বলি, কখন? বলল, ঐ যে সারেন্ডার সেরিমনিতে। বলি, সারেন্ডার কখন? বলে, তিনটার সময় সারেন্ডার হয়ে গেছে।

শফি আহমেদ: তখন কয়টা বাজে?

আনিসুজ্জামান: তখন পাঁচটা বাজে। সারেন্ডার সেরিমনি হয়ে গেল, জানি না। তারপর তখন আমি তাজউদ্দীন সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়ি। তাজউদ্দীন বললেন, আপনি কোথায়? আমি আপনাকে ফোন করে পাচ্ছি না।

উনি আমার বাসায় ফোন করছেন। আমি ওনার অফিসের বারান্দায়। তার মানে আমি সেখানে দু–ঘণ্টা ধরে বসে আছি। আরও বেশি।

শফি আহমেদ: তারপর দেশে ফিরে এলেন কবে?

আনিসুজ্জামান: আমি ছয়ই জানুয়ারি কলকাতা থেকে বের হই। প্রথম খুলনায় যাই। আট তারিখে ঢাকায় পৌঁছাই।

শফি আহমেদ: তাজউদ্দীন সাহেব কবে ফিরে এলেন?

আনিসুজ্জামান: ২২ ডিসেম্বর।

শফি আহমেদ: ওই সময়ে কলকাতায় আপনারা যখন ছিলেন, কলকাতার শিল্প-সাহিত্যের লোকজনের সঙ্গে কেমন যোগাযোগ হয়েছিল ?

আনিসুজ্জামান: অনেকের সঙ্গে হয়েছিল। আমার নিজের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ফুলটাইম ছিল। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগটা ওভাবে করতে পারি নি। যাঁদের চিনতাম, তাঁদের কারও কারও কাছে যাওয়া হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমি একদিনও যেতে পারি নি, কিংবা শম্ভু মিত্রের সঙ্গে ছিল, একবারও যেতে পারি নি।

আমাদের মধ্যে যারা গেছে নিজের মতো করে গেছে। কলকাতায় একটা সভা হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে। সেখানে বনফুল ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন, অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন, আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন। আমাদের দিক থেকে সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন, আল মাহমুদ ছিল, গোলাম মুরশিদ ছিল।

শফি আহমেদ: দেশে তো আট তারিখে ফিরে এলেন। ফিরে এসে ঢাকাতেই এলেন। আট তারিখেও ঠিক আমরা বুঝতে পারি নি যে বঙ্গবন্ধু দশ তারিখে ফিরে আসবেন।

আনিসুজ্জামান: আট তারিখেই তো বঙ্গবন্ধুর রিলিজ হয়। আমরা যখন ঢাকার পথে আসছি, তখন কোনো এক জায়গায় দেখি, লোকজন খুব উল্লাস করছে। তখনই জানতে পারি, বেতারের খবরে বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে লন্ডন রওনা হয়ে গেছেন।

শফি আহমেদ: আমাদের দেশ স্বাধীনতালাভের সময় সংবিধান পাকিস্তানের ছিল। আমাদের সংবিধান তৈরি করার ব্যাপারে বড় কোনো তাগিদ ছিল তখন?

আনিসুজ্জামান: আসলে এভাবে দেখা দরকার ব্যাপারটা। অনেকে বলে এ গণপরিষদ তো পাকিস্তানের সংবিধান করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এদের বাংলাদেশের সংবিধান করার অধিকার ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তো এরা বাংলাদেশের গণপরিষদ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেহেতু পাকিস্তানের নয় বছর লেগে গিয়েছিল, ফলে সবারই একটা চাওয়া ছিল, তাড়াতাড়ি করে সংবিধান যেন হয়। সংবিধান রচনার একটা চেষ্টাও হয়েছিল। তারপর আমাদের পরিকল্পনা কমিশনে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী নিজেও একটা খসড়া সংবিধান পেশ করেন। নয় মাসের মধ্যে সংবিধান হলো। এটা তো একটা বড় অর্জন।

শফি আহমেদ: স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

গবেষণা ও লেখালেখি

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের অনেক পরিচয় একটি প্রচলিত ইংরেজি বর্ণনা ধার করে বলা যায়, তিনি মাথায় পরেন অনেক শিরোস্ত্রাণ। তিনি একজন গবেষক, লেখক, সমাজচিন্তক, সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, অতিথিপরায়ণ, পরিবারসমর্পিত একজন হাসিখুশি মানুষ। তাঁর সান্নিধ্য সততই অনুপ্রেরণাদায়ী এবং শিক্ষামূলক। যে ক্ষেত্রেই তিনি কাজ করেছেন, সফল হয়েছেন, এবং তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃজনপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে কয়েক ঘণ্টার কথোপকথনে এই মানুষটিকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা অসম্ভব, এমনকি তাঁর ওই নানা শিরোস্ত্রাণের একটির বর্ণনা দেওয়াও। তারপরও অন্যদিন পাঠকদের জন্য সেরকম একটি উদ্যোগ নেওয়া গেল।

গবেষণা ও লেখালেখিতে, তাঁর নিজের জবানিতে, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের শুরুটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনার সময় থেকেই। তিনি কতকগুলো এলাকা বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার–এর প্রধানটি ছিল বাঙালিসত্তার বিবর্তন ও বিকাশ, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালিসত্তার। এই গবেষণা অবধারিতভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে নি সাহিত্যে—তা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্বের অঞ্চলে। পরাধীন ভারতে মুসলমানরা ছিল দুই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির অধীনে—একটি ইংরেজ শাসন, দ্বিতীয়টি জাতিগত ইতিহাস। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারায় একদিকে বিষয়–বিত্ত ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়েছে মুসলমানেরা;

অন্যদিকে জাতিগত ইতিহাসে অভিমানী আত্মসমর্পণ করায় বর্তমানের পরিবর্তে অতীতের দিকে গেছে সম্প্রদায়টি। কিন্তু বাংলায় মুসলমানরা এ দুই শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও নিজেদের প্রকাশ করেছেন, একটা জাগরণের পটভূমি তৈরি করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই জায়গাটাতে জোরালো আলো ফেলেছেন। তিনি পাঠ করেছেন সাহিত্য, জীবনী, ইতিহাস এবং দৈনন্দিন ইতিহাসের আকর সংবাদপত্রকে। তাঁর গবেষণাপদ্ধতিটি আধুনিক এবং বহুস্তরবিশিষ্ট। এজন্য পরে তিনি সমাজ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে তাঁর কাজগুলি দক্ষতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে করতে পেরেছেন। জীবনী লিখেছেন কয়েক গুণী মানুষের। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যাকে বলে মনুমেন্টাল কাজ করেছেন,এমন একসময় যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিষিদ্ধ নাম, অথচ বাঙালির জেগে ওঠার এক সঞ্জীবনী উৎস।

বিশ্বনাটকের অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক সাহিত্যও রচনা করেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, তবে অনেকটা শখের বসে। আত্মজীবনী লিখেছেন, যা তাঁর সময়কে নিপুণভাবে তুলে ধরে। তাঁর এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ড নিয়েই

সাক্ষাৎকারের এই পর্ব।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইব আপনার গবেষণা এবং সাহিত্যকর্ম নিয়ে। আপনার গবেষণার একটা বড় বিষয় তো মুসলিম মানস, মুসলিম সাহিত্য এবং সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান। যদিও আপনি মূলত মুসলিম মানস নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু আপনার বিস্তৃত ক্ষেত্রটি হচ্ছে সার্বিকভাবে বাঙালিসত্তার বিনির্মাণ। আর বাঙালি সত্তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মুসলিম সত্তা। এর সৃজনশীল বিকাশের ওপর আলো ফেলেছেন এবং সেইসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক ভূমিকা আপনি সংযুক্ত করেছেন—কী কারণে মুসলিম জাতির অনগ্রসরতা, কী কারণে শিক্ষার প্রতি তাদের অনাগ্রহ, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা তেমনভাবে কেন গৃহীত হয় নি, এ রকম কিছু বিষয়। এই বিষয়গুলোর প্রতি আপনার আগ্রহটা কীভাবে তৈরি হলো?

আনিসুজ্জামান: আমি যখন স্কুল–কলেজে পড়ি, বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শেষ দুই ক্লাস আর কলেজের দুই ক্লাস, তখন যে জিনিসটা আমাকে খুব পীড়িত করত সেটা হচ্ছে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা যা আমি ১৯৪৬ সালে প্রথম দেখেছিলাম,পঞ্চাশে দেখেছি। এটা থেকেই হিন্দু–মুসলমান সম্পর্কে ভাবা, বৈষয়িক ক্ষেত্রে যে তাদের অগ্রগতির পার্থক্য, শিক্ষাদীক্ষার বৈষম্য—এসব দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয়। আমি এক্ষেত্রে প্রথম প্রবন্ধ লিখি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ নিয়ে।

তখন আমি অরবিন্দ পোদ্দারের বইটি পড়ি নি। তবে আমি সেখানে একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি বলেছি যে, আনন্দমঠে স্বাধীনতার প্রেরণাও আছে আবার একটা সাম্প্রদায়িকতা আছে। সেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিটা তৎকালীন সমাজ। কাজেই সমাজ ও সাহিত্যের যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সেটা আমি তখন থেকেই লক্ষ করেছি। এই প্রবন্ধ নিয়ে বেশ একটু উত্তাপের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন আমাকে পাকিস্তান থেকে বের করে দিতে চান—এরকম ঘটনাও ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়ভিত্তিক যে চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু–বিদ্বেষী চেতনা—তার সঙ্গে ওই সময়ের চিন্তাভাবনাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। আমি যখন অনার্সের দ্বিতীয়

বর্ষে পড়ি তখন একটা বড় প্রবন্ধ লিখি 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি।' প্রারম্ভিক লেখা। এটা পড়েই আমার শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে গবেষণায় উৎসাহিত করেন। আমার মনে হয়েছিল যে প্রচলিত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সেগুলোকেও যাচাই করে দেখা দরকার। এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে সরলীকরণ না করে এসবের যে অনেকগুলো দিক আছে সেটা যতদূর সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমি যে সময়টা নিয়ে কাজ করেছি, ১৭৫৭–১৯১৮, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার চেষ্টা আছে, মুসলমানদের বাঙালি হওয়ার চেষ্টা আছে, ভারতীয় হওয়ার চেষ্টা আছে, হিন্দু–মুসলমান মিলনের চেষ্টা আছে, বিভেদের চেষ্টা আছে, জাতিবিদ্বেষ আছে, সম্প্রীতি আছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে, আবার ইংরেজদের তোষণ আছে। এই যে নানা দিক আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মুসলমানদের, মুসলিম–মানসের মূল বিষয়গুলো কী এটা তুলে ধরার চেষ্টা করে বলেছি— এসবের ক্ষেত্রে ধর্ম বা ধর্মীয় সত্তা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তবে এটাই একমাত্র নয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনি তো অর্থনীতি নিয়েও বলেছেন। একটা জায়গায় আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর আবদুর রহিমের তুলনা করেছেন এভাবে যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারত থেকে আরবকে দেখলেন; মুসলমানরা আরব থেকে এসেছে এই কারণে ভারতের মুসলমানদেরকেও তিনি দেখালেন আরব থেকে যারা এসেছে তাদেরই সম্প্রসারণ হিসেবে। সে কারণে বঙ্কিমের ভারতবর্ষ হচ্ছে মূলত হিন্দুদের ভারতবর্ষ। আর আবদুর রহিম আরবদের দৃষ্টিতে ভারত এবং ভারতীয়দের দেখলেন। আপনি ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময়টা নিয়ে লিখেছেন, আমি যদি সেই সময়টাতে ফিরে যাই সেটা তো ছিল অবিভক্ত ভারত। তখন হিন্দু–মুসলমান অনেকটা বাধ্যই ছিল কোনো–না–কোনো বিভেদে, সংকটে জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর, যখন উপমহাদেশটি দ্বি–জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল তখন এই সমীকরণটি কীভাবে কাজ করল? যদি একটু ব্যাখ্যা করেন পাকিস্তান পর্বের ২৪ বছর আর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ৪৪ বছর হিন্দু–মুসলমান বিভাজন সমস্যাটি কীভাবে কাজ করেছে?

আনিসুজ্জামান: আমার মুসলিম–মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪) এবং মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৬৯) এই বই দুটিতে, আমি বলব, মোটামুটি মুসলিম–মানসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার নানারকম পরিবর্তনশীলতার দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর পাকিস্তান পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমার লেখা 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধটি আছে। পরে অন্য লেখার মধ্যেও আছে।

ইংরেজ আমলের পটভূমিতে আমরা বলছি যে হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজন, মুসলমান প্রজা বা নিম্নবিত্ত মুসলমান—এই যে অর্থনৈতিক বিভেদটা এটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের একটা কারণ তৈরি করেছে। পাকিস্তান আমলে তো এটা ছিল না। এরপরও পাকিস্তান আমলে কেন দেশীয় পরিচয়কে ছাপিয়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়টা কার্যকর হলো? এটাকে আমার অনেক বড় একটা প্রশ্ন মনে হয়। আমার নিজের মনের মধ্যেও এই প্রশ্নটা আসে। সেটা প্রধানত আসে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই পাকিস্তানের মধ্যে যে নানা ভাষাভাষী মানুষ, তাদের যে অধিকার, সেটা এখন দলিত হচ্ছে কেন? তবে পাকিস্তান আমল নিয়ে আমার যে লেখা তাতে বিষয়টা ঠিক এইভাবে আসে নি। কিন্তু আমার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা, নজরুল সম্পর্কে লেখার মাঝে এগুলো উঠে এসেছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনি তো নানাভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এবং আপনি ক্রমাগত একটা বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন, সতর্ক করে যাচ্ছেন যে, সাম্প্রদায়িক চিন্তাটি কোনোভাবেই মানুষের পরিচিতির মূল হতে পারে না এবং তার সৃজনশীলতা বা ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে এই পরিচয়টি কখনো প্রধান হতে পারে না।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের সময়ের দিকে তাকাই, একেবারে বর্তমান সময়ের দিকে, যেমন ধরুন, ভারতে

সাম্প্রতিক নির্বাচনে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরের সময়ের দিকে, তাহলে কি বলা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রীয় আরবভীতি কি ভারতে আবার ফিরে এসেছে? এবং আবদুর রহিম যা ভেবেছেন, তার একটা চর্চা কি বাংলাদেশে হচ্ছে? বা আমরা একটা বিপদের মধ্যে কি পড়ছি? আমার তো মনে হচ্ছে, পড়ছি। সেক্ষেত্রে এ থেকে উত্তরণের উপায়টা কী?

আনিসুজ্জামান: ভারতের ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এরকম মনে হচ্ছে। মোদী নির্বাচনের আগের অনেক বক্তৃতায় শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীদের ভাগ করেছেন ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে। হিন্দু হলে শরণার্থী, মুসলিম হলে অনুপ্রবেশকারী। এই যে দৃষ্টি, এটি নিশ্চয়ই খুবই সাম্প্রদায়িক এবং বাংলাদেশে এখন যেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে যেটা আমরা ঠেকাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না, তা-ও এমনই হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার নয় শতাংশে নেমে এসেছে এবং এখনো হিন্দুদের ওপর এক ধরনের নির্যাতন হচ্ছে তারা যাতে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। আমরা একধরনের সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করার চেষ্টা করছি বা লালন করছি। এটা তো পেছনের দিকে চলে যাওয়া। কত পেছনে আমরা যাচ্ছি সেটা বলা মুশকিল, কিন্তু পেছনে যে যাচ্ছি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এ প্রসঙ্গেই আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি সামাজিক ইতিহাস রচনার বিষয়ে। এখন এই সময়ে এসে সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য সাম্প্রতিক অনেক বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, যেমন নারীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার বিস্তার, নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে যারা কাজ করছেন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা দেশে এসে কীভাবে তারা প্রয়োগ করছেন এবং এই যে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটছে, রাজনীতির মাঝে সাম্প্রদায়িকতা যে পাকাপোক্তভাবে ঢুকে গেছে, এসব তো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত—এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তাটা কী হবে?

আনিসুজ্জামান: আমার মনে হয় শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোনো দেশেরই সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে কতগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমাজের বিকাশ ক্ষেত্রের যে নানা উপাদান সেইগুলো যেভাবে ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করে বা মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করে সেইটা বুঝতে পারলে সমস্যা বোঝা যায়, সমাধানের ইঙ্গিতটাও পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস থেকেই আমি সামাজিক ইতিহাসের কথা বারবার বলেছি এবং সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় ওই সৃষ্টিশীলতা দেখার চেষ্টা করেছি। মানুষ কী পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার সৃষ্টিকর্ম করছে এবং সেই পরিবেশের কী প্রভাব তার মধ্যে পড়ছে আবার তার সেই কাজটি পরিবেশকে কীভাবে প্রভাবান্বিত করল। এখন আমাদের যে সামাজিক ইতিহাস, বাংলাদেশের এই চুয়াল্লিশ বছরের যে ইতিহাস, আজকের এই সময়ে এসে আমরা দেখি যে, এত বড় একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশ স্বাধীন হলো, আমরা কতগুলো আদর্শ স্থির করলাম যে আমরা এদিকে এগোব, তিন-চার বছরের মধ্যেই অনেক বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং কেন হলো? আমি বারবার করেই বলেছি যে পঁচাত্তর পরবর্তী যে পরিবর্তন এইটা মানুষ চেয়েছিল বলে আমরা কোথাও দেখতে পাই না। কেউ বলে নি আমি ধর্মীয় রাষ্ট্র চাই। যারা শাসক তারাই বলল যে তোমাদেরকে একটা রাষ্ট্রধর্ম দিলাম। কেউ বলে নি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে দাও। এঁরাই বললেন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নই। এখন সাধারণ মানুষকে যখন ধর্ম নিয়ে বোঝানো যায় তখন তারা কিছুটা অভিভূত হয় বৈকি। বলা যেতে পারে, তাদেরকে রুপোর থালায় করে একটা উপহার দেওয়া হলো তখন তারা সেটা দু'হাতে নিয়ে নিল। এই ধরনের একটা ব্যাপার হলো। কিন্তু নেওয়ার পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা রাজনীতিক নেতা তাঁরা সাহস করে আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারছেন না। তারা খুবই চিন্তা করছেন তাদের একটা ধর্মীয় মুখ সবার কাছে প্রকাশ করতে। এটাকে আমি বলেছি একটা অনগ্রসর চেষ্টা। কারণ পাকিস্তান

সৃষ্টির পরে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে একধরনের, বলা যেতে পারে উন্মত্ততা ছিল। কিন্তু শীঘ্রই আমরা দাবি জানালাম, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই। আমরা ধর্মীয় রাষ্ট্র চাই না। আর আমরা এত বড় একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন আনলাম সেটাকে ধরে রাখতে পারছি না। সেখানে ফির যেতে পারছি না বা সেখানে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছি যে লোকে কী বলবে। এটা আমাদের একটা রাজনৈতিক ব্যর্থতা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: একজন সামাজিক ইতিহাসবিদ কীভাবে সামাজিক ইতিহাস রচনা করবেন? তিনি কীভাবে এই সমাজকে সচেতন করতে পারেন? আমি প্রশ্নটি তুলছি, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর বিভ্রান্তি আমাদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে, এবং সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই বিভ্রান্তি দূরে রাখতে পারছি না। ফলে তরুণ যারা সামাজিক ইতিহাস পড়ছে তারাও বিভ্রান্ত। যাঁরা ইতিহাস লিখছেন তাঁদের পদ্ধতিগত কারণেই হোক আর শব্দচয়নগত কারণেই হোক একধরনের কাঠিন্য আছে লেখার ভেতর। সেসব অনেকের বোধগম্য হয় না। মানে গবেষণালব্ধ চিন্তা-ভাবনাকে যেন একটা কাঠিন্যে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনার ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখি নি। সরদার ফজলুল করিম আপনার একটি বই সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন যে, প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, না-জানি এই বইটি কত ভয়ানক হবে। কিন্তু যতই পড়লেন দেখতে পেলেন আপনি সরল ভাষায় লিখেছেন এবং খুব পরিষ্কারভাবে লিখেছেন। এই তো গেল আপনার প্রকাশগত দিক। কিন্তু চিন্তাগত দিকে কী ধরনের শৃঙ্খলা ইতিহাসবিদদের মধ্যে থাকতে হবে আর দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে কী ধরনের চিন্তাভাবনা তাদের থাকতে হবে যাতে তরুণদের মধ্যে সেই বিভ্রান্তিটা দূর হতে পারে।

আনিসুজ্জামান: আমার মনে হয় যে বিষয়টাকে সামগ্রিকভাবে দেখার যে চেষ্টা সেটাতে আমাদের ঘাটতি আছে। আমরা সব জিনিসকেই টুকরো টুকরো করে, খণ্ডিত করে ফেলেছি। ফলে একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না। আবার যে খণ্ড একটা বৃহতের অংশ সেই খণ্ডটাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃহৎটা আড়ালেই চলে যাচ্ছে। এই একটা ত্রুটি আমাদের আছে। আপনি লক্ষ করে থাকবেন আমি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেটা সম্পাদনা করছি বাংলা একাডেমি থেকে, গোড়ায় ওই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় চেতনার বিকাশ এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এই জন্য যে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানছি, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম বিকাশের কথা জানছি না কিংবা এর পটভূমি জানছি না, তাতে একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। আমি যে পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলছিলাম তা এই যে, আমরা সবটাই সামগ্রিকভাবে দেখি, তারপরে একটা বিশেষ দিকের পরে জোর পড়ুক ক্ষতি নেই। কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা দরকার। সাহিত্য বা সংগীত অনেকখানিই সামাজিক কাঠামো নিরপেক্ষ বা সামাজিক কাঠামো উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু ওই সামাজিক কাঠামো না থাকলে সেটা আসে না এই কথাটা বুঝতে হবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: সামাজিক ইতিহাসের একটা পদ্ধতিগত সমস্যা ছিল যে প্রান্তজন যারা, ব্রাত্য জনগোষ্ঠী, তাদের কথাটা সহজে আসত না। কারণ তারা পর্দার আড়ালেই থেকে যেতেন এবং এখনো যাচ্ছেন। আর নারীদের কথাও সেভাবে আসত না। এই দুই শ্রেণীই কিন্তু আমাদের সমাজ পরিবর্তনের মূলে কাজ করছে। আপনার লেখা যেহেতু সাহিত্য বিষয়ে এবং সমাজ যেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সাহিত্যে তা নিয়ে, আপনি কি ভাবেন আমাদের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে লেখা এবং আপনার পড়া বইগুলোতে দুই শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে?

আনিসুজ্জামন: রণজিৎ গুহরা যেটা করছেন, নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা। এই ধরনের একটা অভাববোধ থেকেই কাজটা তাঁরা করেছেন। আমি যে ওঁদের সব লেখাই পড়েছি তেমনটা নয় কিন্তু ওঁরা নিম্নবর্গ বলে

কোনো খণ্ডিত মধ্যে যাচ্ছেন কি না এই ভয়টা আমার মধ্যে কাজ করছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: 'মুসলিম মানস' নিয়ে যখন আপনি লিখেছেন আমার মনে হয়েছে প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তা লিখেছেন।

আনিসুজ্জামান: কারণটা হচ্ছে আমাদের লেখকদের মধ্যে ওই সমস্ত সময়ে বেগম রোকেয়া ছাড়া আর কোনো নারীকেই পাই নি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কিন্তু এই যে অদৃশ্য নারী তারা শুধু গৃহবন্দি হয়ে থাকবে, তাদেরকে নিয়ে মুসলিম সমাজে এর বাইরে কি কোনো চিন্তা–ভাবনা কখনো ছিল না?

আনিসুজ্জামান: না, হয়েছে। আমার মনে হয় যে বঙ্গভঙ্গের সময় যাঁরা লিখছেন খায়রুন্নেসা প্রমুখ, যাঁদের কথা মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্রে আছে। মুসলিম মানসে সামান্যই আছে। তাঁরা ওই যে 'ওঠো জাগো' নারীকে বলছেন যেটা তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আহ্বান করছেন, সেখানে চিন্তার একটা বড় দিক আছে। একজন–দুজন বললেও তাঁরা কিন্তু চিন্তা করছেন যে নারীর একটা রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর কিছু করার আছে। একজন–দুজন ভাবলেও এটার খুব মূল্য আছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: ধরুন এক শ' বছর পর আপনার এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে একজন আপনার এই কাজের একটা সম্প্রসারণ করলেন, এবং লিখলেন কুড়ি শতাব্দীতে, একুশ শতাব্দীতে মুসলিম মানসের স্বরূপ সম্পর্কে, তখন নারীদের অবস্থান কীভাবে শনাক্ত হবে?

আনিসুজ্জামান: তখন নারীদের অবস্থানটা রোকেয়া–পরবর্তী যাঁরা তাঁদের চিন্তা দিয়ে দেখতে হবে এবং নিশ্চয়ই বেশ কিছু নাম পাব আমরা। সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, জাহানারা ইমাম।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এই যে পরিবর্তনটা হলো, যে পরিবর্তনটা আপনি যেখানে এসে থামলেন, ১৯১৮ সালে, আর এখন থেকে মাত্র চার বছর পরে ২০১৮ সাল—এই এক শ' বছর সময়ে আমাদের সমাজে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আর কোনো সমাজে এতটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয়?

আনিসুজ্জামান: আমার সন্দেহ। আমি নিজে জানি কম, তবু আমার মনে হয় এরকম বড় পরিবর্তন আর কোথাও হয় নি। আমি সেদিনও এক জায়গায় বলছিলাম যে, আমার মতে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমল মিলিয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে লক্ষযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে নারীর। কারণ সেই সাতচল্লিশ সালে রিকশায় পর্দা উঠিয়ে চাদর দিয়ে ঘিরে নারীদের বেরোতে হতো, সেখান থেকে নারীরা আজ কোথায় এসেছে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার খুব প্রিয় একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ। আপনি এটা ১৯৯৩ সালের দিকেই বোধহয় শুরু করেন। এরপর তো প্রায় একুশ বছর হয়ে গেছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটা বেশ বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কালচারাল স্টাডিজ এবং কালচারাল প্লুরালিজম। আমাদের মতো দেশের জন্য সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি খুব সংক্ষেপে অন্যদিন পাঠকদের জন্য এই বিষয়টা কি বুঝিয়ে বলবেন—এই সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আনিসুজ্জামান: আমি আসলে যেটা দেখি একটা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে নানা ধরনের মানুষ বাস করছে তার ধর্মীয়, শ্রেণীগত, নৃতাত্ত্বিক এই পার্থক্যগুলো এক জায়গায় ধরে রাখা হচ্ছে। এখন এই প্রত্যেকটা অংশের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেইটার যদি জায়গা আমরা না দিই তাহলে একধরনের পীড়নের ব্যাপার ঘটে। আমরা যখন ইংরেজের অধীনে ছিলাম তখন যে পীড়ন সেই পীড়নটা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল, আবার পাকিস্তান আমলেও আমরা একধরনের পীড়নের মধ্যে

ছিলাম, কিন্তু এরপরও যে পীড়নটা হয়েছে যেটা আমরা নিজেরাই করেছি, হয়তো অন্য নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর ওপর, পাহাড়ি বা সমতলের অন্য যে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তাদের ওপর। আমার ধারণা এটাই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির যে বহুত্ববাদ সেটা দেখতে না পারার ফল। এক অর্থে আমি নিজেদের দোষ কম দেব, কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছে। কাজেই আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন আমরা নিজেদেরকে সমজাতীয় হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছি। এই হোমোজেনেটির কাছে ওই বহু সত্তাটা চোখে পড়ে নি। আর যখন চোখে পড়েছে তখন একধরনের পীড়ন হয়ে গেছে। যা থেকে তারা সহজে মুক্ত হতে পারবে না।

এখন আমাদের সময় এসেছে নিজেদেরকে শোধরানোর। তাদেরকে জায়গা করে দেওয়ার এবং তাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার। কাজটি খুব সহজ নয়। আমরা দেখি যে আমরা এখনো বাংলাই ঠিকমতো প্রচলন করতে পারছি না। এখানে মারমা ভাষায় পাঠ্যবই লেখা এবং সেই ভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া এটা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে হবে। কিন্তু হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে একটা চেষ্টা হতে পারে। আমরা যদি অন্তত বুঝি যে ওই ভাষা যারা বলে তাদেরও এই অধিকারটা জন্মগত এবং যতদূর পারা যায় রাষ্ট্রের পক্ষে সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার তাহলেই অনেকটা হয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এক্ষেত্রে স্যার, কালচারাল মনোপলিজম—যা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের বিপরীত তা কিন্তু পশ্চিমেও, যেমন যুক্তরাষ্ট্র আর ইংল্যান্ডেও ছিল। যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন মনোপলিজমের যুগটাই চলছিল। এরপর যখন আশির দশক থেকে মাল্টিকালচারালিজমের চর্চা শুরু হলো পৃথিবীজুড়ে তখন হয়তো আমরা সেদিকেই গিয়েছি। সেক্ষেত্রে আমরা যে আন্তর্জাতিক চর্চা থেকে খুব-একটা পিছিয়ে রয়েছি তা কিন্তু বলা যাবে না। এরপরে কিন্তু আপনি যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন তখনো সংস্কৃতি বলতে মূলধারার সংস্কৃতি বা একক সিঙ্গুলার একটি বিষয় বোঝানো হতো। এখন তো কালচারের জায়গায় কালচারস এসেছে। বহুত্ববাদ মানুষ গ্রহণ করেছে।

আনিসুজ্জামান: এটার একটা উদাহরণ আমি দিই। আমেরিকায় একটা খুব নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স বই ছিল সোর্সেস অব ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন। ওই একটা সিরিজ ছিল সোর্সেস অব জাপানিজ ট্র্যাডিশন, সোর্সেস অব চাইনিজ ট্র্যাডিশন ইত্যাদি। ওর নতুন সংস্করণে আমার একটা লেখা আছে এবং ওরা বইটির নাম রেখেছে সোর্সেস অব ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনস। ষাটের দশকের এই বইটার চল্লিশ বছর পর এসে যখন সংস্করণ বের হয়েছে তখন প্লুরাল এসে গেছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এখন এই বিষয়গুলো তো আমরা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী তা স্বীকার করে নিচ্ছে। কাজেই তাদেরকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষেত্রে ওই বিষয়টা যদি নিশ্চিত করতে পারতাম যে, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদটা টিকিয়ে রাখা জরুরি এবং তা যদি পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে হতো কিংবা আমাদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে হতো তাহলে একটা চমৎকার ব্যাপার হতো।

আনিসুজ্জামান: এটা হতে পারত যদি আমরা ওই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো, যে শিক্ষক নিজেই ঠিক করবেন যে তিনি কী পড়াবেন—যদি এরকম ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু আমরা সিলেবাসটাকে এত কঠিনভাবে ধরে রাখলাম বা কেন্দ্রীভূত করে রাখলাম বলেই এমনটা হয়েছে। আমার এক বন্ধু শিকাগোতে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিল। ওর ঘরে ঢুকে একদিন দেখি ভারতীয় সিনেমার পোস্টারে ভরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী করছ?

সে বলল, আমি ইন্ডিয়ান ফিল্ম পড়াচ্ছি। ও একজন ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও ওর কিন্তু ওই স্বাধীনতা আছে ইতিহাসের জায়গায় ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলার। কিন্তু আমি যদি কোনো-একজন লেখক সম্পর্কে

আলোচনা না করে কালচারাল স্টাডিজ–এ যাই তাহলেই বলবে উনি কিন্তু সিলেবাস পড়াচ্ছেন না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: তত্ত্বের একটা ব্যাখ্যা আছে যে এরকম এ হচ্ছে নানান কাচের ভেতর দিয়ে সাহিত্যকে দেখা। তত্ত্ব নানা কাচের জোগান দেয় যেমন মার্কসবাদী তত্ত্বে আমরা বহুদিন অভ্যস্ত ছিলাম। এখন উত্তরাধুনিক তত্ত্ব এসে যাওয়ায় অনেকে সন্দেহ করছেন পুঁজির আবার নতুন করে বিকাশ ঘটছে কি না কিংবা পুঁজির আবার অনুপ্রবেশ ঘটছে কি না। আপনি কী মনে করেন তত্ত্ব বা থিওরি আসলেই কি সে ধরনের কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে?

আনিসুজ্জামান: তত্ত্ব যে কোনো সম্ভাবনা তৈরি করে তা আমার মনে হয় না। কিন্তু তত্ত্ব যেটা করতে পারে আমার চিন্তা–ভাবনাটাকে কিছুটা ওর অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। বাস্তবে হয়তো হচ্ছে না। কিন্তু চিন্তাটা ওইদিকে ধাবিত হতে পারে। আর আমাদের বাংলা বিভাগে কেন হচ্ছে না সেটা বলি, আমরা একধরনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি যে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আসব না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্য পড়াব না, সাম্প্রতিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব না। ফলে সব সময় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান রাখতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলছি। এটা কিছুটা ভাঙার চেষ্টা করেন মুনীর চৌধুরী। এঁর একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। পড়াশোনা ছিল অনেক।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আচ্ছা, জীবনী বা বায়োগ্রাফি লেখার প্রতি আপনার আগ্রহ তৈরি হলো কীভাবে?

মুনীর চৌধুরীর জীবনী লিখেছেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লিখেছেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবনী লিখেছেন। জীবনী লেখার প্রতি আপনার আকর্ষণের কারণ কী?

আনিসুজ্জামান : ঠিক যে আমি জীবনী লিখব বলেই শুরু করেছিলাম তেমনটা নয়। মুনীর চৌধুরীরটাই শুধু একদম মনের তাগিদ থেকে লিখেছিলাম। তারপরে অনেকটা অনুরোধে পড়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনী লিখেছি ছোটদের জন্য বা মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবনী লিখেছি। এরপর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের অনেককে নিয়েই লিখেছি। এটা আসলে একটা কর্তব্যবোধ থেকেই লেখা। এসব লেখা প্রচলিত বায়োগ্রাফি লেখার ধারা থেকে বোধহয় আমি একটু বের হয়েই লিখেছি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আমরা জীবনী থেকে একটু আত্মজীবনীতে আসি। আপনি একখণ্ড আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন 'কাল নিরবধি' এবং তারপরে আপনি লিখতে শুরু করেছিলেন 'বিপুলা পৃথিবী'। প্রশ্ন হচ্ছে, বিপুলা পৃথিবী সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা?

আনিসুজ্জামান: আমি আশা করছি ২০১৪ সালেই শেষ করব। আমি ২০০৭ পর্যন্ত এসে থামতে চাই। ২০০৭ পর্যন্ত দুটি কারণে, আমার সত্তর বছর পূর্ণ হয় ২০০৭ সালে। আর ২০০৭ সালে আমাদের রাজনীতিতেও একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জায়গায় নতুন একধরনের সরকার এলেন, যারা দুই বছর দেশ চালালেন। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন আর আমার নিজের জীবনের একটা বিশেষ পর্যায় এই দুটা মিলেই ২০০৭ সালে এসে থামব।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনার আত্মজীবনী 'কাল নিরবধি' এবং 'বিপুলা পৃথিবী'র যতখানি ছাপা হয়েছে ততখানি পড়ে মনে হয়েছে আপনি ভিন্ন একটি আঙ্গিকে আত্মজীবনী লিখছেন। প্রথাগত আত্মজীবনী লেখার ক্ষেত্রে 'আমিত্ব' চিন্তাটি একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে। আমি হচ্ছি কেন্দ্রে স্থাপিত একজন ব্যক্তিত্ব, আমাকে আবর্তন করে আমার চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে, 'আমি' তারই একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরছি। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি অনেক সময় নিজেকে প্রান্তে সরিয়ে রেখে অন্যান্য মানুষ কিংবা ঘটনাকে অনেক বড় করে দেখছেন। এবং দ্বিতীয় বিষয় যেটি আমার চোখে পড়েছে সেটি হলো আপনার একটা সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ। কৌতুকের মাধ্যমে অনেককিছু

বোঝাতে চেয়েছেন। তো আত্মজীবনী লেখায় আপনার উৎসাহ কোত্থেকে এল?

আনিসুজ্জামান: একটা তো হচ্ছে এই যে নানাজনের পরামর্শে লিখতে শুরু করলাম। আর আমার সব সময় মাথার মধ্যে ছিল যে আমি যে সময়টা পার করে এসেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। অনেকগুলো বড় ব্যাপার তখন ঘটেছে। তখন ব্যক্তির চেয়ে যে সময়টা অনেক বড় এটা আমার মাথায় প্রথম থেকেই ছিল। সেটা ব্যক্ত করতে গিয়েই বোধহয় আমি যা লেখার সেটা লিখেছি। আপনি যেটা বলেছেন যে ব্যক্তির চেয়ে ঘটনা বড় হয়ে গেছে। অনেক সময় নিজের ভূমিকা নেই বা নিজের ভূমিকা খুবই গৌণ সেরকম ঘটনাও বড় জায়গা পেয়েছে। আর ওই সরসতা বা কৌতুকের ব্যাপারটা কিছুটা বোধহয় আমার লেখার ধরনের ভেতরেই আছে। নিজের কথা বলতে গিয়ে অনেক সময়ই আমার মনে হয়েছে যে কৌতুককর কতগুলো পরিস্থিতি, সেটা কৌতুকের সঙ্গে বলাই ভালো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনি তো স্যার, একটা শব্দকোষ করেছিলেন। আইন শব্দকোষ। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। আপনি কি কখনো ডিকশনারি লেখা বা লেক্সিকোগ্রাফি নিয়ে ভেবেছেন? পুরোনা দিনের পণ্ডিতদের একটা বড় প্রমাণ ছিল যে তাঁরা লেক্সিকোগ্রাফি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। স্যামুয়েল জনসন থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের সুনীতিকুমার পর্যন্ত|

আনিসুজ্জামান: আমার মনে আছে ১৯৬৯-এ আমি চট্টগ্রাম যখন গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, তখন কোনো এক প্রকাশকের অনুরোধে সৈয়দ আলী আহসান আমাকে বলেছিলেন:'তুমি একটা ছোট অভিধান সংকলন করে দাও'। আমি রাজি হই নি। আমি বলেছিলাম একটা ছোট অভিধান বের করতে হলেও যে পড়াশোনা লাগে, যে সময় দিতে হয়, আমি এখন সেটা দিতে পারব না। ওই ভয়েই ওইদিকে যাই নি। আর আইন শব্দকোষটা তো একেবারেই হলো কিছুটা সংবিধানের কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার চেষ্টা। হাবিবুর রহমান সাহেব থাকায় ভরসাও পেলাম।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: সংবিধান যখন বাংলায় লেখেন অনুবাদ তো আপনিই করেছেন, তখন কোনো সমস্যা হয়েছে কি?

আনিসুজ্জামান: আমি সংবিধানের কাজটা হাতে নিলাম ড. কামাল হোসেনের পরামর্শে। গণপরিষদে আমার এক স্কুল জীবনের সহপাঠীও কাজ করত। নেয়ামাল বসির। আর ওর এক সহকর্মী আলম। আমরা এই তিনজন মিলে একটা টিম। তো নেয়ামাল বসির যেহেতু গণপরিষদের কাজ করেছিল, ওর অনেক বিষয় জানা ছিল, যেটা অনেক বেশি কাজে লেগেছিল। তবে আমার সঙ্গে ওর যেটা পার্থক্য ছিল সেটা হলো কতগুলো ব্যাপারে ও খুব রক্ষণশীল ছিল। যেমন আমি বলতাম যে বাংলায় বহুবচনের ব্যবহার আসলেই নেই। মানে আমরা যদি বলি যে সংসদীয় বিষয় তাহলে সংসদের বিষয় বলেই বোঝায়। কিন্তু ও খুব জোর করত যে ইংরেজিতে যদি বহুবচন থাকে তাহলে বাংলাতেও থাকবে। আমি ওর কথা মেনেছি, কিন্তু আমি লিখতে কখনোই স্বাচ্ছন্দবোধ করি নি। কিন্তু এটা একটা আনুষ্ঠানিক রচনার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছি। ও বলছে এই ইংরেজিতে এই একটা পার্থক্যই অনেক কিছু বোঝায়, বাংলাতেও আমাদের এটা রাখতে হবে। এই একটা বিষয় ছিল। আর ওর কতগুলো অসাধারণ গুণ ছিল। অনেক শব্দ ওর দান। যেমন, আমরা যেটা সংবিধানে ব্যবহার করেছি ওমবাডসম্যান অর্থে 'ন্যায়পাল' শব্দটা। আমি তো মনে করি লোকপালের চেয়ে ন্যায়পাল শব্দটা অনেক বেশি ভালো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: স্যার আমি শুনেছি, স্বাধীনতার পর অনেকেই বলছেন, সংবিধানটা ছিল স্বপ্নের দলিল। আপনার নিজের কি কখনো মনে হয়, যখন কাজটা করেছিলেন তখন কি মনে হতো অসাধারণ সুন্দর একটা সংবিধান করছেন আপনারা?

আনিসুজ্জামান: আমরা ন' মাসে সংবিধান করতে পারলাম এবং ইংরেজি খসড়ার মূল যেটা তার সঙ্গে

সমানে পাল্লা দিয়ে বাংলাটা করতে হয়েছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনারা যে পরিশ্রমটা করলেন তার একটা পরিপ্রেক্ষিত ছিল; যে পরিপ্রেক্ষিতটার যোগান দিয়েছিলেন সাধারণ জনগণ। যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা অনেকেই। এখন যে স্যার সেই সংবিধানের শরীরে অসংখ্য কাটাছেঁড়া হয়েছে, এখন এই সংবিধানটা দেখে আপনার কী মনে হয়?

আনিসুজ্জামান: খুবই কষ্ট পাই। আমাকে ব্যারিস্টার মওদুদ একদিন বলছিলেন যে, আমি যখনই বাংলা সংবিধানে হাত দিই, আপনার কথা মনে পড়ে। তো আমি ওকে বলেছিলাম, আপনারা তো আর আমার কাজ রাখেন নি কিছু। এই যে পনেরোবার সংশোধন হলো এর মধ্যে কয়েকবারই হয়েছে ব্যক্তির প্রয়োজনে বা দলীয় প্রয়োজনে। সেটাই কষ্ট লাগে যে, কেন এটা হলো? আমি আমার দুঃখের কথা বলি, সংবিধান যখন হচ্ছে তখন একেবারে সচেতনভাবে ডিটেনশন সংক্রান্ত কোনো বিধান রাখা হয় নি। নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা যেটা।

একবছরের মধ্যে সংশোধন আনা হলো। এটাই আমাকে বেশি কষ্ট দিল যে আমরা এত ভালো একটা সংবিধান করলাম আর মাত্র একবছরের মধ্যেই তাতে সংশোধন আনার প্রয়োজন হলো? তার পরে তো আরও হলো।

এখন সংবিধানের যে অবস্থা তাতে তো মূলের যে চেতনা তার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যে মূলে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা অনেকটা গোঁজামিলের মতো মনে হচ্ছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: বোধহয় আর কোনোদিন সেখানে ফিরতে পারব না। তার মানে আপনারা একটা অসম্ভব কাজ করেছেন যে কাজটা এখন আরও অসম্ভব হয়ে গেছে। স্যার, এখন আমরা আপনার সাহিত্যকর্মের দিকে একটু যাই। আপনি কয়েকটা বিশ্বখ্যাত নাটকের অনুবাদ করেছেন অস্কার ওয়াইল্ডের An Ideal Husband-এর অনুবাদ 'আদর্শ স্বামী' এরপর আলেক্সেই আরবুঝভের An Old World Comed-র নাট্যরূপ 'পুরোনো পালা'। তো এর পেছনে অনুপ্রেরণা কী ছিল?

আনিসুজ্জামান: এগুলো আসলে প্রায় খেলাচ্ছলে করা বলা যেতে পারে। আরবুঝভের নাটকের ক্ষেত্রে যেটা হলো, নাটকটা পড়ে এত ভালো লাগল, তখন অনুবাদ করে ফেললাম। তো এই একটা অনুবাদ করার পর অনেকের আরও করার দাবি থেকে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকটির অনুবাদ করি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: অস্কার ওয়াইল্ড তো খুব চমৎকার কৌতুকস্রষ্টা। অসাধারণ রসময়। তাঁর অনুবাদ করতে সমস্যা হয় নি কোনো?

আনিসুজ্জামান: কিছু জিনিস তো বাদ দিতে হয়েছেই, যেগুলো আমাদের সংস্কৃতির পটভূমির সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু মূল জিনিসটা রাখতে হয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ড আমার কিন্তু বেশ অল্প বয়সে পড়া হয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আপনি এত আগে বইগুলো কোথায় পেলেন?

আনিসুজ্জামান: তখন তো পেঙ্গুইনের দৌলতে আমাদের সিনিয়র ভাইদের কারও-না-কারও কাছে পেয়ে যেতাম। আমার এক মামাতো ভাই ছিলেন, বিজ্ঞানের ছাত্র। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি এগুলো বেশি পেয়েছি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: আজকের সময়ে এসে পড়ার সংস্কৃতিতে একটা ভাটা পড়েছে, দেখার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। আপনি দেশে কালচারাল স্টাডিজের অন্যতম একজন পথিকৃৎ। আমাদের দেশে দৃশ্যমাধ্যমের প্রভাবটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

আনিসুজ্জামান: প্রভাব তো খুব গভীর। মানে আমাদের ভাষাকে পর্যন্ত বদলে দিচ্ছে। এই যে আমরা চিরকাল বললাম দেখাশোনা করা, এখন বলছি দেখভাল! খবরের কাগজে লিখছে, বড় লেখকরাও লিখছেন। এটা তো মাত্র একটা উদাহরণ।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: ঢাকা শহরে তো অন্তত পঞ্চাশটা ভালো বইয়ের দোকান ছিল একসময়। কিন্তু এখন পাঁচটাও ভালো বইয়ের দোকান নেই কেন? আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এটা কি আমাদের দীনতা?

আনিসুজ্জামান: এটা তো আমার কাছেও অবাক লাগে, আজিজ সুপার মার্কেটে বইয়ের দোকান কমে যাচ্ছে, এখন সব কাপড়ের দোকান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এর ধারেকাছে একটা বইপাড়া চালু হয়েছে কাঁটাবনে। তবে আমি জানি না ওখানে বইপাড়াটা কেমন হচ্ছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: স্যার, আমরা জেনেছি যে আপনি তরুণ বয়সে অণুগল্প লিখতেন। এবং তার জন্য বেশ প্রশংসিতও হয়েছেন। তো আপনি গল্প লেখা থেকে চলে এলেন কেন?

আনিসুজ্জামান: একসময় বনফুলের গল্প খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। তার থেকে আমি গোড়ার দিকে ওরকম একপৃষ্ঠার গল্প লিখতাম। ওয়ান মিনিট স্টোরি যাকে বলে সেগুলো লেখার চেষ্টা করেছি। তারপর আর একটু বড় পরিসরে লেখার চেষ্টা করেছি। মূলত এম.এ. পড়ার সময় পর্যন্ত লিখেছি গল্প। তারপর নিজের কাছেই মনে হলো, আমি বোধহয় ভালো গল্প লিখতে পারছি না। যা লিখছি খুবই সাধারণ এবং এটুকু না লিখলে বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হবে না। এরপরই বন্ধ করে দিলাম। এবং পাছে মায়া লাগে একারণেই সেইসব গল্পের যত কপি, কাটিং সেসব ফেলে দিয়েছি। গল্পগুলো একটা বড় খামে রাখতাম, তা সুদ্ধ ফেলে দিয়েছিলাম।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: পত্রিকায় ছাপা হয় নি কোনো গল্প?

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ, হয়েছিল, তবে বই হয় নি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : আচ্ছা, এটার কারণটা কী? আপনার সমালোচক সত্তাটা কি এতটাই প্রবল ছিল যে আপনার সৃষ্টিশীল সত্তাকে পরাজিত করেছিল? কিংবা এখনো কি আপনার ইচ্ছা রয়েছে সৃজনশীল সাহিত্যে মনোনিবেশ করার?

আনিসুজ্জামান: অনেক পরে এসে মইনুল আহসান সাবেরের অনুরোধে একটা গল্প লিখেছিলাম। '৯০-এর কোনো একটা সময়ে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারও গল্প লিখেছেন। উপন্যাসও লিখেছেন। আপনি কি কখনো উপন্যাস লেখার কথা ভাবেন নি?

আনিসুজ্জামান: উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এগোতে পারি নি। দুই-তিন চ্যাপটারের বেশি লেখার ধৈর্য থাকে নি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: নাটক বা মঞ্চনাটক লেখার ইচ্ছা কি কখনো হয়েছে ?

আনিসুজ্জামান: ইচ্ছা হয়েছিল। লেখার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আমি নিজেই বুঝলাম যে এটা হচ্ছে না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: এখন স্যার আপনার 'পদ্মভূষণ' নিয়ে একটু বলি। আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছি যখন শুনেছি আপনি পদ্মভূষণ পেয়েছেন। এটা শুধু আপনার নিজের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের সব মানুষের জন্যই বিরাট আনন্দের একটা উপলক্ষ। এই পুরস্কারের সঙ্গে আপনার কাজের একটা সমন্বয় আছে। শিক্ষা এবং সাহিত্য। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা গৌরবের বিষয়। একটা বিদেশি সরকারের কাছ থেকে এমন একটি সম্মানজনক প্রাপ্তি!

আনিসুজ্জামান: আসলে আমি নিজেও খুব সম্মানিত বোধ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই। আমার মনে হয়েছে, এ ধরনের একটি সম্মান এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনে সহযোগিতা করবে এবং সকলে যেভাবে খুশি হয়েছে সেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা আনন্দের বিষয়। ভারত সরকারের সম্মানের সঙ্গে আমার বন্ধু ও স্বজনদের আনন্দ যুক্ত করলে আমার জীবনের এ এক পরম গৌরবের বিষয়।

সামাজিক আন্দোলন

আজ থেকে ৬৫ বছর আগে, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিনে ঢাকায় নবাগত এক স্কুল ছাত্র পত্রিকার সংবাদ পড়ে হাজির হয়েছিল কার্জন হলে, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কী ঘটছে সেটা চাক্ষুষ করবার জন্য। স্কুল-বালকের পক্ষে এমন তাগিদ বিশেষ ব্যতিক্রমী বটে, আবার উদীয়মান বয়সের কোনো বালকের কাছে এমনই তো প্রত্যাশা রাখা উচিত সমাজের। সাহিত্য ও শিল্পর সঙ্গে বালকের এই যে যোগ পরবর্তী জীবনে সেটা থেকে তার আর বিচ্ছেদ ঘটে নি। এই বালক আনিসুজ্জামান, ভর্তি হয়েছিলেন নবাবপুর প্রিয়নাথ স্কুলে, দেখেছেন '৫০ সালের দাঙ্গা, তারপর যখন ভর্তি হলেন কলেজে, যুক্ত হলেন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কাজে, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, খালেদ চৌধুরী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও অন্য আরও তরুণের সঙ্গে মিলে গড়ে তুললেন অনন্য এক সাহিত্যবৃত্ত। অসাম্প্রদায়িক চেতনা আনিসুজ্জামানকে আকৃষ্ট করেছিল আরও নানামুখী কাজে, সম্পৃক্ত করেছিল যুবলীগের সঙ্গে। ফলে সাহিত্য ও সমাজ-পরিবর্তনের ব্রত দুইয়েরই অভিষিক্ত হয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। এরপর তিনি আর সবার সঙ্গে মিলে একুশের ভাষা আন্দোলন ঘিরে দাঁড়ালেন এসে রাজপথে, রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে, যেখানে ঘটেছিল জীবনের পাঠ নেওয়া। এমন যুবকের পরবর্তী জীবনসাধনা অর্জন করেছে বহুমাত্রিকতা, কৃতবিদ্য অধ্যাপক হয়েছেন তিনি, শিক্ষার্থীদের জন্য যাঁর ভালোবাসার অন্ত নেই, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিবেচনায় যোগ করেছেন নতুন মাত্রা, দেশ-বিদেশের সারস্বত সমাজের স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য হয়েছে। এই সমস্ত অর্জন সত্ত্বেও তিনি রয়ে গেছেন সেই নিরলস সমাজকর্মী, নিষ্ঠাবান সাহিত্যব্রতী, ভাষা আন্দোলনের প্রজন্ম, যাদের কাছে মানুষের মুক্তির প্রয়াস সর্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হয় এবং সেই মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নে চলে নিরন্তর অভিযাত্রা।

১৯৫০ সাল থেকে গণনা করলে সমাজমুক্তির পথে আনিসুজ্জামানের পরিক্রমণ প্রায় ৬৪ বছরের, আর এই অনন্য জীবনসংগ্রামে কত ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়াসেই না তিনি অবদান রেখে চলেছেন। পুঁথিগত বিদ্যার্জনে নিমজ্জিত অধ্যাপক তিনি নন, আরামকেদারায় সমর্পিত সাহিত্যব্রতীও নন, তিনি তাঁর অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও চিন্তাশীল রচনার পাশাপাশি যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তিসাধনায় নিরলসভাবে শ্রমদান করে চলেছেন তার ফিরিস্তিগ্রহণ তো বাঙালির মুক্তিসাধনার খতিয়ান নেওয়া, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সমাজ-সম্পৃক্ততার পরিচয়গ্রহণ। কাজটি অনেক বড়, এর এক চকিত উদ্ভাসন আমরা পেতে পারি সামান্য এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায়, যেখানে মেলে ব্যক্তি আনিসুজ্জামানের স্বরূপের সন্ধান, সমাজবিকাশের পরিচয় এবং মানবের ওপর অপরিমেয় আস্থার প্রকাশ।

মফিদুল হক: দেশভাগের পর খুলনা হয়ে আপনার তো ঢাকায় আসা এবং প্রথম ঢাকায় এসে একটা বড় ঘটনার সাক্ষী হলেন। '৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর এবং '৪৯-এর ১ জানুয়ারিতে সাহিত্য সম্মেলন হয়। আপনি তখনো ভর্তি হন নি স্কুলে।

আনিসুজ্জামান: '৪৯ সালে নাইনে ভর্তি হব।

মফিদুল হক: '৪৮ সালে খুলনা থেকে আসেন। ওই বয়সে সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়া হলো কেন আপনার?

আনিসুজ্জামান: একেবারেই সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহল থেকে। সাহিত্য সম্মেলন কী রকম হয়! আমি খুব ছেলেবেলায় '৪৫ সালে আব্বার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে যাই, কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে— সেই প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়া। ১৯৪৫ সালে যখন সম্মেলন হচ্ছে কাগজে দেখলাম; তো কৌতূহল হলো।

মফিদুল হক: সেই সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় আপনি কোন ক্লাসে পড়তেন ?

আনিসুজ্জামান: ক্লাস ফাইভে।

মফিদুল হক: খুলনা থেকে ঢাকায় এসে সাহিত্য সম্মেলনের খবর কীভাবে পেলেন ?

আনিসুজ্জামান: খবরের কাগজে, খবরের কাগজ নিয়মিত পড়তাম। খবর দেখে একাই চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে।

মফিদুল হক: শান্তিনগরের বন্ধুবান্ধব তখনো হয় নি আপনার?

আনিসুজ্জামান: বন্ধু ওরকম হয় নি, কারণ আমরা ঢাকায় এসেছি ডিসেম্বরেই। আর সম্মেলনটা ডিসেম্বরের শেষে হয়েছে।

মফিদুল হক: এটা কি নিয়তির টান বলব?

আনিসুজ্জামান: এটা একটা অকালপক্কতা।

মফিদুল হক: আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে ক্লাস নাইনের একটা ছেলের জন্য সাহিত্য সম্মেলনে হাজির হওয়াটা। সাহিত্য সম্মেলনে তো সার্কাসের খেলা নেই, নাচ-গানের বিষয় নেই, কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন।

আনিসুজ্জামান: সাহিত্য সম্মেলনে অনেক বিশিষ্টজনকে দেখছি। কথা কিছু শুনছি। কিছু বুঝছি, কিছু বুঝছি না। মজার বিষয় হলো, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী— উনি তখন জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক, উনি সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমিও তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? খুব স্নেহের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, আমি খুব খুশি হলাম। পরিচয়টা ওখানে। শুনলাম সাহিত্য সম্মেলনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সবটা শুনি নি। সবটা দেখিও নি। কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সবমিলিয়ে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে, এটি কৌতূহলের বিষয় ছিল।

মফিদুল হক: সাহিত্য সম্মেলনে আপনি ছিলেন ইয়ংগেস্ট অডিয়েন্স। তারপর স্যার, প্রিয়নাথ স্কুলে ভর্তি হলেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার সংযুক্তি শুরু হলো। সেটা কীভাবে কখন হলো?

আনিসুজ্জামান: সেটা বলা যেতে পারে যে, ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে আমরা কয়জন যুক্ত হয়েছিলাম। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে যাওয়া, সভায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে হয়েছিল।

মফিদুল হক: আপনি একটা সাহিত্য মজলিসের কথা বলছিলেন। সেটা কি দেশভাগ হওয়ার পর হলো ? যেটা অমিয়বাবু বোধহয় পরিচালনা করতেন।

আনিসুজ্জামান: ও। লেখক শিল্পী মজলিস। সেটা আগে ছিল। ৪৯৫০-এ কয়েকটা প্রোগ্রাম করেছিল। আমি গিয়েছিলাম।

মফিদুল হক: আপনি প্রগতি লেখক সংঘের কোনো কর্মকাণ্ডে যান নি?

আনিসুজ্জামান: আমি যখন ঢাকায় এসেছি তখন সরকারি চাপে প্রগতি লেখক সংঘ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু অমিয়বাবুরা যে লেখক শিল্পী মজলিস করেছেন, ওখানে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী এসব অনুষ্ঠানে গিয়েছি।

মফিদুল হক: লেখক শিল্পী মজলিসের কথা কিন্তু খুব বেশি পাই না। প্রগতি সংঘের কথা যা একটু পাই।

আনিসুজ্জামান: এটা ৪৯-৫০ এ দুবছরই ছিল, আমার মনে হয়।

মফিদুল হক: তারপর ?

আনিসুজ্জামান: অমিয় চক্রবর্তী চলে গেলেন, উনি প্রাণশক্তি ছিলেন। দাঙ্গার পরে উনি চলে গেলেন।

মফিদুল হক: স্যার, উনপঞ্চাশের সাহিত্য সম্মেলনের পরে পঞ্চাশের দাঙ্গার কী অভিজ্ঞতা আপনার ?

আনিসুজ্জামান: দাঙ্গায় স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে একজন বোধহয় ছুরিকাঘাতে আহত হলেন। আর এমনিতে যা হয়, দাঙ্গা হচ্ছে তার একটা চাপ। তখন আমি খুব ছোট, দাঙ্গা প্রতিরোধে কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না। কিন্তু আমার এটুকু মনে পড়ে যে বাড়িতে সকলে খুব বিচলিত। তারা সবাই ধরে নিয়েছিল যে দাঙ্গা-টাঙ্গার

যুগ শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্তান হয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দু–মুসলমান বিরোধের কারণে আবার দাঙ্গা ঘটে গেল। এটা খুব খারাপ লাগল। তারপর আমাদের স্কুল দীর্ঘকাল বন্ধ থাকল। আমরা তদ্বির করে স্কুল আবার খোলাবার চেষ্টা করি। কিন্তু মনের ওপর খুব চাপ ছিল।

মফিদুল হক: পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সম্পৃক্তিটা কখন শুরু হয়?

আনিসুজ্জামান: সেটা হচ্ছে '৫১ সালে। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলাম, '৫১ সালের মাঝামাঝি,'৫১ সালের শেষ দিকে সওগাত প্রেসে যাতায়াত। সেই সূত্রে হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে পরিচয়। তখন তিনি বেগম দেখতেন। তার থেকেই সাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। সেটা ছিল অনেকের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র এবং এটাও যে হলো তার মূলে ছিলেন শিল্পী আমীনুল ইসলাম। আমার পাড়ায় থাকতেন। ওঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল, সাহিত্য সংসদ করতেন তাঁর বন্ধুরা। কাজেই আমাকে বলতেন, চলো যাই।

মফিদুল হক: একটা বিষয় সাধারণত বায়ান্নকে ঘিরে দেখি, তারুণ্যের নতুন উদ্ভাসন ঘটল। কিন্তু আসলে এটা ঘটল বলা যায় সাহিত্য সংসদকে ঘিরে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই তো একটা বড় ভূমিকা পালন করলেন।

আনিসুজ্জামান: বড় ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু ওই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের ভূমিকাটা বড়।

মফিদুল হক: সাহিত্য সংসদে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও তো অনেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

আনিসুজ্জামান: সেটা ধরো, নতুন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম, কিন্তু আবার ধরো, যদি যুবলীগের কথা বলা না যায়, তাহলে অন্তত বায়ান্ন সালটা ব্যাখ্যা করা যায় না।

মফিদুল হক: তার মানে অনেকগুলো ধারা–উপধারা মিলেই ভাষা আন্দোলনটা। সেখানে আপনি তো সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, আবার যুবলীগের সঙ্গেও ছিলেন। যুবলীগের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্তি ঘটল কীভাবে?

আনিসুজ্জামান: আমরা শান্তিনগর থেকে চলে এলাম ঠাটারীবাজারে। যুবলীগের অফিস খুব কাছে, যোগী নগরে। অসাম্প্রদায়িক সংগঠন, এটি আমাকে টানে। আমাকে রাজনীতি করতে হচ্ছে না। রাজনীতির ভয় নেই। আসলে অসম্প্রদায়িক বটে, কিন্তু অরাজনৈতিক হলেও রাজনীতি আছে, সেটা বুঝতে সময় লেগেছে।

মফিদুল হক: যুবলীগ আপনাকে টানল, না আপনি যুবলীগে গেলেন?

আনিসুজ্জামান: আমি যুবলীগের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে যাতায়াত আরম্ভ করলাম। অলি আহমাদ তখন সাধারণ সম্পাদক। উনি অফিসে করার জন্য কিছু কাজ–টাজ দিয়েছেন। তারপর বললেন যে, আপনি দপ্তর সম্পাদক হয়ে যান।

মফিদুল হক: তখন বামপন্থী দল বা কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তারা তো গোপনে কাজ করত। তাঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ...।

আনিসুজ্জামান: সেটা হলো ভাষা আন্দোলনের পরে। ভাষা আন্দোলনের কাজ যখন করছি, তার মধ্যদিয়েই চেনাজানাটা হচ্ছে। কিন্তু তারপরে যখন বলা হলো যে, প্রথমে পার্টির কথা বলা হয় নি, মতাদর্শ সম্পর্কে জানাবেন আর কি, তখন ক্লাসের কথা হলো, এটা দিয়ে আরম্ভ হলো।

মফিদুল হক: কে নিত তখন ক্লাস?

আনিসুজ্জামান: তখন সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের এক শিক্ষক ছিলেন। ইসমাইল সাহেব। উনি আমাদের বাড়িতে এসে ক্লাস নিতেন। একেকদিন আমরা স্কুলে এসেও মিট করতাম। পরে উনি শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকা বারে আইনব্যবসা করতে লাগলেন। অনেককাল আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হয়ে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ হয় নি।

মফিদুল হক: ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক কী মনে করেন ?

আনিসুজ্জামান: আমার দিক থেকে হচ্ছে পুস্তিকা লিখলাম, এটাকে আমার বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অন্যদিকে হচ্ছে, আমরা নিজেদের মনে করি, ভাষা আন্দোলনের প্রজন্ম। কারণ ভাষা আন্দোলন যে চেতনা দিয়েছে—জাতীয়তাবাদী চেতনা, মানবতাবাদী চেতনা, সবই ভাষা আন্দোলন থেকে পাওয়া—সে দিক থেকে ভাষা আন্দোলনের মানে দৃষ্টিভঙ্গির রুদ্ধতা থেকে মুক্তি, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি আরও উদার হয়েছে, আরও মুক্ত হয়েছে। এক ধরনের, বলা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক হয়েছে। তারপর বামপন্থার চর্চা, অল্পস্বল্প ক্লাস করা, কিছু বইপত্র পড়া, এর মধ্য দিয়ে চেতনার উন্মোচন হয়েছে।

মফিদুল হক: ভাষা আন্দোলনে অনেক রকম কাজের নতুন ধারা শুরু হলো, একুশে ফেব্রুয়ারির সংকলন গ্রন্থ যা হাসান হাফিজুর রহমান বের করলেন, পরে নির্বাচন এবং '৫৪-এর সাহিত্য সম্মেলন। এ পিরিয়ডটাতে আপনার যুক্ততা ছিল কোন কোন কর্মকাণ্ডে?

আনিসুজ্জামান: হাসানের একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে প্রথম থেকে যুক্ত হই। হাসান যখন পরিকল্পনা করছেন বা করবেন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে মিলে লেখক তালিকা করা...।

মফিদুল হক: আর কী কী উদ্যোগ ছিল? তখন কি যুবলীগের সক্রিয়তা ছিল ?

আনিসুজ্জামান: যুবলীগের সক্রিয়তা ওই তিপ্পান্ন সালে ছিল। এরপর ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হলো। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সরাসরি না, যেহেতু আমি সাহিত্য সংসদে কাজ করছি, যুবলীগে করছি, আমি আর ছাত্র ইউনিয়নে যাচ্ছি না। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের মেনিফেস্টো, গঠনতন্ত্র এসবের মুসাবিদার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। প্রায় একই ধরনের ব্যক্তি তো ওখানেও, মোহাম্মদ সুলতান সভাপতি হচ্ছেন। উনি যুবলীগে ছিলেন। মোহাম্মদ ইলিয়াস অবশ্য সরাসরি ছাত্র ইউনিয়নে এসেছেন। তারপর আমাদের আরও অনেকে ছিল। এর মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল যারা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে গোপনে সংশ্লিষ্ট ছিল।

তারপরে গণতন্ত্রী দল হলো। সেখানেও ওই দলের মধ্যে না ঢুকেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নানা ধরনেরলেখালেখির কাজ করি। একটা বিষয় হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক যে ঢেউ, এটার সঙ্গে থাকা। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালে নির্বাচন হওয়ায় এবং নির্বাচনের পরেও চলে এই ধারার সঙ্গে থাকা।

মফিদুল হক: চুয়ান্ন সালের সাহিত্য সম্মেলনের যে ধারণাটা, সেটা কীভাবে তৈরি হলো?

আনিসুজ্জামান: এটা এখন বললে খুব অবিশ্বাস্য শোনাবে। কিন্তু আমার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকায় আমি হাসানকে বললাম, একটা সাহিত্য সম্মেলন করলে কেমন হয়? হাসান তাৎক্ষণাৎ বলল, হ্যাঁ, ভালো। তারপরে অবশ্য আমরা যেটা করলাম, সাহিত্য সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হলো খুব জমকালোভাবে আর এ সাহিত্য সম্মেলন করার জন্য, ক্ষেত্রটাকে বড় করার জন্য যতদূর সম্ভব বিদ্বান, কবি-সাহিত্যিকদের টানা—যাঁদেরকে আমরা মনে করতাম যে প্রগতির পক্ষে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুর রহমান খাঁ ছিলেন। তারপর আবদুল গফুর সিদ্দিকী মূল সভাপতি হলেন, সেটাও আমার প্রস্তাব ছিল। কেননা, উনি কোথায় আছেন, কেউ জানত না। আমিই যোগাযোগ করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম।

মফিদুল হক: উনি তখন থাকতেন কোথায়?

আনিসুজ্জামান: উনি থাকতেন খুলনায়, ফুলতলার একটি গ্রামে। তারপর ওঁর যে অভিভাষণ, সেটাও আবদুল্লাহ আল মুতী আর আমি মিলে লিখলাম, তার মধ্যে আবার পুরোনো সওগাত থেকে সেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠন করার কথা যোগ করে দিলাম। ফলে কেউ আর মনে করে নি যে ওটা অন্যের লেখা।

মফিদুল হক: '৫২ সালে কুমিল্লায় যে সাহিত্য সম্মেলন হলো, সেটাতে আপনি গিয়েছেন?

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ, ওখানে আমি গেছি। ওখানে গেছি নও বেলালের সাংবাদিক হিসেবে। রিপোর্ট করতে।

মফিদুল হক: কুমিল্লার সম্মেলনের কথা আপনার কি মনে পড়ে ?

আনিসুজ্জামান: কুমিল্লাতে সাহিত্য সম্মেলন খুব প্রেরণাদায়ক ছিল এবং সেই প্রেরণাতে '৫৪ সালের সাহিত্য সম্মেলনের ধারণা আসে। আর কুমিল্লায় তাৎপর্য দুটো দিক থেকে। একটা হচ্ছে চট্টগ্রামের প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ। যদ্দুর মনে পড়ে ঢাকার অগ্রণী শিল্পীগোষ্ঠীও অংশ নিল। গানের দল, নাটকের দল, সাহিত্যের আলোচনা—সব মিলিয়ে একটা সাড়া জাগানো ব্যাপার ছিল, জাগরণের ভাব। ওখানে একটা প্রধান কথা ছিল বিশ্বশান্তি। তারপরে ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা।

মফিদুল হক: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও তো এসেছিলেন?

আনিসুজ্জামান : উনি ছিলেন সভাপতি, মূল সভাপতি।

মফিদুল হক: চুয়ান্ন সালের সাহিত্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের আনার আইডিয়াটা কার?

আনিসুজ্জামান: এটা কীভাবে যেন ঘটেছে... সবটা মনে নেই। তবে প্রস্তাবটা সবাই মিলে গ্রহণ করেছে। যদিও যাঁরা সম্মেলনের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের আনার ফলে বেশি বিরোধিতা করার সুযোগটা পেয়েছেন।

মফিদুল হক: খুব বড় মাপের আয়োজন, অর্থসংগ্রহ, সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কীভাবে হলো?

আনিসুজ্জামান: হাসানের কৃতিত্ব আছে। পরে অনেকে সাহায্য করেছেন। আবদুল গনি হাজারী এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন এঁরা কনভেনর ছিলেন। এঁদেরও নানা ধরনের যোগাযোগ ছিল। আমি, হাসান, বোধহয় বোরহানও —আমরা তিনজন গেলাম আরপি সাহার কাছে। গেলাম প্রথমে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা হাকিম সানাউল হকের কাছে। সানাউল হক পাঠালেন আরপি সাহার কাছে। কিছু টাকা পাওয়া গেল। এরকম করে নানা জায়গায় যাওয়া এবং অনেকের সাহায্য নেওয়া।

মফিদুল হক: আপনার জন্য এটা নিশ্চয়ই বড় অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাহিত্য সম্মেলন, সাংগঠনিক বড় আয়োজন করা। এরপর বাফা কখন হয়েছে?

আনিসুজ্জামান: পঞ্চান্নতে। পঞ্চান্ন সালের মে মাসে। বুলবুল চৌধুরী মারা গেলেন। শোকসভা হলো।

শোকসভায় মাহমুদ নূরুল হুদা প্রস্তাব করলেন, বুলবুল স্মরণে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার। কয়েকদিনের মধ্যে উনি আবার সভা ডেকে কমিটির ঘোষণা দেন।

মফিদুল হক: বাফার ওই সময়ের কাজকর্ম কী ছিল?

আনিসুজ্জামান: একটা ছিল, নাচগানের স্কুল একটা ঢাকায় করা। এটা তখনো কারও চিন্তার মধ্যে আসে নি। গানের শিক্ষকেরা বাড়িতে গিয়ে তালিম দিতেন। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো, এটা নুরুল হুদার অবদান। আমরা ঢুকে গেলাম এটার মধ্যে। যা পারা যায় কাজটাজ করা।

মফিদুল হক: আহমদ হোসেন ভাইও তখন আপনার সঙ্গে ছিলেন?

আনিসুজ্জামান: আমি, আহমেদ হোসেন, ওর বড়ভাই মোহাম্মদ হোসেন একসঙ্গে কাজ করেছি। হুদা ভাইয়ের সঙ্গে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, উনি তো বাংলাবাজার স্কুল থেকে বেরিয়ে আসতেন আর রাতের বেলা ফিরতেন।

মফিদুল হক: কাগমারী সম্মেলনের সময় আপনি কী করছেন ?

আনিসুজ্জামান: কাগমারী সম্মেলনের কাজ যখন

আরম্ভ হলো তখন আমার এমএ পরীক্ষা। ওখানে আমার অংশগ্রহণ ছিল না।

মফিদুল হক: বায়ান্ন থেকে আটান্ন এই সময়টা যদি আপনি মূল্যায়ন করেন।

আনিসুজ্জামান: একটা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। দ্বিতীয় হলো অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের চেতনা। এই সময়ের মধ্যে বড় ঘটনা ঘটছে আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ হচ্ছে। যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিল পাস হচ্ছে।

মফিদুল হক: আরেকটা হচ্ছে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা চলচ্চিত্রে যেমন এ. জে. কারদার...

আনিসুজ্জামান: কারদারের ছবিটা হলো একদম সাতান্নতে।

মফিদুল হক: তখন এফডিসি তৈরি হচ্ছে। তারপরে নাটকেও দেখি, বহুরূপী ঢাকায় আসছে।

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ বুলবুল একাডেমি নিয়ে এল বহুরূপীকে। তারপর শান্তিনিকেতন থেকে একটি দল এসে 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করল। সেখানে আবার ফজলুল হক সাহেব গভর্নর, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। ফলে যাঁরা আক্রমণ করছেন যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এরূপ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ব্যাপারটা কেন? তাঁরাও জোরের সঙ্গে আক্রমণ করতে পারছেন না। আমার মনে আছে, ফজলুল হক সাহেব শর্ত দিলেন যে আমি যাব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যে ছবিটা আছে ওইটা মঞ্চের পেছনে টাঙিয়ে দিতে হবে।

মফিদুল হক: তারপর তো আপনি ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলেন।

আনিসুজ্জামান: ঊনষাট সালে।

মফিদুল হক: তখন কি একেবারে বন্ধ্যা সময় চলে এল?

আনিসুজ্জামান: সামরিক শাসনের ফলে মানুষের মুখ অনেকখানি বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটা হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতি করায় বাধা দেওয়া। হুকুম দেওয়া হলো, এত বছর রাজনীতি করতে পারবে না। সবার মনে ভয়। প্রবল নিষেধাজ্ঞা। আবার আর্টস কাউন্সিল ইত্যাদির পেছনে সামরিক সরকারের সমর্থন, খেলাধুলার প্রতি সমর্থন, সেটাও আছে। তারা মনে করছে এভাবে মানুষের মনকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। লেখক সংঘ তৈরি করার জন্য প্রচেষ্টাও চালালেন।

মফিদুল হক: রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী ১৯৬১ সাল। এর আগে কি কোনো কিছু মনে পড়ে আপনার?

আনিসুজ্জামান: আমার মনে হয় যে শতবর্ষের সময় প্রথম সরকারকে অগ্রাহ্য করে বা সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে সবাই মিলে অনুষ্ঠান করেছে।

মফিদুল হক: বাফাও তো তখন খুব সক্রিয় ছিল।

আনিসুজ্জামান: বাফাও করল। চট্টগ্রামে এমএ বারী রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ওঁর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হলো। ঢাকায় হলো জাস্টিস মাহবুব মোরশেদের নেতৃত্বে। এগুলো সব সরকারের জন্য অবাক হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার যে এসব লোক কেন আসছে, কোথা থেকে আসছে যখন বিচারপতি মোরশেদকে বলা হলো ভারতীয় হাই কমিশন টাকা দিচ্ছে এসব করার জন্য, আপনি কেন এর মধ্যে? উনি ওদেরকে বললেন, আচ্ছা, আমি দেখব বাইরের টাকাপয়সা যেন না আসে। আর আমাদেরকে বললেন, তোমরা চাঁদা তোলা বন্ধ করো। খরচ আমি দেব। আমরা অবাক, উনি জজ মানুষ, কোথা থেকে টাকা দেবেন? পরে দেখা গেল, উনি নিজে আইজি হাফিজউদ্দিন সাহেবকে দিয়ে অনুষ্ঠানের টাকা তোলালেন। এগুলো অসাধারণ ঘটনা।

মফিদুল হক: উদ্যোগটা যদি জাতীয় উদ্যোগ হয়, সমাজের যারা অভিজাত বা ক্ষমতাবান, তাদের যদি সম্পৃক্তি থাকে, তাহলে বোধহয় কাজটা সহজ হয়ে যায়।

আনিসুজ্জামান: উনি নিয়ে এলেন চিফ জাস্টিসকে সভাপতিত্ব করার জন্য, সেটা আবার মোরশেদ সাহেব না থাকলে হয় না। মোরশেদ সাহেব বলছেন, কাজেই উনি গেলেন। বিষয়টা অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি শতবর্ষের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন।

মফিদুল হক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আর একটা উদযাপন কমিটি হয়েছে?

আনিসুজ্জামান: না, আমাদের এটার মধ্যে একটা সমন্বয় ছিল। মোট তিনটা কমিটি হয়েছিল, একটা জাস্টিস মোরশেদকে সভাপতি করে, একটা কমিটির সভাপতি সুফিয়া কামাল, আরেকটা প্রেসক্লাবকে কেন্দ্র করে— মোটামুটি তিনটা মিলে একসঙ্গে কাজ হয়েছে।

মফিদুল হক: এরপর বাংলা-বিভাগ থেকে আপনারা উদ্যোগ নিলেন?

আনিসুজ্জামান: সেটা হচ্ছে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, '৬৩ সালে।

মফিদুল হক: সেখানে আপনি—

আনিসুজ্জামান: ওখানে আমার একটা ভূমিকা ছিল। তারও একটা প্রভাব দেখা দিচ্ছিল, মানুষ একেবারে ভিড় করে আসছে প্রদর্শনী দেখতে, পুরোনো পাণ্ডুলিপি দেখতে, পুরোনো ছাপা বই দেখতে। পুরোনো সাহিত্যের যে পাঠ এগুলো লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, শুনছে এবং মনের ভেতরে ধারণ করছে।

মফিদুল হক: সে অর্থে বাংলা বিভাগও একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। '৬১ সালে বাফার সঙ্গে আপনার সম্পৃক্তি রয়েছে আর শতবার্ষিকীর পর ছায়ানট...

আনিসুজ্জামান : বাফার সঙ্গে মোটামুটি '৫৫ থেকে '৬৪ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিল। '৬৪-তে বিদেশ চলে গেলাম।

ফিরে এসে আর নতুন করে যাওয়া হলো না।

মফিদুল হক: তারপর তো পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে। ওই সময়ে একটা ঘটনা ছিল বাংলা বর্ণ সংস্কার প্রয়াস।

আনিসুজ্জামান: এটা বোধহয় '৬৬-৬৭ এরকম সময়ে।

মফিদুল হক: '৬৭-তে বোধহয়।

আনিসুজ্জামান: কয়েকটা ঘটনা হলো। একটা হলো বর্ণমালা নিয়ে। আরেকটা হলো বেতারে-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ। এ দুটোই শক্ত প্রতিবাদ ডেকে আনল।

মফিদুল হক: আর এ দুটোতেই আপনি খুব সক্রিয় ছিলেন।

আনিসুজ্জামান: বর্ণমালার ক্ষেত্রে বাংলা বিভাগের প্রধান আবদুল হাই সামনে আসেন। আমরা একটা কাঠামো দাঁড় করাই।

মফিদুল হক: তারপর সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ খুব বড় করেই হয়। আপনিও তো সম্পৃক্ত হলেন।

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে সংবাদপত্রে মুনীর চৌধুরী যে বিবৃতি তৈরি করলেন, তাতে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আমি, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম আমরা একসঙ্গে সই করলাম। পরেরদিন আমি বেরিয়ে আরও সই জোগাড় করলাম। আরও পনেরোজনের স্বাক্ষর নিয়ে কাগজে দিলাম। যেখানেই গেছি, কেউ না বলে নি। এক শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছেন যে, দেখো, আমি অনেক গাল খেয়েছি, আমাকে আর জড়িয়ো না, আমার এ বয়সে আর গাল খেতে পারব না।

মফিদুল হক: এর মধ্যে একটা বড় ঘটনা '৬৪-র দাঙ্গা, ওই সময়ে আপনার ভূমিকা কী ছিল?

আনিসুজ্জামান: '৬৪-র দাঙ্গায় আমি কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলাম। আবারও বলতে হয়, বুলবুল একাডেমিতে একটা শরণার্থী শিবির করা হলো, জগন্নাথ

কলেজে একটা করা হলো। দুটো কাছাকাছি। সেখানে বহু লোককে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার পাড়ার সুরেশকে—তখনকার নাটকে মেকাপ দিত সুরেশ, ওকে সরাবার জন্য বাড়িতে যাই। কিছুতেই বাড়ি ছাড়বে না। আমি বললাম, দেখেন এখনো এদিকে দাঙ্গা ছড়ায় নি, পরে তো বিপদে পড়বেন। পরে পুলিশ আসে, ওকে নিরাপদে নিয়ে যায়। প্রশাসন দাঙ্গা দমনে বা হিন্দুদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। এটাও অবশ্য ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে।

মফিদুল হক: আপনি এত কিছু করেছেন, এর মধ্যে লিখলেন মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। এটা তো ধরেন একটা বড় কন্ট্রিবিউশন। আমি বলছি, যদি চিন্তার দিক দিয়েও ধরি। অথবা হাসান হাফিজুর রহমান ওই সময়ে এত অ্যাকটিভিস্ট মানুষ যিনি একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন বের করলেন। এসব তো একধরনের কালেক্টিভ মেমোরাইজেশনের জায়গা তৈরি করে, একটা শেয়ারিং হয়ে যায়। ষাটের দশকে বাংলা বিভাগের যে অনুষ্ঠানগুলো হতো, হাজার বছরের বাংলা গান হতো, পাকিস্তানি শাসকরা যে বাস্তবতা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল এগুলো তা ভেঙে দেয়।

আনিসুজ্জামান: ষাটের দশকে ছায়ানটের একটা বড় ভূমিকা আছে।

মফিদুল হক: '৬১-র পর থেকে ড্রামা সার্কেলের একটা বড় ভূমিকা ছিল। জহির রায়হান বা অন্য যারা চলচ্চিত্রে ছিল, ওদেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল।

আনিসুজ্জামান: এমনকি যারা লেখক সংঘ করতে গেলেন তাঁরাও কিন্তু সরকারের কাজটা করলেন না। বরং অনেক বিষয়ে সরকার যা চাইছিল না, সেটাই করলেন। হাসানের উদ্যোগে মহাকবি স্মরণোৎসব হলো।

মফিদুল হক: সেখানে মাইকেলও থাকছেন, ইকবালও থাকছেন।

আনিসুজ্জামান: রবীন্দ্রনাথও থাকছেন, যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এত বিতর্ক।

মফিদুল হক: তিনি স্বাভাবিকভাবেই থাকছেন। এরকম একটা পটভূমিকায় জাতীয় সংহতি নির্মাণের জায়গায় আমরা কি খুব ব্যর্থ হয়েছি?

আনিসুজ্জামান: একাত্তর পর্যন্ত দেখলে মনে হয় না। তারপরে আমাদের ঐক্যটা নষ্ট হয়ে গেল। লক্ষ্যটাও মনে হয় তুলনামূলকভাবে ধূসর হয়ে গেল। একসময়ে লক্ষ্যটা হারিয়েও ফেললাম।

মফিদুল হক: আপনি তো নানারকমভাবে সক্রিয় ছিলেন, মনে হয় কি যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, আবার কি আমরা সেখানে ফিরে গেলাম?

আনিসুজ্জামান: আজকে যে আমরা ধর্মীয় সংখালঘুদের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি, এটা পঞ্চাশের ব্যাপার তো।

মফিদুল হক: হ্যাঁ, আমার মনে আছে বাবরী মসজিদে হামলার পরে আপনি ইত্তেফাকের সম্পাদকের বাসায় গেলেন। আমিও ছিলাম আপনার সাথে। সেখানে বসে একটা ড্রাফটিং হলো, অভিন্ন সম্পাদকীয়।

আনিসুজ্জামান: এটা বিরানব্বইতে।

মফিদুল হক : হ্যাঁ, মইনুল হোসেন, আহমেদুল কবির সবাই মিলে। কিন্তু উদ্যোগটা তো আপনার। আমার

মনে হয় সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। এখনো ধরেন সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ বা বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে জায়গায় যেতে হচ্ছে, যে জায়গায় দাঁড়াতে হচ্ছে, সে তো সেই পুরনো সমস্যা। এতে আপনার মধ্যে কোনো হতাশা কাজ করে, নাকি কোনো আশা দেখেন?

আনিসুজ্জামান: কিছুটা হতাশা কাজ করে এজন্য যে একথাগুলো আবার বলতে হচ্ছে, আবার এত পেছন থেকে আরম্ভ করতে হচ্ছে। এটা তো হতাশার ব্যাপার। তবু মনে হয় যে এগুলো তো একসময় পেরিয়ে এসেই একাত্তরে পৌঁছেছি। কাজেই এটা চরম নয়, এটাকেও

পেরিয়ে সামনে ভালো সময় আসবে। যদিও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি হতাশার।

মফিদুল হক: জাগরণ সম্ভব আর জাগরণ অবশ্যম্ভাবী—এ দুটোর মধ্যে আপনি কী মনে করেন?

আনিসুজ্জামান: তাত্ত্বিকভাবে বললে বলব যে অবশ্যম্ভাবী। এজন্য যে, কোথাও পশ্চাৎপদ জায়গায় জনগণ আটকে থাকে না। কাজেই তাকে ঠিক এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাস্তবে যদি বলো, সে লক্ষণগুলো এখনো আমি দেখি নি, এজন্য হতাশা। আবার একটা আস্থা আছে যে হবে।

মফিদুল হক: আমরা কি ব্যর্থ হচ্ছি তরুণদের সঙ্গে সংযোগ রচনা করতে?

আনিসুজ্জামান: নিশ্চয়ই। আমি যদি দশজনকে ওইরকম প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে তারা নিশ্চয়ই এসে আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করত।

মফিদুল হক: আবার আপনার জীবনটাকে যদি দেখি, সেই ক্লাস এইটের ছাত্র, চলে গেলেন সাহিত্য সম্মেলনে। কেউ তো আপনাকে টেনে নেয় নি। তাহলে ভেতরের তাগিদটাও একটা বিষয় যে নিজেও তো মানুষ পথ সন্ধান করে ফেরে?

আনিসুজ্জামান: ভেতরের তাগিদ না হলে তো হয় না।

মফিদুল হক: এ দীর্ঘ পরিক্রমায় এতগুলো বছরের পথচলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আপনি কী বলবেন?

আনিসুজ্জামান: একেবারে ব্যক্তিগতভাবে বলব যে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি যে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেটা তো সমষ্টিগত অর্জন। কাজেই পেছনের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ায় কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু

অন্যদিকে বর্তমানটা সে তুলনায় উজ্জ্বল হয় নি। এটি দুঃখের কথা। আশা করা যায় যে, তরুণ প্রজন্ম 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সমাজের যারা অগ্রসর মানুষ তাদের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে দেশকে নতুন করে তৈরি করার কাজে এগিয়ে আসবে।

মাজহারুল ইসলাম: স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তরুণ প্রজন্মকে আমরা সক্রিয় করতে পারছি না বা ওরা সক্রিয় হচ্ছে না। এটার পেছনে আপনি কী কারণ মনে করেন? কেন তাদেরকে আমরা সক্রিয় করতে পারছি না?

আনিসুজ্জামান: একটা হচ্ছে রাজনীতিমনস্কতার অভাব। আমাদের সময়ে রাজনীতি এত কলুষিত হয় নি।

এখন একটা ভালো ছাত্র, সে কী দেখে? ছাত্ররাজনীতি মানে হচ্ছে চাঁদাবাজি, লোককে ধরে নিয়ে আসা।

তাহলে তার কোনো অর্থ হয় না। আমাদের সামনে তো আদর্শবাদী লোকজন ছিল। এটা একটা দিক। আমি অন্য উপলক্ষে কাকে জানি বলেছিলাম যে, আমার অনার্স পরীক্ষার আগে শহীদুল্লাহ কায়সার, রমেন মিত্র এঁদের দুজনই বলেছেন যে, দেখো পরীক্ষার ফল কিন্তু ভালো করতে হবে। না হলে লোকে বলবে যে, ভালো ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। এটা একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। আবার ওই সময়ে হল ইলেকশনে যারা দাঁড়াচ্ছে, তাদের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল। এখন এ ব্যাপারটা নেই। এটা খুব দুঃখজনক। এখন ভালো ছাত্ররা কিন্তু রাজনীতিতে যেতে চায় না। যারা চিন্তা করতে পারে তারা রাজনীতিতে যেতে চায় না। রাজনীতিবিমুখতার ধারাটা ক্ষতিকর। রাজনীতি মানে হয়ে গেল টাকাপয়সা করার ব্যাপার। এখান থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা

বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মননচর্চার জগতে এক উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম আনিসুজ্জামান। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের যে ক'জন মানুষ নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন বিশ্ব-ভূগোলে, আনিসুজ্জামান তাঁদের অন্যতম। লেখক, গবেষক, শিক্ষাচিন্তক, সংস্কৃতিসাধক, দেশপ্রেমিক, মুক্তিসংগ্রামী, মানবাধিকার-সংগঠক,

সর্বোপরি জাতির বিবেক—কতভাবেই তো আনিস স্যার নিজেকে মেলে ধরেছেন জাতির সামনে।

একজন সংবেদনশীল প্রগতিপন্থী মানুষ হিসেবে তাঁর তুল্য ক'জন মানুষ আছেন আমাদের? কত বাঙালির নামই তো আছে আনিসুজ্জামান—তবু কেন জানি আনিসুজ্জামান নামটা শুনলেই মনে জাগে সমাজসচেতন এক বুদ্ধিজীবী, দীপ্র এক মনীষার অবয়ব। সহজ সাবলীল স্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে একজন মানুষ কী করে যে এমন অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন, তাঁর সান্নিধ্যে না গেলে সে-কথা অনুধাবন করাও বোধ করি সম্ভব নয়।

মুক্তবুদ্ধি ও মাঙ্গলিক চেতনা দ্বারা আজীবন পরিচালিত হয়েছেন আনিসুজ্জামান। তাঁর সব কর্মের পশ্চাতেই আছে অপরের জন্য মঙ্গল বাসনা। নিজের স্বার্থকে অবলীলায় তিনি সবার স্বার্থের কাছে তুচ্ছ করে তুলতে পারেন, অন্যের মঙ্গলকে ভাবতে পারেন নিজের মঙ্গল হিসেবে। এমন সজ্জন মানুষ, সুরুচির অধিকারী এমন পণ্ডিত আমাদের সমাজ কেন, যে-কোনো সমাজেই বিরল। অদ্ভুত এক নির্মোহ দিয়ে নিজেকে উহ্য রাখতে পারেন আনিসুজ্জামান, তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করলেই বোঝা যায় দেশজীবনই হয়ে ওঠে তাঁর আত্মজীবন—নিজে সেখানে কেবলই কথকমাত্র।

আমাদের দুর্দিনের বাতিঘর আনিসুজ্জামানের শিক্ষা ও শিক্ষকতাজীবন সম্পর্কে জানার কৌতূহল অনেকের। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের এই পর্বে ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর শিক্ষাজীবন, শিক্ষকতাজীবন এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: শিক্ষার হাতেখড়ি কীভাবে, কোথায় হয়েছে আপনার? পারিবারিক পরিমণ্ডলে আপনার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন কে ?

আনিসুজ্জামান : আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি হয় নি। হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বড় হলো তিন বোন। ওদের মধ্যে যে মেজ, সে আমার পড়াশোনা দেখত। বাড়িতেই পড়তাম। কিন্তু সেই সময় একদিন দুষ্টুমি করায় মা আব্বার কম্পাউন্ডারকে ডেকে বললেন, যাও, ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসো। সেটি ছিল মার্চ মাস, ভর্তির সময় নয়। নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে স্কুলে। বাড়ির কাছেই পার্ক সার্কাস হাই স্কুল।

স্কুলের শিক্ষকেরা বললেন, ওকে নেওয়া যাবে। টুতে তো নেওয়া যায়ই। বাড়িতে একটু কষ্ট করলে থ্রিতে নেওয়া যাবে। কথাটা শুনে আমাদের কম্পাউন্ডার ভাবলেন যে, এক বছর বাঁচানোই ভালো। আমি পারি না-পারি আমাকে থ্রিতে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। এটা আমার জন্য ভালো হয় নি। বাড়িতে অবশ্য অনেক বইপত্র আসত। ছোটদের পত্রিকাও আসত। এগুলো কিছু নাড়াচাড়া করার সুযোগ হয়েছে। তিন বোনের মধ্যে যে ছোট, আমার ঠিক ওপরে, সে পাড়ার লাইব্রেরির মেম্বার ছিল। বেশির ভাগ সময় তার হয়ে আমিই বই আনানেওয়া করতাম। ওই সূত্রে বই পড়ার সঙ্গে একটু যোগাযোগ হয়। পাঠ্যবই এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে এই ছিল পড়ার একটি সুযোগ।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে কোন ক্লাস পর্যন্ত আপনি পড়েছেন?

আনিসুজ্জামান: ক্লাস সেভেন।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: ওই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক—এ ব্যাপারে বলবেন কি ?

আনিসুজ্জামান: এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় পার্ক সার্কাস হাই স্কুলটি আর দশটি স্কুলের মতোই ছিল। সব স্কুল প্রায় এরকমই ছিল। পাঠ্যবই অবশ্য তারা বাছাই করে নিত। ধরো ইংরেজি-বাংলা কিছু বই নির্ধারিত ছিল। দু-তিনটি সিরিজের বই বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হতো। পড়াশোনার ব্যাপারে শিক্ষকরা মোটামুটি কড়া ছিলেন। স্কুলে ছাত্রদের মারধরও করা হতো। আমি একবার মার খেয়ে জ্বরে পড়ি। পরে সেই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। বোধহয় মারধরটা আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধ ছিল। তবে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির ব্যাপার ছিল। স্কুলে যে বার্ষিক অনুষ্ঠান—পুরস্কার দেওয়া, সরস্বতী পূজা, মিলাদ—সবমিলিয়ে

একটা আনন্দময় পরিবেশ ছিল একথা বলতেই হবে।

স্কুলে থাকতে আমরা একদিন রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলাম বলা যেতে পারে। ক্যাপ্টেন রশীদ আলী দিবসে আমরা স্কুলে ধর্মঘট করলাম। সেটা ১৯৪৫ সালে। সিঁড়িতে হেডমাস্টার বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কাউকে চলে যেতে বাধা দিলেন না। কিন্তু আমরা যেন কোনো হট্টগোল না করি সে বিষয়ে সতর্ক করলেন। যাই হোক যেন নিঃশব্দে হয়, হইচই করা যাবে না।

ধর্মঘট করে মিছিল করে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তখন সভা, সেই সভাস্থলে যাওয়া হলো। তারপর যখন শুনলাম যে ট্রামের শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগ দেবে, ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। এসেই তো আব্বার হাতে চড় খেলাম। আমাদের স্কুল জীবনে অসুবিধা হলো ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে, স্কুল আগস্ট মাসের পর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সেই আগস্ট মাসেই আবার বন্ধ হলো। সাতচল্লিশে চলে এলাম খুলনায়, আটচল্লিশে খুলনা জিলা স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখানেও আবার পারিবারিক ঝামেলার কারণেই পড়ালেখায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটল। প্রায় কয়েক মাস স্কুলে যাওয়া হয় নি। তারপরে ঊনপঞ্চাশ সালে ঢাকায় এসে ভর্তি হলাম প্রিয়নাথ হাইস্কুলে, এখন সেটা নওয়াবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল। পঞ্চাশ সালে রায়ট হলো, আবার স্কুল হয়ে গেল শরণার্থী শিবির। প্রায় আট মাস বন্ধ থাকল স্কুল। ফলে এই ক'বছরে আমার পড়ালেখায় খুব বিঘ্ন ঘটে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আপনি কলেজের ছাত্র হিসেবে কোথায় পড়ালেখা করেছেন?

আনিসুজ্জামান: ১৯৫১ সালে জগন্নাথ কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ। আর নানা বিষয়ের মধ্যে স্পেশাল বেঙ্গলি নামে একটা বিষয় ছিল। সেটা তখন জগন্নাথ কলেজ এবং সেন্ট গ্রেগরিস কলেজেই শুধু পড়ানো হতো। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পত্র। ওইটার আকর্ষণেই জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলাম। অজিত গুহ পড়াতেন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী পড়াতেন। খুব ভালো পড়াতেন। ইতিহাস খুব ভালো পড়াতেন নারায়ণ সাহা। আমাদের একেবারে আকৃষ্ট করে রাখতেন। আর তাঁরা সকলেই একটু উন্নতমানের বই পড়তে উৎসাহ দিতেন। যেমন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখনই বলতেন যে প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ পড়ো। আমাদের জন্য একটু কঠিন, কিন্তু পড়তাম। নারায়ণবাবুও তেমনি ইতিহাসের একটা বড় বই (আমরা তো সাধারণত ছোট, সহজপাঠ্য বই পড়তে পছন্দ করতাম) পড়তে উৎসাহ দিতেন। এভাবেই তাঁদের চেষ্টা ছিল আমাদেরকে ওই গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আপনার সময় সেই ১৯৫১ সাল থেকে আজকের সময় প্রায় ৬৫ বছর, তো এই সময়ের মধ্যে কলেজ শিক্ষকতায় পার্থক্যটা কেমন মনে হয়? আপনি যেমন বললেন যে, আপনার শিক্ষকরা পাঠ্য বইয়ের বাইরে একটু অন্যরকম মোটা বই, বেশি তথ্য আছে, এমন বই পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন। আপনার কি মনে হয় এখনকার শিক্ষকদের মাঝে সেটা আছে?

আনিসুজ্জামান: আমি ঠিক জানি না, তবে আমার সন্দেহ হয় যে এখনকার শিক্ষকরা বোধহয় সে রকম বলেন না। আর একটা বিষয় কলেজে আমরা পেয়েছিলাম শিক্ষকদের কারও কারও সঙ্গে খুব একটা ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়া। যেমন অজিত গুহ বা নারায়ণ সাহা। ছাত্রাবস্থায় তাঁদের বাড়িতে গেছি, পুজোর সময়ে তাঁদের বাসায় খেয়েছি। এখনকার সময়ে এই ধরনের সম্পর্ক বোধহয় আর হয় না।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: এখন কি বলতে পারি আপনার এমনটা হয়ে ওঠার পেছনে উনাদের ভূমিকা রয়েছে?

আনিসুজ্জামান: সে ভূমিকা তো আছেই। তবে এখন সে ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কি না বলা মুশকিল। এত ছাত্র, আর পরিবেশটাও ঠিক সম্পূর্ণ পড়ালেখার নয়।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: প্রবাহটাও বোধহয় এখন ঠিক সে

রকমটা নেই। এখন শিক্ষকরাও মনে হয় একটু অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ছেন। শিক্ষকরাও ব্যস্ত তাঁদের নানা কাজে। স্যার, আপনি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর করেছেন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকা স্টাডিজে পড়ালেখা বা গবেষণা করেছেন। তো আপনার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা যদি একটু বলতেন।

আনিসুজ্জামান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন পড়ি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন খুবই কম। আইন যারা পড়তেন তারা বেশিরভাগই ছিল খণ্ডকাল ছাত্র। তাদের নিয়েই গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা তিন হাজার ছাত্রছাত্রী। ছাত্রীর সংখ্যা তখন দশ শতাংশ হবে কি না সন্দেহ। এখন তো প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী, এতগুলো হল, বিভাগ। এটা একদিকে ভালো যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খারাপ যেটা হয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কল্পিত ছিল সেই ধারণাটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এই সংখ্যার চাপে। ফলে এখন এই রেসিডিনসিয়াল হলগুলো হস্টেলের মতো হয়ে গেছে যেখানে ছাত্ররা রাতে ঘুমায়। এবং ছাত্র নয় এমন অনেকেই থাকে সেখানে। হলগুলোতে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ খুব শিথিল। আমাদের সময় হলটা ছাত্রজীবনের একটা বড় অংশ ছিল। এখানে আমরা বিতর্ক করেছি, নাটক করেছি। আমাদের সময়ে ১৯৫৩ সালের দিকে প্রথম সহ অভিনয় আরম্ভ হলো। খেলাধুলা ছিল, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এসবের মধ্য দিয়েই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটা বন্ধন সবারই গড়ে ওঠে। এমনকি শারীরিক চর্চায়ও একধরনের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিছু কিছু আমরা ফাঁকি দিয়ে এসেছি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেই দৌড়ঝাঁপ করতে হতো এবং না পারলে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট হতো। তখন সব ছাত্রেরই একটা মেডিকেল টেস্ট করা হতো ভর্তি হলেই। এখন সে সমস্ত আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় বড় হওয়ার জন্য এটা হয়েছে। আবাসিক হলগুলোকে কেন্দ্র করে যে ধারণা যে এখানেই শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটবে, এই ধারণাটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আমি বিদেশে যখন পড়তে গেলাম, প্রথম গেলাম শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪ সালে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে। সেখানে না শিক্ষক না ছাত্র এমন একটা অবস্থা। দু-একজন শিক্ষকের ক্লাসে বসার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু কেউ কেউ আমাকে অনুমতি দিতে চাইলেন না। বললেন, তুমি তো আর পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা দেবে এরকম ছাত্রের সংখ্যা এত বেশি যে আমি আর জায়গা দিতে পারছি না। কিন্তু সেমিনার করলাম, শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ কিছু অনুবাদ করলাম। এ ধরনের কাজ অনেক করেছি। লন্ডনে এলাম প্রায় দশ বছর পর। সেটাও প্রায় ওই একই ধরনের কাজ। কিন্তু ততদিনে আমি প্রফেসর হয়ে গেছি। সে কারণে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বিভাগের যিনি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি আমার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে দেখাশোনা করতেন, কিন্তু উনি আমাকে সমকক্ষের মতো মনে করতেন। শিকাগোতে বয়স কম ছিল বলে তাও খানিকটা ছাত্রের মতো ছিলাম, কিন্তু লন্ডনে সবটাই সহকর্মীর মতো। খেতাম শিক্ষকদের ডাইনিং হলে, ওখানে প্রফেসরদের সঙ্গে অনেক স্বাধীনতা ছিল কাজ করার। দুই জায়গাতেই। যেহেতু আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না সে কারণেই কেউ চাপ দিত না এইটা করো, ওইটা করো এভাবে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: এবার আমি আপনার শিক্ষার্থী জীবনের একটি ব্যক্তিগত বিষয় জানতে চাইব। শিক্ষার্থী হিসেবে কোন ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছেন এবং কোন ঘটনায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন ?

আনিসুজ্জামান: শিক্ষার্থী হিসেবে আনন্দের বিষয় তো আমি বলব অনার্সে যখন আমি প্রথম শ্রেণী পেলাম সেটা। তখন তো প্রথম শ্রেণী বিরলই বলা যেতে পারে। ছেচল্লিশ সালে অনার্স এবং সাতচল্লিশে মাস্টার্সে একজন প্রথম শ্রেণী পেলেন। তারপর বিরতির পর ১৯৫৩ সালে অনার্স, ১৯৫৪ সালে এম.এ. তে আলাউদ্দিন আল আজাদ পেলেন প্রথম শ্রেণী। তারপর আমি ১৯৫৬ সালে অনার্স,

১৯৫৭ সালে মাস্টার্স-এ প্রথম শ্রেণী পাই। এ কারণেই তখন মনে হয়েছিল এ আমার জীবনে অনেক বড় একটা পাওয়া। অনেক আনন্দের ঘটনা।

আর দুঃখের ঘটনা আসলে ওইভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু আমি বলব আমরা ভর্তি হলাম যখন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ। আমরা ভর্তি হলাম '৫৩ সালে আর উনি '৫৪-র নভেম্বরে রিটায়ার করলেন। এটা একটা দুঃখের কারণ হয়েছিল আমাদের জন্য। এটা দুঃখের কারণ হয়েছিল এই কারণে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতিই ছিল জুনে রিটায়ার করার। এবং তাঁর রিটায়ার করা একটু আকস্মিকই হয়েছিল। ওইটা আমাদের জন্য একটু কষ্ট দিয়েছিল।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আর একটা প্রশ্ন। আপনি তো স্কুল জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অনেক শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছেন। যদিও বলাটা একটু কঠিনই তবু তাঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় এক-জনদুইজনের কথা যদি একটু বলতেন।

আনিসুজ্জামান: আমি মুনীর চৌধুরীর কথা বলব। দুটি কারণে। প্রথমত আমি তাঁর খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাঁর পড়ানোর কৌশল। আমি মোটে একবছর ছাত্র ছিলাম তাঁর। সাবসিডিয়ারি ইংরেজি পড়েছিলাম তাঁর কাছে। তখন উনি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। খুব অসাধারণ পড়ানোন ছিল ওঁর। পরে যখন শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম ওঁর অভিভাবকত্বটা তখনো ছিল। রোজ সকালে এসেই বইপত্র সম্পর্কে আলোচনা হতো। এই ব্যাপারগুলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আমি।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আমি বিশেষত আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী জীবনের কথাই বলব। এ সময় আপনার সহপাঠী কিংবা অন্য বিভাগেরও যারা একই সময়ের শিক্ষার্থী আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন, আড্ডার পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনাদের যে ভাবনা এই বিষয়টার খুব বড় জায়গা ছিল। তো আপনার সেইসব বন্ধুর কথা যদি একটু জানাতেন।

আনিসুজ্জামান: আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে আমার একবছর উপরে ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইংরেজিতে, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী অর্থনীতিতে। দু'বছর ওপরে ইংরেজিতে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত, এখন অর্থমন্ত্রী। এঁদের সঙ্গে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, দু-এক বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও তা খুব প্রগাঢ় ছিল।

আবার একইভাবে আমার যারা দু-এক বছর জুনিয়র ছিল, তাদের সঙ্গেও আমাদের একটা ভালো বন্ধুত্ব ছিল। আর সহপাঠীদের সঙ্গে তো ছিলই। এর ফলে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের ভাবনা-সবারই তো একটা নিজস্ব ভাবনা ছিল—সেই ভাবনার পরিচয় আন্দোলিত করেছে, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করে আমরা লাভবান হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন 'সংস্কৃতি সংসদ' বলে ছাত্রদের একটিমাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। অনেকেদিন পর্যন্ত। সেটিও আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার একটা ভালো জায়গা ছিল। সেখান থেকেও আমরা লাভবান হয়েছি।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার, আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। আরও অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সময় সীমাবদ্ধতার কারণে থামতেই হচ্ছে। এবার স্যার আপনার অধ্যাপনা জীবন সম্পর্কে একটু জানতে চাই। আমি প্রথমেই যেটা জানতে চাই যে, আপনাদের সময়ে আমরা দেখেছি যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষায় ভালো করে তারা প্রায় সবাই সিএসপি অফিসার হতে চায়। এবং তখনকার সময়ে সিএসপি অফিসার হওয়াটা ছিল বিশাল আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো একটা ব্যাপার। আপনি এত ভালো ফল করেও শিক্ষকতাটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলেন। এর কারণটা কী ?

আনিসুজ্জামান: আমি আগেই বলেছি, আমি শিক্ষক হব এ চিন্তা আমি অনেক আগেই করেছি। কিন্তু যখন শিক্ষক হব বলে ভেবেছিলাম তখন কিন্তু ভাবি নি যে আমি পাস করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়াটা অনেক কঠিন ব্যাপার মনে হতো। এম.এ. পাস করে ঢুকলাম গবেষণায়, বাংলা

একাডেমির বৃত্তি নিয়ে কাজ করছি। এমন সময় আমার শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাই, বিভাগীয় প্রধান, যিনি আমাকে পিএইচডি করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন—উনি না থাকলে হয়তো আমি পিএইচডির গবেষণায় যেতাম না, উনি বললেন, ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক দরকার, তুমি যোগ দাও। শিক্ষকশূন্যতার কারণেই মূলত মেয়াদভিত্তিক চার মাসের জন্য আমাকে নিয়োগ দেওয়া হলো। বাংলা একাডেমির বৃত্তি ছেড়ে এই হচ্ছে আরম্ভ। এপ্রিল মাসেই চাকরি শেষ হয়ে গেল। অক্টোবর মাসে আবার নতুন করে চাকরি পেলাম। আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল সিভিল সার্ভিসে চেষ্টা করবে না কেন? চাকরি করো না–করো অন্তত একবার পরীক্ষাটা দিয়ে দেখো না কী হয়। তা আমিই বললাম আমি বরাবই ঠিক করেছি আমি শিক্ষকতা করব, আর এখন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি আর অন্যদিকে ভাবা যাবে না।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার, আপনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল পড়িয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তো আপনার এই শিক্ষকতা জীবনের চুম্বকাংশ আমরা একটু জানতে চাই।

আনিসুজ্জামান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যে হলাম সেটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের ব্যাপার তখন। আমার মনে হয় সবমিলিয়ে আমার শিক্ষকতার প্রথম পাঁচ বছর আমার শিক্ষক জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। আমি পড়িয়েছিও ভালো। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তখন আমার গবেষণামূলক লেখালেখিও ভালোই হয়েছে সবকিছু। চট্টগ্রাম গেলাম আমি ঢাকায় দশ বছর পড়ানোর পরে। পদোন্নতি পেয়ে। ওখানে পরিবেশটা ভিন্ন ছিল। ভিন্ন ছিল এই অর্থে যে নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। আর শহরের অনেক বাইরে ক্যাম্পাস। অনেক কিছুর অভাব আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ভিন্নরকম একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে বড় বড় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমি চট্টগ্রামে গেলাম '৬৯–এর জুনে। আর সত্তরে নির্বাচন হলো, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ। একটা কথা মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলে আত্মরক্ষা করতে পারতাম কি না বলা কঠিন। বাবা–মা, ভাইবোনকে ছেড়ে শুধু আমার পরিবার নিয়ে বাইরে চলে যাওয়া বোধহয় হতো না।

চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমার যেটুকু বাড়তি বক্তব্য যে ওখানে যোগ দেওয়ার অল্পকালের মধ্যেই আমি ওখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৬৯ সালে যোগ দিলাম, সত্তরেই আমি হলের প্রভোস্ট হয়ে গেলাম। তারপর হলের প্রভোস্ট হওয়ার সূত্রেই সিন্ডিকেটের মেম্বর, একাডেমিক কাউন্সিলের মেম্বরও হলাম। এভাবে প্রশাসনে অনেক জড়িয়ে গেছি। তাতে একটু দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে যেতে হয়েছে। সেটা অনেক সময় খুব অপ্রীতিকরও হয়েছিল। আবার ফিরে এলাম যখন ঢাকায় তখন সচেতনভাবেই চেষ্টা করেছি প্রশাসনিক কোনো কাজের মধ্যে না–জড়াতে। একবার তো এমন হলো প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষই আমাকে বললেন যে, আপনি যদি দাঁড়ান তাহলে আমরা কোনো প্রার্থী দেব না। আমার একটা উপলব্ধি হচ্ছিল যে ঢাকায় শেষদিকে, শেষ চার–পাঁচ বছরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ–ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং ক্লাসে যখন পড়াচ্ছি তখন যে কমিউনিকেশন—সেটাও মনে হচ্ছিল যেন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন ওদেরকে সেভাবে বোঝাতে পারছি না। কিংবা ওরা বুঝতে পারছে না। রাজ্জাক সাহেব বলতেন যে, ছাত্রছাত্রীর বয়স বাড়ে না কিন্তু শিক্ষকের বয়স বাড়ে। কথাটি সত্যি মনে হলো। তবে একটা বিষয় আমি আজীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে এসে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কর্তব্যবোধ থাকতে হবে, বিভাগের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে আর ওই পড়ালেখা গবেষণার কাজটা যাতে ব্যাহত না হয় সেটা দেখতে হবে। বিষয়গুলো আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি শেষ দিন পর্যন্ত।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আপনি তো কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। বাইরে কি

আপনি পড়িয়েছেন ছাত্রদের? এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার?

আনিসুজ্জামান: আমি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো হিসেবে ছিলাম, আর বিশ্বভারতীতে ছিলাম ভিজিটিং প্রফেসর, কিন্তু সরাসরি পড়াবার কোনো দায়িত্ব আমার ছিল না। সবজায়গায় ওই সেমিনার দেওয়া বা বক্তৃতা করা এসবের মধ্য দিয়ে চলেছে আমার নিজের গবেষণার কাজ করা। আর প্যারিসে তো অল্পদিন ছিলাম। সেখানে আমি ইউনিভার্সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটির বাইরে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সাতটা বক্তৃতা দিয়েছি। নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ২-৩ মাস ছিলাম, সেখানেও মূলত একটা বড় সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়েছি আর কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপলক্ষে বক্তৃতা দিয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েই হয়ে গেছে কাজ। বিশ্বভারতীতে একটি লিখিত বক্তৃতা এবং একাধিক মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছি।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে কি আপনাকে ক্লাস ইত্যাদি নিতে হয়?

আনিসুজ্জামান: না, ওখানে আমার মূল কাজ ছিল গবেষণা। আমি ওখানে থাকতে দুটি বক্তৃতা দিলাম। একটা অক্সফোর্ডে একটা সাসেক্সে। ওই দুটা আমার স্বরূপের সন্ধানে বইটাতে আছে এবং ইংরেজি বইটাতেও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হলো ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা ফ্যাক্টরির চিঠিপত্র পেয়ে গেলাম। ওরা বললেন যে আমি যেন সেসবের একটা ক্যাটালগ তৈরি করে দিই, একটা সারমর্ম লিখি। ফলে আরও দু'বার গিয়ে ওই চিঠিপত্রের সারসংক্ষেপ নিয়ে বই করার সুযোগ হলো, সেটা ওরাই বের করল লাইব্রেরির পক্ষ থেকে। এটাই আমার মনে হয় যে একটা বড় ঘটনা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার, আপনার এই অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় শিক্ষকতার এবং ছাত্রজীবন ধরলে পঁয়ষট্টি বছরের ওপরে। আমাদের দেশে শুধু নয়, এই উপমহাদেশের একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন শিক্ষাগুরু হিসেবে আপনার অবস্থানটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের, খুব গর্বের। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার কাছে একটু জানার ইচ্ছে যে আপনাদের সময়ে শিক্ষকদের দেখেছেন, এখনো শিক্ষকদের দেখছেন। এখনো আপনার বেশির ভাগ সময়ই শিক্ষক পরিমণ্ডলেই কেটে যায়। এই দুই সময়ের শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিকতার প্রশ্নে, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আপনার কি কোনো পার্থক্য মনে হয়েছে ?

আনিসুজ্জামান: আমি আসলে বিষয়টা যেভাবে দেখছি সেটা বলি। আমাদের সময়ে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁরা সকলেই গবেষণা করতেন না। কিন্তু যাঁরা গবেষণা করতেন না তাঁরা কখনো পদোন্নতির আশাও করতেন না। এখন কিন্তু এই অবস্থাটা নেই। এখনকার সময়ে গবেষণা করুন আর না করুন প্রত্যেক শিক্ষকই মনে করেন যে তাঁকে শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠতে হবে। এটা একটা পার্থক্য। আর একটা পার্থক্য আমার মনে হয়, এটা আমি সবার ক্ষেত্রে বলব না, কিন্তু অধিকাংশের জন্য বলব, এখন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বা বিভাগের জন্য শিক্ষকদের সময় কম তখনকার তুলনায়। আরও অনেক ধরনের কাজের মধ্যে তাঁরা জড়িত হয়ে পড়েন। এই দুটি পার্থক্যই আমার চোখে পড়ে অনেক বেশি।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: এখন তো প্রায় সবকিছু বাণিজ্যে রূপান্তর হয়ে গেছে। পণ্যায়নের এই যুগে সবকিছুই পণ্যে রূপান্তর হচ্ছে। এই যে শিক্ষাটাকেও যে আমরা এখন অনেক বড় পণ্য বানিয়ে ফেললাম এটা এবং এটা থেকে উদ্ধারের কোনো পথ সম্পর্কে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে কি একটু জানাবেন?

আনিসুজ্জামান: শিক্ষা যে পণ্য হয়ে গেল, এটা কিছুটা, আমি বলব যে, বিশ্বায়নের সঙ্গেও সংযুক্ত বটে। সারা বিশ্বেই শিক্ষা এখন একটা পণ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ব্যাকুল। সেটা যে খালি বিদ্যাবিস্তারের জন্য, এমনটা মনে হয় না, এখানেও

বাণিজ্যের চিন্তাটা আছে বলেই মনে হয়। আমাদের এখানে যেভাবে শিক্ষাদানের সঙ্গে কোচিং ক্লাস, শিক্ষকরা নিজের স্কুল–কলেজে নিচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হয়তো তেমনটা নয়, কিন্তু স্কুল–কলেজ পর্যায়ে অনেক হচ্ছে এমনটা। ফলে শিক্ষাটা পণ্য হয়ে উঠছে। যদি আমরা প্রাইভেট স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় রাখি, তবে কোচিং থেকে এখন কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে? এখন তাদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ খুব–একটা সম্ভব নয়। এখন দেখা যাচ্ছে ফিস নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা হচ্ছে। ফিস কতটা রাখতে পারবে, কতটা চড়া ফিস রাখতে পারবে সে বিষয়ে। কিন্তু এটা খুব একটা ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করছে না। যেসব ছেলেমেয়ের অভিভাবকেরা মামলা করছে স্কুল–কলেজের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ বা কলেজ কর্তৃপক্ষের সংঘাত অনিবার্য। এটা শেষপর্যন্ত শিক্ষার জন্য ভালো কিছু নয়। এখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রলুব্ধ হচ্ছে দামি স্কুলে পড়াবার প্রতি। কিন্তু পরে দেখছে যে আর কুলোচ্ছে না। একধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এটাও শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। যদি আবার এক ধরনের সামাজিক চুক্তির মতো করা যায়, পাবলিক ইনস্টিটিউশনের মতো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন থাকবে, কিন্তু তারা ফি রাখার ক্ষেত্রে একটা মাত্রার ওপরে যাবে না। আর কোচিং ব্যাপারটা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে খুব ভালো হয়। সেটা খুব কঠিন তা জানি এবং অনেকে মনে করেন যে তাঁরা যে বেতনটা পান সেটা যথেষ্ট নয়। তাঁরা সম্পূরক আয়ের সন্ধান করেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রী বেশি হওয়ায় স্কুল–কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের পক্ষে সব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব নয়। এটা আসলে একটা চক্রের মতো হয়ে গেছে। এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ভালো।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আর একটা প্রশ্ন করি স্যার, ইদানীং দেখা যাচ্ছে বা এবছরের ফলেও দেখা গেল বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনেক ভালো রেজাল্ট করছে। 'প্লাস'–এর ছড়াছড়ি। এ কারণে আমরা বলছি যে শিক্ষার মানটা খুব বেড়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় বা অন্য যেসব পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে তারা খুবই খারাপ করছে। এই ধরনের ফল আদৌ কি শিক্ষার মানের উন্নয়নের স্মারক হতে পারে?

আনিসুজ্জামান: আমার মনে হয় ফল যে ভালো হচ্ছে এর প্রধান কারণ মার্কিং সিস্টেমটা বদলেছে। মানে আগে যেখানে দশে ছয় দিতে আমরা কুণ্ঠিত হতাম, সেখানে এখন অনায়াসে ৮ দিয়ে দিচ্ছি। এই যে গ্রেডিং সিস্টেম সেটা বদল হওয়ায় হচ্ছে এমনটা। তো এটাকে এইভাবেই নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর এত ছেলেমেয়ে পড়তে আসছে, ছাত্রসংখ্যা তো বৃদ্ধি পাচ্ছে খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে। এখন এমন তো নয় যে কর্তৃপক্ষ বলে দিচ্ছেন এদের সবাইকে পাস করাতে হবে। তারা যে মানটা রেখেছে সেই মানেই এরা পাস করছে বা জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে। আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে একথাটা কিন্তু বহুকাল ধরে শুনছি। আমি ১৮৯০–এর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেখেছি। সেখানে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার মান নেমে গেছে। এটা বোধহয় সব সময়ই হয়ে এসেছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনো আমাদের শিক্ষকরা বলতেন যে শিক্ষার মান নেমে গেছে। অর্থাৎ মান নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছেই। সে আশঙ্কা সত্যি বটে। আমার মনে হয় যে এখনকার সময়ের গড়পড়তা আমাদের সময়ের গড়পড়তার চেয়ে খারাপ। কিন্তু এখন বেশ কিছু ভালো ছাত্র দেখি যারা আমাদের সময়ের ভালো ছাত্রের চেয়ে অনেক ভালো। তার একটা কারণ হচ্ছে এরা জানার যে বাড়তি সুবিধাগুলো পেয়েছে, টেলিভিশন–ইন্টারনেটে— যেটা আমরা পাই নি। আমাদের সময়ে যারা ভালো ছাত্র ছিল তারা যা জানত তাদের অনেকের চেয়ে এরা অনেক বেশি জানে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার আপনি যখন শিক্ষার্থী ছিলেন তখন আপনি বলেছিলেন যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় এবং প্রভাবসঞ্চারী শিক্ষক ছিলেন মুনীর চৌধুরী। আপনি যখন শিক্ষক ছিলেন দেশে এবং বিদেশে, নিশ্চয়ই একাধিক সহকর্মীর সঙ্গেই আপনার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আপনার কাছে এরকম সহকর্মীদের সম্পর্কে জানতে

চাইব আপনাকে যারা প্রভাবান্বিত করেছে কিংবা আপনি যাদেরকে প্রভাবান্বিত করে আনন্দ পেয়েছেন।

আনিসুজ্জামান: বিদেশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলাম, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ওইভাবে কেউ প্রভাবান্বিত করেছেন সেরকমটা ছিল না। কিন্তু যাঁদের কাজকর্ম বা সাহচর্যে থেকে আনন্দ পেয়েছি এরকম কয়েকজনের কথা বলতে পারি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এ্যাডওয়ার্ড সি ডিমক, জুনিয়র। ওঁর সঙ্গে আমি অনুবাদের কিছু কাজ করেছি। সুধীন দত্তের প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলাম, সেগুলো ছাপাও হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়। এইসব কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। তারপরে অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষক ছিল, কেউ কেউ ছাত্রই ছিল, পরে শিক্ষকতা করে অনেক ভালো করেছে বা নাম করেছে। শিকাগোতে যেমন সমাজবিজ্ঞানে র‍্যালফ নিকোলাস, ইতিহাসে রোনাল্ড ইনডেন—এরকম এক-দুইজনের কথা বলব, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় আমার সম্পর্ক রয়ে গেছে। ওরা কখনো-না-কখনো আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। যেমন, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা এশিয়ান এডিশন হচ্ছিল। তো র‍্যালফ নিকোলাস আমাকে বাংলাদেশ থেকে সম্পাদক করে দিয়েছিল। কাজটা অবশ্য হয় নি শেষপর্যন্ত। এইবার আমি যে পদ্মভূষণ পেলাম সেজন্য শিকাগোর বন্ধুরা মিলে সেলিব্রেট করেছে। এটা ভাবতে ভালোই লাগে যে এতকাল আগে আমি ওখানে ছিলাম অথচ এখনো তারা আমাকে মনে রেখেছে। আর লন্ডনে সেই অর্থে যোগাযোগটা কম। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাডেমিক কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগটা একটু বেশি হয়েছিল। আমরা প্রায়ই মতবিনিময় করেছি এবং উভয়ে লাভবান হয়েছি। আর অক্সফোর্ডে ছিলেন তপন রায় চৌধুরী, উনিও একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমার নানা কাজে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার আপনি তো পাকিস্তান আমলে এক যুগেরও বেশি সময় শিক্ষকতা করেছেন, তারপরে তো স্বাধীন বাংলাদেশে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, শিক্ষকতা পেশায় আছেন। আপনার কি মনে হয়, ঔপনিবেশিক আমলের পাঠক্রমটাই আমরা অনুসরণ করছি নাকি আমাদের স্বাধীন দেশের আলোকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের পাঠক্রমটা তৈরি করতে পেরেছি?

আনিসুজ্জামান: ঔপনিবেশিক শাসনামলেও তো বড় বড় মানুষ তৈরি হয়েছিল এই পাঠক্রম থেকে। মানে স্যার আশুতোষ নিজেও তো ঔপনিবেশিক আমলের। বঙ্কিমচন্দ্রও। সবটাই যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার দোষ সেটা আমি বলব না। আমরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার থেকে খুব বেশি দূরে যেতে পারি নি। তার একটা কারণ সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর সামনে একটা প্রশ্ন থাকে শিক্ষাখাতে যে অল্প বরাদ্দ এ দিয়ে তারা কী করবে? তারা কি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা দেবে নাকি উচ্চশিক্ষার ওপর জোর দেবে? আমরা ঔপনিবেশিক আমলের মতোই রয়ে গেছি প্রায়। মালদ্বীপ হচ্ছে একটা উদাহরণ। তাদের জোরটা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। এখন কী হয়েছে ঠিক জানি না, কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সেখানে কোনো কলেজ ছিল না, সব হাইস্কুল। আমরা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যটা অনুসরণ করছি। এখন আমরা হয়তো বিষয়গত কিছু পরিবর্তন এনেছি কিন্তু পড়ানোর যে মৌলিক ধরন এটা আমরা রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ শিক্ষাদানটা সবসময় সিলেবাসকেন্দ্রিক। আমি এ বছর কোনো একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছি, কিন্তু আমি চাইলে সেটা আমার কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। কারণ আমি ওই সিলেবাস দিয়ে বাঁধা। আমেরিকান শিক্ষার পদ্ধতির মাঝে এই সুযোগটা আছে। ওই সিলেবাসের দ্বারা তারা শাসিত নয়। কী ভাবছে তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ তাদের আছে। এইটা আমি ঠিক জানি না আমরা এখানে করতে চাইব কি না। করলে ভালো-মন্দ কী ফল পাব?

বিশ্বজিৎ ঘোষ: আমার আর একটা জিজ্ঞাসা, আমার নিজেরও দীর্ঘদিনের কৌতূহল আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে সমাধানটা পেতে চাইব। সেটা হলো শৈশব থেকে আমরা দেখি ধর্মশিক্ষা বলে একটা সাবজেক্ট এবং এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাদের বই পাঠ করে। এবং দেখা যায়

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মূল যে ক্লাস সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা থাকে এবং অন্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্লাস বা রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে শৈশব থেকেই কি একটা বিভাজন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে না ? ধর্ম যদি করতেই হয় তাহলে সমন্বিত ধর্মশিক্ষা কেন নয়? সকলেই সকল ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে জানুক। এ ব্যাপারে আপনার অভিমতটা পেলে একটু ভালো হয় স্যার।

আনিসুজ্জামান: আমরা কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে ভেবেছিলাম একটা নীতিশিক্ষা বলে যদি কিছু চালু করা যায় তাহলে সবাই পড়তে পারে। তারপরে যখন মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মত হলেন যে শিক্ষাজীবনের প্রথম আটবছর একই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে যদি ধর্মশিক্ষা সকলকে দেওয়া হয় তখন এই আপসটা করা হয়। তখন আমরা বললাম যে, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিল তাঁরা বললেন যে, সাধারণ শিক্ষা-মাদ্রাসা শিক্ষার ভাগটাই যদি উঠে যায় তাহলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হব, তাতে ধর্মশিক্ষা দিলে ক্ষতি হবে না। এখন ধর্মশিক্ষার অসুবিধা হচ্ছে দুটো। প্রথমটা হচ্ছে ওই বিভাজন। ভাগ হয়ে যায়, যেটা বলছ, ধর্মপরিচয় দিয়ে সবার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু এ জায়গায় সর্বধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবে না। বিষয়টা অনেক ভারী হয়ে যায়। আর এরমধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক বিষয় চলে আসবে। মানে তুমি এক জায়গায় বলবে যে স্রষ্টাকে আকারে পাওয়া যায় আবার অন্য জায়গায় তিনি নিরাকার—এই ধরনের বিষয়গুলো চলে আসে।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, যেটা অনেকেই যুক্তি হিসেবে বলেন যে, অভিভাবকেরা তো চান ছেলেমেয়েরা ধর্মশিক্ষা পাক। এখন সব অভিভাবকের তো ধর্মশিক্ষা দেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই। কাজেই রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব কেন নেবে না? এখানে একটা জবাব আছে মানে আমার জবাব যেটা ছিল যে, তাহলে তোমার ছেলেমেয়েদেরকে মসজিদে পাঠাও, সেখানে তো ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যধর্মের যারা তাদেরকেও ধর্ম নিয়ে কাজ করে যারা তাদের কাছে পাঠাও। কিন্তু বাস্তবে মনে হয় এটা আর করা যাবে না। কারণ একবার করার পর এটা এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসাটা সহজ হবে না। কিন্তু ধর্মশিক্ষা বইতে মাঝে মাঝে এমন সব কথাবার্তা থাকে যেটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আঘাত করে, সেটা বন্ধ করা দরকার।

বিশ্বজিৎ ঘোষ: স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, এখনো শিক্ষকতা করছেন, আপনি আমাদের মাথার ওপরে আছেন এটা আমাদের অনেক বড় একটা ভরসার জায়গা। কাজেই আজকে যাঁরা নতুন শিক্ষকতায় আসছেন, শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করছেন তাঁদের উদ্দেশে আপনি কি কিছু বলবেন ?

আনিসুজ্জামান: যেটা বলেছিলাম, আমাদের সময়ে আমরা কিছু মৌলিক দায় স্বীকার করে নিয়েছিলাম—ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কর্তব্যবোধ, বিভাগের প্রতি আনুগত্য এবং অব্যাহত জ্ঞানচর্চা। আমি তাদেরকেও বলব এইসব অনুসরণ করতে। আর আমি নিজের থেকে একটা কথা বলি, এই যে আমি বাংলা সাহিত্যই পড়ালাম সারা জীবন কিন্তু আমি লেখালেখিতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম না। আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি একটা সামগ্রিক দৃষ্টি অর্জন করতে না পারি তাহলে শুধু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আবদ্ধ থাকা সারা জীবন, এটা খুব ফলদায়ক নয়। এটা আমি ভাবতে বলব সবাইকে। যার যার ক্ষেত্রের বাইরেও যদি সবাই চিন্তা করে তাহলে নিজে সমৃদ্ধ হবে আবার সেই সমৃদ্ধি অন্যের উপকারেও আসবে।

সৌজন্য : অন্যদিন, বাংলাদেশ।

পরলোক ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

‘পৃথিবীতে কতকিছু তুমি জানো না, তাই বলে সেসব নেই? কতটুকু জানো? জানাটা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এত লোক দলবেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বই কী! কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোনও একদিকে ঝুঁকে পড়াটাই গোঁড়ামি।’— কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে।

কথা উঠেছিল মংপুতে বসে। প্লানচেটে, মিডিয়ম, আত্মা— এসব নিয়ে। যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ সেদিন সবকিছু ভাঁওতা বলে এ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাঁর কাছে মৃত্যু তো এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া। ইহলোকের প্রভাত থেকে পরলোকের রাত্রিতে প্রবেশ করা।

অতএব মৃত্যু কি? এত ভয়, এত সংশয় এই মৃত্যুকে নিয়ে? জন্ম ও মৃত্যুর দুটো ঘরের মধ্যে দরজা তো মাত্র একটি। ‘কেন রে এই দুয়োরটুকু পার হতে সংশয়?’

সবই ঠিক, কিন্তু মানুষ বোঝে কই? কী ভয়ানক শব্দ এই ‘মৃত্যু’। শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে সমস্ত আনন্দ-কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে যায় কেন? রিপুরা কেঁদে ওঠে ভয়ে, মন থেকে আর্তনাদ করতে করতে পালায় কুটিল কামনা। এসবের কারণ বোধকরি, ‘জীবন আমার/এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,/মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়।।’

মৃত্যুকে ভালবাসতে পারলেই, মৃত্যভয় দূর হবে মানুষের মন থেকে। এই বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে বসেছেন। পরলোক থেকে বিদেহী আত্মাদের ডেকে আনিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, তাঁর আগেও ঠাকুরবাড়িতে বিদেহী আত্মার সঙ্গে অনেকেই কথা বলেছেন প্লানচেটের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের চক্রে কিন্তু প্রায়শই মিডিয়ম হতেন উমা সেন। ডাকনাম ‘বুলা’। বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা।

বুলাকে মিডিয়ম করে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরলোকের আত্মাকে আনিয়েছেন। কথা বলেছেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁর ডাকে এসেছেন মাইকেল মধুসূদন, জ্যোতিদাদা, কন্যা মাধুরীলতা, স্ত্রী মৃণালিনী, নতুন বৌঠান কাদম্বরী, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, পুত্র শমীন্দ্রনাথ। এসেছেন কবি-অনুরাগী অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ।

‘মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করিনে।’ হ্যাঁ, বিশ্বাস করেন না বলেই তো তিনি মৃত স্ত্রী মৃণালিনীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামত জেনে নিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। কেন,

সেবার পুত্র রথীর বিয়ের ব্যাপারে? অবনীন্দ্রনাথের বিধবা ভাগ্নী প্রতিমার সঙ্গে তাঁর পুত্র রথীর বিয়ে দেবেন কিনা জানতে চাইলেন মৃণালিনীর বিদেহী আত্মার কাছে।

সম্মতি পেয়েছিলেন তিনি। ... 'যখনই আমি কোনও একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর (স্ত্রীর) সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা' নামে বই লিখেছেন। প্রভূত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাপারগুলো শান্তিনিকেতন থেকে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে তিনি উদ্ধার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের এক অদৃশ্য দিকের প্রতি আলোকপাত করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন : তাঁর গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীকে প্লানচেটে আনার ব্যাপারটা উদ্ধার করছি:

'সেই নতুন বৌঠান আত্মহত্যা করলেন ১৮৮৪ সালে, মাত্র ২৫ বছর বয়সে। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কোনওদিন ভুলতে পারেননি, জীবন-সায়াহ্নে এসেও বার বার স্মরণ করেছেন স্নেহময়ী মমতাময়ী নতুন বৌঠানকে।

এই পরমাত্মীয় মৃত্যুর পরেও বার বার ঘুরে ফিরে এসেছেন কবির জীবনে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে স্বপ্ন দেখেছেন অল্প কয়েকবার, দেখেন নতুন বৌঠানের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, 'তুমি কেন এলে; এখানে তোমাকে আর কেউ চায় না।'

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন মিডিয়মে কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ আনেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, — 'বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।'

রবীন্দ্রনাথ সেই পুরাতন সম্বোধনে বৃদ্ধ বয়সেও খুশি হয়েছিলেন।

এই কাদম্বরী দেবী যখন মিডিয়মে আসতেন, কদাচিৎ নাম বলতেন, কিন্তু কথার ধরনে রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন তিনি কে? ১৯২৯ সালের ৪ নভেম্বর। কাদম্বরী দেবী এলেন।

কে?

— নাম জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি মনে যা ভেবেছ, আমি তাই।

তারপর মিডিয়মে কাদম্বরী যা বললেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য।

—'যে সব কথা বেরোলো সে ভারী আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ জানে না।' (রাণী মহলানবীশকে চিঠি)

আর একটি দিন। ১৯২৯ সালের ২৮ নভেম্বর। আবার নতুন বৌঠান।

কে?

—এখন তো সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন তো আসব না জানো। না, এখন কাজ নেই।

সেই নভেম্বরেই উনত্রিশে। বিকেল। শান্তিনিকেতন।

কে? কী নাম?

—আমি একটি কথা বলে চলে যাব। জানি কিছুকাল তোমার কাছে আসা সম্ভব হবে না।...

আমার কাছে আসার দরুন কোনও ক্ষতি হয়েছে তোমার এখন?

—না, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি কার ভিতর দিয়ে আসব।

ওইখানে যে মিডিয়ম আছে, তাকে অবলম্বন করে তো আসতে পারো।

—তিনি যদি না থাকেন?

তিনি থাকবেন না, তা তো জানি।

—সেই কথাই বলছি।

হ্যাঁ, অনেকদিন হয়তো পাব না। আবার কলকাতায় যখন ডাকব তখন আসবে?

—বেশ, যাই।

খানিক বিরতি। আবার আত্মার আবির্ভাব। আবার রবীন্দ্রনাথ নড়ে-চড়ে বসেন।

—কে? কী নাম?

—যাইনি।

ভাল। তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা করেছি, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি?

—না, ভাল লেগেছে।

কাল রাতে কি এসেছিলে?

—বলব না।

কাল রাতে কি কাছে এসেছিলে?

—কথা বলব কী করে?

হয়তো এসেছিলে আমার মনে হয়। মিডিয়ম না থাকলে আসতে পারো না? এখানে আর কোনও মিডিয়ম আছে বলতে পার?

—না, কেমন করে বলব, ঠিক কে যে ডেকে নেয়, তা তো আগে থেকে বোঝা যায় না। তুমি মুশকিলে পড়েছ, আমি যাই।

এবারও নাম নেই। কিন্তু অনুমান করা যায় কাদম্বরী দেবী। তারপর আর একদিন। ১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর। রাত।

কে?

—কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলাম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

তুমি নাম বলবে না?

—না।

একটা কবিতা লিখে দেবে?

—আমার বিদ্যে কি অজানা?

আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভাল ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি। তুমি জানতে?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম! কেমন করে বা বোঝাব।

আমি তোমাদের কিছু বুঝতে পারিনে। কী করে আস, কী করে যাও, কী করে থাক— কিছু বুঝতে পারিনে।

—শেষ রাত্রে শিরশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে, আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলেছিলুম, একদিন যে, আমার অসুখ করেছে, তুমি যদি এসে থাক আমায় একটু সেবা করে যাও।

—তুমি চাও, কিন্তু ভাল করে দেওয়ার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কী মুশকিলে ফেলেছি।

কিছু মুশকিলে ফেলনি। তোমার এখন যে রূপ আছে, সে কি আগের মতো— তোমায় আমরা যখন দেখেছিলুম?

—শমীর ভাষায় বলা যায়, কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো, কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।

তোমরা পরস্পরকে দেখ যে, জানো যে, সেটা কেমন করে হয়?

—হাওয়ার কি রূপ নেই?

আমাদের কাছে তো হাওয়ার রূপ নেই।

—ভাব আছে, গতি আছে, বেগ আছে।

তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কি ওই রকম প্রভেদ— যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার প্রভেদ?

—না না, অন্য রকম। বোঝানো যায় না। তুমি আমায় দেখলে ঠিক চিনবে। আমার ছায়াটা আজও আছে, প্রাণ আছে, দেহ নেই শুধু।

কোনও নাম নেই, ইনিও সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের (১৮৮২) দু'বছর পরে কাদম্বরী দেবী আত্মঘাতী হন (১৮৮৪)। রবীন্দ্রনাথের ডাকে তিনি বার-তিনেক এসেছেন প্লানচেটে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায়: 'বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্লানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে। বৃদ্ধ বয়সে এতকাল পর এই পরিচিতা মিডিয়ামের (বুলা) সাহায্যে অতি-প্রাকৃত তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।'

মহাভারতের শকুন্তলা

জয়তী রায়

আজ শকুন্তলার কাহিনি। মহাভারতের শকুন্তলা। অপরাধ নেবেন না মহাকবি কালিদাস। পৃথিবী যাঁকে চেনে তিনি আপনার সৃষ্ট মানসপ্রতিমা। কল্পলোকের রূপসী নায়িকা। আর ইনি? দার্শনিক মনোবিদ মহর্ষি ব্যাস দৃষ্ট ভূমিজাত অরণ্যকন্যা। জন্ম থেকে পরিত্যক্ত, অনাথ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মম শোষণের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টার মধ্যে আর যাই থাক, কাব্য থাকে না।

হে মহাকবি, ঘটনার বিন্যাস ও বর্ণনায় যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশ্রম প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন সুচারুভাবে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলেছেন এমন ললিত বর্ণনায় যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

শব্দ–ছন্দ–অলঙ্কার–উপমায় ও কাব্যিক সুষমায় যাঁকে ফুটিয়ে তুলেছেন, পৃথিবীর চোখে সেই নারী, অবলা,সরলা আশ্রম সুন্দরী। তাঁর শৃঙ্গার, তাঁর রতিকলা, তাঁর সরল শারীরিক সৌন্দর্য কাব্যিক সুষমা যুক্ত বর্ণনায় স্তব্ধ পাঠক বিস্ময়ে ভাবে এই নারী কে? প্রেম, যৌনতা আর কলুষহীন সারল্য—মিলেমিশে জন্ম নেয় এক অপার্থিব শকুন্তলা। সৃষ্টি মাত্রে মহাকবির চূড়ান্ত ভাবের দোলায় ভাসতে ভাসতে মানুষের মনে স্থান করতে নিমেষমাত্র সময় লাগে না।

মহাকবি কালিদাসের স্বর্ণকলমে সৃষ্ট 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'–এর কোথাও নেই আজকের শকুন্তলা। সত্যি কথা বলতে কী, ওইরকম নম্র,ভদ্র, পেলব প্রেমিকা ভাবের নারী মহাভারতের শকুন্তলা কোনওদিন ছিল না। তিনি আজকের নারী। নিজের যোগ্যতায় বাঁচতে চাওয়া অরণ্যকন্যা শকুন্তলা।

২

শকুন্তলা রূপসী। সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। জন্মদাতা পিতা–মাতা অপ্সরা মেনকা আর ঋষি বিশ্বামিত্র যখন, রূপ আর গুণ জন্মগত ভাবে উছলে পড়বে, সে কথা বলা বাহুল্য। তবে, জন্ম দেওয়াটুকু মাত্র। তারপর তাঁরা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কন্যা ত্যাগ করে রেখে যান মালিনী নদীর ধারে, অরণ্যের সীমানায়। ঋষি কন্ব উদ্ধার করেন শকুনপাখির পাখার আড়ালে রক্ষিত সেই ফুটফুটে কন্যাকে। সেই কারণে নাম শকুন্তলা— এই তথ্য আজ কে না জানে? রূপবতী কন্যাটির থই হারা রূপের বন্যায় ভেসে যায় আশ্রমের চারিধার। যেন তাঁরই জন্যে ফুল ফোটে। পাখি গান গায়। আকাশ ভেসে যায় জোছনায়। লোকে বলে উঠল— মায়ের মত রূপবতী। পিতার মত বুদ্ধিমতী।

রূপের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠল গুণ। ধীর স্থির চলন, বাক্য বুঝে উত্তর—

সেইসঙ্গে পালক পিতার শিক্ষা। আশ্রমের পরিবেশ।

অসামান্য ধীযুক্ত পরিবেশের গুণে নানান বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, আর নিয়মিত অনুশীলন... জন্মের দাগ কাটিয়ে ঝরঝরে মানবী হয়ে ওঠে। শরীরে, মনে কোথাও জড়তা ছিল না। নারীজনোচিত অকারণ সঙ্কোচ নেই। নেই জন্ম নিয়ে কোনও রকম অনুশোচনা। ভাবনার সময় ছিল না। আশ্রমের দায়িত্ব পালন করতে হত নিষ্ঠার সঙ্গে। পুষ্পপত্র সংগ্রহ, তরুলতা- পশুপক্ষীর যত্ন, অতিথির পরিচর্যা। হোমযজ্ঞ সম্পাদন করতে বহু সময় অন্যত্র যেতেন পিতা কন্ব। তিনি আশ্রমবাসীদের নির্দেশ দিতেন— পুত্রী শকুন্তলে যথেষ্ট যোগ্য হয়ে উঠেছে। ওঁর নির্দেশ পালন করবে অসঙ্কোচে।

নাহ্। অনসুয়া, প্রিয়ংবদা...এমন কোনও সখী ছিল না, যাঁরা পদ্মপাতায় করে শরীরে সিঞ্চন করবে মালিনী নদীর পূণ্য বারিধারা। চন্দন লেপন বা অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে শীতল করবে শরীর। হে মহাকবি কালিদাস, শকুন্তলা নিজেই ছিল শান্ত নদীর মত ধীর,স্থির,গভীর। চিত্ত বৈকল্য সহজে ঘটার মত দুর্বল ছিল না।

৩

হে মহাকবি, আপনার নায়িকার জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত স্বপ্নের মত বহে গেছে জীবন। মাঝে যে দুর্যোগটুকু ছিল, সেটুকু কাটিয়ে উঠেছে দৈব সহায়তায়। তাকে কেউ কটু কথা বলেনি, গোপন গান্ধর্ব বিবাহের জন্য দোষারোপ করেনি, এমনকি রাজা দুষ্মন্ত ইচ্ছে করে ভুলেও যাননি। সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। রাজার দেওয়া অভিজ্ঞান অঙ্গুরী ফিরে পাওয়া মাত্র মিটে গেল সমস্ত সমস্যা।

মহাভারতের শকুন্তলা জটিল আবর্তে ঘূর্ণিত হতে হতে উপলব্ধি করেছে সরল জীবন বলে কিছু হয় না। কল্পনার সঙ্গে মেলে না অনেক কিছুই। সুন্দরী দরিদ্র কন্যাকে ভালবেসে বিবাহ এবং রানির আসনে বসিয়ে দেওয়া... এমন গল্প রূপকথা শোনায়। বাস্তবের রূপসী হিসেব করে পা ফেলে। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকে। তারপরেও কখনও কখনও ভুল হয়ে যায়। কখনও কখনও সাবধানী পথে এসে যায় মত্ত আবেগের ঝড়। তছনছ হয়ে যাওয়া চেনা পথের অচেনা গোলক ধাঁধায় ঘুরে কে জানে সেই মেয়ে আবার খুঁজে পায় কিনা আপন অস্তিত্ব।

মহাভারতের শকুন্তলা এক সাধারণ মেয়ে। তার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ নিয়ে কোনও আলোড়ন ঘটেনি। আশ্রমে অতিথির আগমন নতুন ঘটনা নয়। লোকজন হই-হট্টগোল করে রাজা এসেছেন। নিয়ম মতো এগিয়ে দেওয়া হয়েছে জল,ফল ইত্যাদি। জড়তাহীন দ্বিধাহীন এই সেবায় বিন্দুমাত্র মিশে নেই লাস্য কটাক্ষ। রাজা অবশ্য প্রথম থেকেই দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। একে রূপসী তায় নির্জন তপোবনে একাকী...। বহুবল্লভ কামার্ত রাজার ভোগ করার উদ্দেশ্য প্রবল হয়ে উঠলে তিনি স্থির করলেন — এই রূপসী চাই। আজকেই। এখুনি। মনোরঞ্জক নায়কের মত নানা উপায় ব্যবহার করতে শুরু করে অভিজ্ঞ দুষ্মন্ত বুঝলেন, বিবাহ নামক পথ অবলম্বন না করলে উপায় নেই। কারণ তাপসী কন্যার প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ, মধ্যবিত্ত ভালমন্দের বোধ— সতর্ক করে দিচ্ছে বারবার। নারী সঙ্গে অভ্যস্ত রাজা তখন নানা ভাবে প্রলোভিত করেন। কাতর অনুনয়, রূপের স্তুতি— শক্তিধর রাজার চেহারা এবং ঐশ্বর্যের মেঘের ছায়া সুনিবিড় করে ঘিরে ধরে কুমারী মনের নরম ভূমি। রাজা উল্লসিত। রাজা উৎসুক— এইবার তবে মিলিত হওয়া যাক...কামনা তৃপ্ত করা যাক! উদ্যত আলিঙ্গন নিয়ে এগিয়ে আসেন রাজা।

৪

হে মহাকবি কালিদাস, সুললিত শব্দে প্রেম নেমে এসেছে অতি ধীরে আপনার নায়িকাকে ঘিরে। প্রণয়-প্রণয়ীর উল্লসিত চিত্ত মধুর ভাবের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে অবশ, বিবশ দেহ নিয়ে মিলিত হয়েছে অনিবার্য সুষমায়। অলৌকিক সেই প্রেমের বর্ণনায় একাকার আকাশ-মহাকাশ-ধরণী। সমাজ-সংস্কার তুচ্ছ, তুচ্ছ লোকাপবাদ। প্রেম— শাশ্বত প্রেম চিরন্তন।

মহাভারতের শকুন্তলা সাধারণ গৃহস্থ অনূঢ়া কন্যা। এতটুকু ভুল সর্বনাশ করে দেবে পিতৃগৃহ-মর্যাদার। রহস্য

থাকলে চলে না মধ্যবিত্ত আশ্রম কন্যার। নারীর রূপের প্রসাদ লাভের জন্য পুরুষের হাহাকার দেখে অবশেষে নরম হলেও, মহাভারতের শকুন্তলা ভুলে যায়নি তাঁর মর্যাদা। মাথা উঁচু করে সে বলেছে— হতে পারেন আপনি রাজা, তবে শর্ত যদি মানতে পারেন, তবেই স্পর্শ করতে পারবেন আমাকে।

রাজা স্তম্ভিত। নির্জন তপোবন। পাখির কূজন, নদীর কলতান ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সেখানে তিনি পুরুষ অথচ নারী ভীত নয় এতটুকু? এই নারী স্বতন্ত্র— একথা স্বীকার করতে বাধ্য রাজা। অনিন্দ্যসুন্দর রূপ নিয়ে দীপ্ত শিখার মত অকপট কন্যা বলেছে— শর্ত স্বীকার করলে স্পর্শ করতে পারবেন, নতুবা ফিরে যান।

৫

মহাভারতের শকুন্তলার শর্ত ছিল— সন্তান জন্ম হলে দিতে হবে রাজ্যের অধিকার। সত্যবদ্ধ হও রাজা। তবেই বিবাহ সম্ভব।

কামোন্মাদ রাজা বললেন— যা খুশি, যেমন খুশি শর্ত হোক। আমি স্বীকার করছি। তোমার পুত্র রাজা হবে ভবিষ্যতে। তোমার জন্য রাখা রইল ধন-মান-সম্পদ। হে নিতম্বিনী কন্যে, তুমি আমায় গন্ধর্ববিবাহ করো।

প্রণয় নিবেদনের এমন প্রবল আবেগ তছনছ করে দেয় সংস্কারের বাধা।

ওই অজানা,অচেনা পুরুষের তীব্র আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলে অনভিজ্ঞ কিশোরী মন। রাজা নিপুণ শিকারি। মৃগয়া করতে এসে কীভাবে স্থির থাকতে হয় শিকারের সামনে, তিনি জানেন। মিথ্যা জালে জড়িয়ে পড়ে হরিণী। নাগরিক চতুরতা জানে না, তাই বিশ্বাস করে। গন্ধর্ববিবাহ ফাঁদ মাত্র, প্রতিশ্রুতি কথার কথা...তা বোঝে না হরিণী। টানা দুইচোখে ফুটে ওঠা গভীর আকুতি নিয়ে, বিবাহ সম্পন্ন করে— সমর্পণের স্বর্ণথালিতে সাজিয়ে পরিবেশন করে নিজেকে! বিশ্বাস নামক তুচ্ছ বস্ত্র ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। রাজা পরম উল্লাসে ভক্ষণ করেন চলে উপাদেয় নারী শরীর।

৬

রাজা চলে যান। মিলিয়ে যায় অশ্বক্ষুরের শব্দ। পুনরায় নীরব আশ্রম। ঝরা পাতার সঙ্গে উড়ে বেড়ায় অনেক অনেক প্রশ্ন।

আশ্রম প্রশ্ন করে, তরুলতা নদী... প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়... কখনও নিরুচ্চারে, কখনও ফিসফিস, কখনও বিদ্রূপ ব্যঙ্গ মিশিয়ে— কোথায় রাজা? কোথায় সুবর্ণ শিবিকা? এদিকে স্ফীত গর্ভ! ছিঃ ছিঃ।

কন্যা নিয়ে অহঙ্কারী ছিলেন ঋষি কন্ব। বিশ্বাসী ছিলেন নিজ প্রদত্ত সংস্কার আর শিক্ষার উপরে। তাঁর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে ধিক্কার উঠল সমাজ জুড়ে— ঋষি কন্যার ব্যবহার যদি এমন হয়, তবে আর সাধারণ কী দোষ করল?

কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে—অপ্সরা রক্ত বইছে ধমনীতে। আশ্রম পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। বিহিত চাই। হয় স্বামী নিতে আসুক, নতুবা চলে যাক স্বামীর কাছে। পুরুষের স্বীকৃতি ব্যতীত মূল্যহীন নারীর জীবন।

হায় সমাজ! তোমার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত নারীর আর্তনাদ কেউ শুনতে পায় না। আসন্নপ্রসবা শকুন্তলা অপবাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে নদীর ধারে অপেক্ষা করে। প্রতিদিন মনে হয়, এই বুঝি এলেন তিনি। দুরন্ত আবেগে আলিঙ্গন করে বলবেন— ক্ষমা করো প্রিয়ে। রাজকার্যে বিলম্ব হয়ে গেল।

কেউ আসে না। দিনের শেষে পিতার করুণ মুখ ঘিরে ধরে আচ্ছাদনের মতো। তিনি বলেন—কুটিরে ফিরে চলো শকুন্তলে। আমি আছি। ভয় কী?

হে মহাকবি কালিদাস! আপনি কবি। আপনার নায়িকার অবলম্বন আছে প্রিয় সখী— অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা। সমস্তদিন প্রিয়বিরহে মগ্ন থাকার স্বাধীনতা আছে। তাপিত শরীরে চন্দন লেপনের মত আরাম আছে। মহাভারতের শকুন্তলার কেউ নেই। কেউ ছিল না। বাস্তবের ভূমিতে আছড়ে পড়ে বারংবার। একাকী বহন করে সমস্ত করুণ অবস্থা। একাকী প্রসব করে সুন্দর শিশু। সর্বাঙ্গে রাজচিহ্ন, বলিষ্ঠ শিশুর নাম সর্বদমন। এইবার পিতা বাধ্য হয়ে বলেন, পুত্রী— বিশ্বাস আছে, নিজের ভার তুমি বইতে

পারবে। রাজা এলেন না, তুমি যাও তাঁর কাছে। নগরের পথ তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে শিষ্যরা।

— তারা থাকবে না আমার সঙ্গে?

অসহায় পিতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন— এইটুকুই করতে চাইছিল না, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। তুমি একলাই যাবে রাজসভায়। ভয় যেন গ্রাস না করে, মাথা যেন নত না হয় — আশীর্বাদ রইল পুত্রী। জয়ী হয়ে ফিরে এসো।

৭

অরণ্য থেকে নগর যাত্রা— কঠিন, কঠোর, জটিল যাত্রায় পথশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত হয় মন। পরিবর্তিত দৃশ্য, পরিবর্তিত চরিত্র, পরিবর্তিত সংস্কার, চলন-বলন-কথন। কোথায় সেই বিস্তীর্ণ সবুজ বনানী, কোথায় আবাল্যের সখী মালিনী নদী! কেউ নেই...। অপরিচিত রাজপথে রথের ঘর্ঘর শব্দে চমকে উঠতে হয়।

শকুন্তলা কোনওদিন নগর দেখেনি। অট্টালিকা দেখেনি। রাজমহল, রাজসভা— কল্পনাও করেনি। পুত্র সর্বদমন ক্ষুধার্ত। সঙ্গে কিছু ফল-জল ছিল, তাই দিয়ে সস্নেহে বলে— চলো যাই।

বালক প্রশ্ন করে না। নীরবে আঁকড়ে ধরে মায়ের হাত। দুইজনে প্রবেশ করে রাজসভায়। দ্বারি বাধা দেয়— কে তুমি? কী পরিচয়?

শকুন্তলা বলে— মহারাজের পরিচিত।

দ্বারি উদার হাসে।

— ওঃ। সাহায্য প্রার্থী? আজ সেই দিন বটে। আজ রাজা কল্পতরু। ভীড় করে আছে দীন-দরিদ্র। যাও। ওই সোজা চলে গেছে পথ। পথের শেষে বসে আছেন রাজা, করুণাময়।

দ্বারি যেদিকে তাকিয়ে দুইহাত কপালে রাখে, সেইদিকে সভাকক্ষের মাঝ বরাবর সোজা পথের দুইধারে থিক থিক পুরুষের কামার্ত চক্ষু। সোজা তাকিয়ে দেখা যায়, সিংহাসনে আসীন রাজা। ইনিই কি সেই ব্যাকুল প্রেমিক? আজ মুখশ্রীতে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা...। সেইসঙ্গে মিশে আছে ভয়। ভয় বহন করে আনে নীরব ইঙ্গিত অপরাধীর পূর্ব কৃত অপরাধের। মনে পড়ে গেছে কালিমালিপ্ত অতীত, তাই রাজা হিংস্র এখন। কঠোর এখন। কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন— কে এই ভিখারিনী ? বিদায় করো এখুনি।

কে যেন বলে উঠল— ভিখারিনী নয় মহারাজ। দাবি করে, সে আপনার রানি। সঙ্গের পুত্রটি আপনার ঔরসজাত।

রাজা হেঁকে ওঠেন—অবান্তর কথা। বললেই হল? কোনওদিন দেখিনি ওঁকে।

শ্রবণ অসাড় শকুন্তলার। এ কী কথা শুনি? হে রাজন, কোনওদিন দেখোনি? যার অঙ্গ শোভায় মুগ্ধ তোমার চোখে পলক পড়েনি, যার নিরাবরণ দেহের প্রতিঅংশের গোলাপি আভায় চুম্বন ছড়িয়ে দিতে দিতে ক্লান্ত হয়নি তোমার ওষ্ঠ, বীর্য প্রোথিত করে দিতে দিতে গদগদ স্বরে পুত্র কামনা করেছিলে যেই গর্ভের কাছে, দেখোনি তাঁকে কোনওদিন?

রাজন, তুমি জানো না, মিথ্যের নিজস্ব কটুগন্ধের তীব্রতা ঢেকে রাখা যায় না হাজার প্রয়াসে। তোমার সব মনে আছে রাজা, মনে আছে সব। আশ্রম পালিতা কন্যাকে সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু বিবাহ? সম্ভব নয়, তাই না? মলিন ধূসরিত তাপসী দাঁড়িয়ে আছে করুণ মুখে, হুঙ্কার দিলে মিলিয়ে যাবে কুয়াশার মত। সেইসঙ্গে মুছে যাবে পাপের কলঙ্ক— এমত নির্বোধ ভাব খেলা করে রাজার মুখে। শকুন্তলা দেখে, অনুভব করে। ক্রোধে, ঘৃণায় মনে হয় আকাশ বিদীর্ণ করে হেসে ওঠে। মনে হল চিরে ফেলে মেদিনী। মনে হল চিৎকার করে বলে— আমি শকুন্তলা, অরণ্যনন্দিনী। প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করার শিক্ষা পেয়েছি শৈশব থেকে। অপেক্ষা করো রাজন, সমুচিত পাবে উত্তর।

৮

হে মহাকবি কালিদাস,

পুরুষের কাছে নিজের সতীত্ব প্রমাণের জন্য কোনও অঙ্গুরী ছিল না, ছিল না দুইসখীর সাক্ষ্য। ঋষি দুর্বাসা

অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাই রাজা ভুলে গেছেন। নাহলে তিনি কণ্ঠের হার করে রাখতেন দরিদ্রকন্যা— এমন অজুহাত, অনুকম্পা লাভ মহাভারতের শকুন্তলার হয়নি। এমন উদাহরণ বাস্তবে হয়ই না। মহাভারত বাস্তব তুলে এনেছে। কঠিন কঠোর বাস্তব। পুরুষ অস্বীকার করছে নারীকে। ভোগ করবে দায় নেবে না। আঁধার আনবে, আলো জ্বালবে না। কলঙ্ক দেবে মোচন করবে না। নারীর ভূমিকা কী হবে? মুখ বুজে মেনে নেওয়া?

হে মহাকবি কালিদাস, সেই দিনের কথা মনে করলে শকুন্তলার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে আমাদের। নারী–জন্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। সোহাগিনী প্রেমিকা হয়ে থাকার চেয়ে অনেক সম্মানের নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। প্রাথমিক জড়তা ভুলে গিয়ে উন্নত শির শকুন্তলা বলে উঠল—মিথ্যা আর কত বলবে? আমার গর্ভে তোমার দেবশিশুর মত পুত্র হয়েছে। তাকে তুমি যৌব্যরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে নিজের শর্ত ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছ? অতীত মনে থাকা সত্ত্বেও আমাকে বলছ দুষ্ট তাপসী? তুমি কি জেগে ঘুমোচ্ছ? ইতর লোকের মতো সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করছ। কিন্তু হৃদয়কে ফাঁকি দিতে পারবে? নির্জনে পাপকাজ করলেও সাক্ষী থাকে নিজের মন। জানো না সে কথা?

আমাকে তুমি বেশ্যা, কুলটা, ধনলোভী—কোনও কিছুই বলতে বাকি রাখলে না রাজা! তবে শুনে রাখো, বেশ্যা মেনকা অনেক উন্নত চরিত্র খলচরিত্রের পুরুষের চেয়ে। তুমি আমাকে কী ত্যাগ করবে? আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম। কিন্তু, তার আগে...শুনুন সর্বজন, দেখুন সভাস্থবিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ — এই বালক, যার নাম সর্বদমন— তাকিয়ে দেখুন, বালকের শরীরের সমস্ত জন্মচিহ্ন রাজার থেকে প্রাপ্ত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আসুন। পরীক্ষা করে দেখুন, রাজার ঔরসজাত কি না এই পুত্র?

স্তব্ধ সভাস্থ সকলের অবিশ্বাসী দৃষ্টি রাজার দিকে। এত আত্মবিশ্বাস নারী পায় কী করে? তবে কি ঘটনা সত্য?

হে মহাকবি কালিদাস, আপনার শকুন্তলা অনেক মায়াময়। কোমল। কোমল নারী অধিক জনপ্রিয় হয়। আপনার শকুন্তলা বিদগ্ধ পণ্ডিতের কাব্য আলোচনায় উঠে আসবে, দেশ–বিদেশে তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলবে— মহাভারতের শকুন্তলার লড়াইয়ের কথা মনে রাখবে না কেউ।

সেদিন রাজসভায় একাকী নারীর দাবি শুনে পুরুষের হৃদকম্প শুরু হয়েছিল। অপেক্ষমান হাজারো প্রজার চোখে রাজার সম্পর্কে অবিশ্বাস ফুটে উঠছে একটু একটু করে...। নারী ভোগ্যবস্তু না হয়ে ধারালো তরোয়াল হলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সমাজ সম্মান। ধারালো তরোয়ালের মতোই তীক্ষ্ণ গলায় বলে চলেছে শকুন্তলা—। তুমি আমাকে কী ত্যাগ করবে? আমি তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। তোমার সাহায্য ছাড়াই রাজা হয়ে উঠবে আমার পুত্র। তুমি ভেবেছ কী রাজন? নারী মাত্রেই অসহায়? নারী মাত্রই অবলা? নারীকে ভোগ করে ফেলে রেখে চলে আসবে জীবনভর চোখেরজল ফেলার জন্যে?

রাজা ভয় পায়। মন্ত্রী ভয় পায়। জ্বলন্ত সত্য দৈববাণীর মতো ধ্বনিত হতে থাকে চারিদিকে। বাধ্য হলেন তিনি নতমস্তক হতে। শকুন্তলার কাছে ক্ষমা চাইতে।

হে মহাকবি, আপনার স্বর্ণলেখনী অমর হয়ে থাকবে। প্রেমিকা শকুন্তলার প্রতি করুণায়,ভালবাসায় ভিজে উঠবে পাঠকের চোখ।

আর মহাভারত? নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনের কশাঘাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার কেউ দেবে না, ছিনিয়ে নিতে হবে। করুণা বা অনুকম্পা নয়, মহাভারতের শকুন্তলা বেঁচে থাকবে আত্মবিশ্বাসের প্রতীক চিরঅম্লান দীপশিখার মতো।

সঙ্গ নিঃসঙ্গতা

শুভ চক্রবর্তী

‘রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর দোষ আমরা যে-কেউ যে-কোনোদিন ধরতে পারি, আর যাঁকে না-হ’লে আমাদের কারোরই এক মুহূর্ত চলে না।’ কথাগুলো লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি লেখায়। কেননা তিনি মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত লেখায় আমাদের চেনার থেকে অচেনাই হয়ে উঠেছেন বেশি। অর্থাৎ তিনি বলতে চান ‘‘আমরা কি পেতে পারি না বাহুল্য বাদ দিয়ে তাঁর বাণী, উচ্ছ্বাস বর্জন ক’রে উপলব্ধি কিংবা তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ’ রচনার সমাহার?’’ আর একটি লেখায় যখন আমরা বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধির স্তরে পৌঁছোই, যেখানে তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের জীবন বড় শান্ত আর সমতল, সেখানে নেই কোনও উন্মাদনা বা বন্ধুরতা। এর অর্থ উপার্জন করা আমাদের প্রয়োজন না হলে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথকেই ভুল বুঝব তাই নয়, তার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ভিন্নতাকেও স্পর্শ করতে পারব না। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন কোনও ভিন্নতা নেই? আমরা যদি তাঁর কথার সুতো ধরে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো আমরা আমাদের স্পর্শ চেতনায় খুঁজে পাব ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথকে। এই ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথ তাহলে কেমন? যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করেননি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সেই রকম ভিন্নতাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেননি। তাহলে কেমন করে বুঝতে পারব সেই রবীন্দ্রনাথকে? তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন বৃত্তান্ত আমাদের একান্ত আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দিতে? নাকি ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে আমরা তাঁর আত্মগত ‘আমি’র সন্ধান পাব? তাহলে এখানে প্রশ্ন উঠবে আমরা কি রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনার পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথকে জানার চেষ্টা করছি? নাকি তাঁর কাব্য ধারাকে আরও বিস্তারিত করে তাঁর জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেখতে চাইছি? এ কথা ঠিক যে, বুদ্ধদেব এই সত্যকেই একজন কবির ভিন্নতা মনে করেছেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা পরম্পরায় ‘মধুসূদনের মতো নাটকীয় নয়, শেলীর মত বাণবিদ্ধ বা কীটসের মত তীক্ষ্ণকরুণও না; আবার গ্যেটের হেঁয়ালিবহুল অনৈতিক কিংবা টলষ্টেয়ের দ্বন্দ্বপীড়িত উত্তলতার চিহ্ন নেই তাতে।’ এই কারণেই কি তাঁর অমন এক সিদ্ধান্তের দোরগোড়ায় আসতে হল? এমন করে একজন কবির অভিপ্রায়কে সত্যিই কি আমরা স্পর্শ করতে পারি? কেননা তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রবাহ খুবই শান্ত। তেমন কোনও ঘটনা নেই যা আমাদের মন আকর্ষণ করবে। এ কথা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রবাহকে ‘সত্য আমি’র প্রবাহ মনে করেননি। আর তাই তাঁর জীবনের সত্য ভিন্ন এক প্রবাহ মনে হয় আমাদের অভিজ্ঞতার আবর্তে। মনে হয় তিনি ততটা আবিষ্ট নন ঘটনায়। কেননা

তিনিই তো কবির উপলব্ধির সত্যকে আরও নিবিড় করে বলার মধ্য দিয়ে বললেন 'কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পরিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনও গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না।' কেন তিনি অমন করে বললেন? কারণ তিনি মনে করেন 'সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান্য কাজকর্মের মতো ক্ষণিক বিক্ষোভজনিত নহে।' তার মানে এই নয় যে, সে জীবনের কোনও মূল্য নেই। বরং বলা যায় ওই জীবনচর্যাই 'আমি'র হয়ে ওঠা। যাকে আমরা ব্যক্তিগতকৃত 'আমি'র সঙ্গে এক করে দেখি। বুদ্ধদেব সেই জীবনের চর্যার কথা প্রসঙ্গে ভিন্ন এক প্রসঙ্গ টেনে এনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আমিকেই বড় দেখতে চাইছেন। এই কারণেই কেউ কেউ মনে করেন কোনও জীবনীকারের পক্ষে রবীন্দ্রজীবন একটা সমস্যা। সমস্যা এই কারণে নয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা প্রবাহ নেই। বরং রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা প্রবাহ এত বিস্তারিত যে আমাদের উপলব্ধির স্তর সেখানে পৌঁছোতে পারে না। আর এই কথাটা এতটাই সত্য যে, বুদ্ধদেব তাঁর লেখায় পাঠকদের মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ওরকম বিনাব্যয়ে কোনও পাঠক তাঁকে পেতেই পারেন না (কেননা পাঠক হতে গেলে নিজের ওপর দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি চাই)। আর এর পরেই বলবেন 'তার রচনায় প্রবেশ করতে হলে তাঁকে উপার্জন করে নিতে হবে আমাদের।' অর্থাৎ একদিকে তিনি ঘটনা প্রবাহের ভিন্নতায় রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চাইছেন আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা সমগ্রই যে একমাত্র পথ তাঁকে পাওয়ার তাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এই এক দ্বন্দ্ব বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধির। আর এই একই কারণে তিনি তাঁর ধারণা থেকে কখনও কখনও সরে গিয়েছেন এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। কেন? কেন তাঁর মনে হল তাঁর সমগ্র রচনায় রয়েছে বাহুল্য? কারণ বুদ্ধদেব বসুর জীবন শুধু আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল বলে নয়, কারণ তিনি মনে করেন 'সমালোচনাকেই সৃষ্টিকর্ম করে তোলা'— এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ সেখানেই রবীন্দ্রনাথ, যেখানে কবিতা ও গদ্য রচনা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের অখন্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে। আর তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও পর্যায়ের গদ্য অতিভাষী এবং কবিতাও একই দোষে আবিষ্ট অলঙ্কার বহুল ও অস্পষ্ট উচ্ছ্বাসপ্রবণ। উদাহরণ হিসেবে টেনে এনেছেন 'বসন্ত যাপন'–এর কবিতার আঙ্গিক। তেমনই আবার 'এবারে ফিরাও মোরে' বা 'বসুন্ধরা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গ। অর্থাৎ তিনি সেই রবীন্দ্রনাথকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একা। নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ তাই বুদ্ধদেব বসুর একান্ত রবীন্দ্রনাথ। আর তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার সত্য থেকে আলাদা করে দেখবার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন।

আর এইটিই তাঁর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র করে পাওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র করে পেতে গেলে তাঁর সমগ্র 'আমি'র হয়ে ওঠার প্রবাহকে পেতে হবে। এর মানে হল তাঁর সমগ্র রচনার সঙ্গে পাওয়া। কেননা রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন : 'শুধু কি কবিতা–লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখন্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছে।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কথাটা এই কারণে বলেছেন যে 'এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।' আমাদের এও মনে রাখতে হবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের অহমিকা লক্ষ্য করেছিলেন এই কথায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সম্বন্ধে অপৌরুষের দাবি করেছেন। আর এই একই ধারনায় বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করতে পারেননি। না হলে তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার দাবি তুলে বলতে পারতেন না সমগ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে শুধুমাত্র

একটি নির্দিষ্ট আধুনিকতার জালে রবীন্দ্রনাথকে পেতে। কেননা রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত 'আমি'র জীবনেকেই তো বড়ো করে দেখেননি, তিনি সামগ্রিক আমির সত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন এক অন্তর্গত ধরণে। আর এই ধরণই তাঁর ব্যক্তি থেকে 'বিশ্ব আমি'র দিকে যাত্রা। 'সুরগুলি তার নানা ভাগে/ রেখে যাব পুষ্পরাগে।' আবার তাঁকে একইসঙ্গে 'বিশ্ব আমি'র সত্যকে 'আমি'র আমিত্ব থেকে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। আর এই যে এক ছন্দ এই যে এক তাঁর ভিন্নতা। এই ভিন্নতাকেই একদিন যেমন কেউ কেউ মনে করেছেন বাহুল্য, অস্পষ্ট। মনে করেছেন বড় শান্ত তাঁর জীবন বৈচিত্র্য। ঘটনাবহুল নয় তাঁর সামগ্রিক জীবন প্রবাহ। কেননা বুদ্ধদেব ঠিক রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত 'আমি'র কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন কবির ভিন্নতাকে। কেননা তিনি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একটি সুতোয় গেঁথে নিতে। বিচ্ছিন্ন করে নিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তাকে। আর এইটিই তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ধারণার মূল আপত্তি। কেননা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারেন, এই ধারণা তাঁর মনে কীভাবে বিস্তারিত হল? অথবা কেন তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা সামগ্রিকভাবে বিস্তারিত নয়? তাহলে তো সমকালীন ভিন্নতাও প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়। আর তখন আমাদের মনে হবে তাহলে কি বাংলা কবিতার ধারাবাহিক যে ভিন্নতা তা সামগ্রিক ভিন্নতা নয়? বরং তা ব্যক্তিগত 'আমি'র চর্চার একটা অভ্যাস? কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বুদ্ধদেব বসুর এই যে একটা দেখার ভিন্নতা গড়ে উঠেছিল তা বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে। কেননা তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন বাইরের দেশের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে। শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রবাহ নয়, যখন তিনি তাঁর কবিতার ভিন্নতাকে প্রকাশ করতে চাইছেন তখন তাঁর মনে রাখা উচিত তাঁর সমগ্রতার আধারও। আর এই কথাই তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পী জীবনের প্রতিটি বাঁকে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব লিখলেন বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ: 'মানসী'। আর এখানেই তিনি প্রায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করলেন 'কবি-কাহিনী' থেকে 'ছবি ও গান' পর্যন্ত অনবরত লিখেও একটি কবিতাকেও পাঠযোগ্য করে তুলতে পারেননি। এও বললেন যে, রূপে ও সৌরভে যাকে আমরা রাবীন্দ্রিক বলে থাকি অর্থাৎ এখানে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য স্পষ্ট। এই সময়টির জন্য প্রায় সত্তর বছরের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর মানসী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁকে বলতে হল, নাটক আরম্ভ হল 'মানসী'-তে। যখন তিনি লিখলেন:

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি,

বুদ্ধদেব এতদিন পর যেন আবিষ্কার মোহে প্রমাণ করতে চাইলেন যে 'মানসী' হচ্ছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই, যাকে 'রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব' বলা যায়। অর্থাৎ এখানে এসে আমরা আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাই বুদ্ধদেবের মানসিক আধার রবীন্দ্রনাথের আত্মগত 'আমি' থেকে কতটা ভিন্ন। এটাই তো স্বাভাবিক। আবার এও আমাদের মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতার বইগুলি নিয়ে বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকায় কী গভীর উপলব্ধির বিস্তারিত আভায় কথা তুলছেন। মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই থেকে হয়ে উঠছে বুদ্ধদেবের বই। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও কবিতা বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন ভিন্ন এক আত্মশক্তি। আর এইসব দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন বুদ্ধদেব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের লেখায় বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছিলেন ভিন্ন এক আধুনিক মন। এই মনকেই প্রতিষ্ঠা করতে বুদ্ধদেব পরে প্রশ্ন তুলবেন। তাই বলে কি তিনি তাঁর যৌবনের কবিতাকে অস্বীকার করেছেন? তা তো নয়। বরং সেই বয়সের 'পূরবী'র কবিতাগুলি নিয়ে লিখবেন কবিতা এবং আরও পরে 'পূরবী' ও 'মহুয়া' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলবেন 'এসব কবিতায় এমন একটি গভীর বিষাদ আছে যা সস্তা কারুণ্য নয়, যা সত্যিকারের

ট্র্যাজেডির সুর।' আরও একটু এগিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব বুদ্ধদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে ধরা দিচ্ছেন। কেমন সে নতুন? সেই নতুন এই কারণে নতুন যে 'শেষের কবিতা' নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে একরকমের তর্ক শেষে তাঁর উত্তরণ। অর্থাৎ তাঁর মনে হয়েছে, এই ভিন্নতা রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মধ্যে ভিন্ন এক উপলব্ধির জন্ম দেয়। সেই কথা বলতে গিয়ে তাঁকে বলতে হল 'আমি অন্য রবীন্দ্রনাথে'র উল্লেখ করেছি, যেন তাঁর কবিসত্তা থেকে প্রবন্ধকারকে আলাদা করে নেয়া যায়।' আর তারপরেই তাঁকে বলতে হয়েছে, ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। কারণ 'রবীন্দ্রনাথ এত বেশি পরিমাণে কবি ছিলেন যে কোনও সময়েই অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। কেননা কবিতাই তাঁর সত্তাসার আর এই কারণেই তাঁর গদ্য এত প্রাণবন্ত।' কিন্তু আমরা জানি যে, বুদ্ধদেবের আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের সূচনা থেকে মধ্য বয়সের কবিতাই। কেন তিনি এইরকম এক ধারা তিনি নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন? এ প্রশ্ন আমাদের কিছুটা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য করবে। কারণ যখন বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে নিজের করে পেতে চাইছেন, তখনই শুরু হয় ভিন্ন এক দ্বন্দ্ব। কেন? যে কেউই তো রবীন্দ্রনাথকে নিজের মতো করে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাহলে? আসলে বুদ্ধদেব একদিকে সম্পাদক অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের একান্ত পাঠক। আর তাই যখন তিনি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের পাঠক হয়ে উঠতে চাইছেন, তখনই তাঁর মনে হচ্ছে 'তাঁর কবিতা বিষয়ে আমি তখন পর্যন্ত (হয়ত এখনও পর্যন্ত) মনস্থির করতে পারিনি। কিংবা সেই বিরাট বিষয়ের সমকক্ষ হতে আমার দেরি আছে।'

এই এক দ্বিধাই যে তাঁর মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই কারণেই 'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' তাঁর আগ্রহের শিকড়ে লেগে থাকে না। যেমনটা ছিল তাঁর 'কবি রবীন্দ্রনাথ'–এর আলোচনায় 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত একটা পর্ব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের 'শেষলেখা' তাঁর আধুনিক মনকে স্পর্শ করতে পারল না। নাকি তিনি নিজেই সেই লেখাগুলোকে রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত 'আমি'কে স্পর্শ করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁর বিচারের মন সরিয়ে রাখলেন? আর এই সরিয়ে রাখা মনের পরিচয় আমরা পাই তাঁর টুকরো টুকরো প্রবন্ধ 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে। এবং আমরা উপলব্ধি করতে পারি তিনি 'কবি রবীন্দ্রনাথ' থেকে 'পোট্রেট অফ এ পোয়েট' বইয়ে একই ধারণায় ভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

কেননা বুদ্ধদেবের আধুনিক মনের গড়ন এতটাই অস্পষ্ট যে, তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতাকে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। এ হল তাঁর চেতনার অস্বচ্ছ এক ধরণ।

পুলিশের ডায়েরি
সৌগত চ্যাটার্জি

পুলিশের ডায়েরি (১)

হাঁদুদা অকৃতদার। দোকানই তার জীবন, সংসার, সাহিত্য, রোমান্স, সুখ, বিরহ। জেঠিমার বাড়িতে মানুষ। তার ছেলেমেদের বড় করা, বিয়ে দেওয়া, সেই বাড়ির সামনেই তার এক ছটাক দোকান। টুকিটাকি, প্রয়োজনের অপ্রয়োজনীয়তার বাইরে।

ছোটবেলায় দেখতাম মাসির বাড়ি এলেই হাঁদুদার দোকানের পেছনে আবছা আলোয় দাদাদের ধোঁয়া ওঠা আড্ডা, লিটল ম্যাগ, কুইজ, প্রেম রাজনীতি থেকে ফিল্ম—বাদ নেই কিছুই।

সেই দাদারা একে একে সব প্রতিষ্ঠা পেলো জীবনে। কেউ গেলো বিদেশে।

আশেপাশে সব গাছপালা কমলো, বাড়ি-ফ্ল্যাট উঠলো, পুকুরের কোলে ঝুঁকে পড়া লিচুগাছ গুলো সাফ হতে হতে জেঠিমার ছেলেমেয়েরা ও বাড়ি বেচে অন্য কোথাও গেলো চলে।

হাঁদুদা সেই একই রইলো নিজস্বতার নিঃসঙ্গ যোদ্ধা হয়ে...।

ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' গল্পের সে এক জীবন্ত চরিত্র।

ওইটুকু দোকান আজও তার ঘর, পরিবার। আর সেই বই পড়ার নেশায় আজও সে সেই ভারতী কিশোর...।

চারপাশে পুজোর হইহল্লার মাঝে যেন এক টুকরো সাহিত্য সরোবরের মরুদ্যান। নির্বিকার। এক মনে বই পড়ে যায়। আর কত জানবে গো, জ্ঞান অর্জন? আনন্দলোকে শালপ্রাংশু প্রৌঢ় এক বিস্ময়কর জীবন্ত মূর্তি।

দোকানে কেউ এলে তিন-চারবার ডাকলে হয়ত তার মগ্নতা ভাঙে। আলু, পিঁয়াজ, মুড়ি পাল্লায় তোলে। না এলেই বা ক্ষতি কী!

তারপর আবার কিশোর সংখ্যা হোক বা ভারী নভেল টেনে নিয়ে যায় তাকে গল্পলোকে।। কল্পনার আলোকবর্ষ ছাড়িয়ে।।

হাঁদুর ভালো নাম জানা হল না আজও। মাসিমাও জানেন না।

ধুলোপড়া কাচের বয়ামের মতো আবছায়া থেকে ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া rare homo-sapience আজও আমার সেই বারুইপুর মদারহাট মাস্টার পাড়ার screen shot ১৯৭১

পুলিশের ডায়েরি (২)

কুইনপাড়ার হল

লাইট পোস্টে শুক্রবার করে পোস্টার লাগতো যে,

তার একটা পা ছোটো ছিল। খয়েরি ঢোলা জমা,মুখে বিড়ি, মেজাজে ধর্মেন্দ্র। ওর পেছন পেছন ছুটে অনেক অনুরোধ করে কখনো 'অমর আকবর অ্যান্টনি', কখনও 'মৌচাক'–এর পোস্টার ভাঁজ করে ছুড়ে দিতো পেছনে। গন্ধ সুখটান... নতুন সিনেমার...।

সহদেব মামা বুকিং কাউন্টারের সর্বেসর্বা। পুকুরে স্নান করতে করতে দেখতাম ধবধবে সাদা ধুতি–পাঞ্জাবি পরে মধ্যমায় ক্লাসিক বা ফিল্টার উইলস। ছোটো কাকিমা বা দাদা–বউদি মাটিনি শো তে যাবে। পুকুরে ঝাঁপ খেতে খেতে মামাকে বললাম, ৫টা লেডিস রেখো। সিগারেট ধরা হাত আকাশে একটা সিগন্যাল রেখে যেতো। পাড়ার ভেতর দিয়ে সিনেমায় যাওয়ার একটা পথ ছিল, শর্টকাট। আশপাশের মানুষ ওই পথ ধরত। শো শুরু বা শেষ, বারান্দায় ঝুঁকে তাদের আনাগোনায় মালুম হতো। নাইট শো তাদের উচ্ছ্বাসের কলকাকলিতে...।

ব্ল্যাকে টিকিট কাটা ছিল সেসময় এর একটা হিরোগিরি। রাজেশ খান্নার যুগ... উঠতি মস্তানদের দাপট...৭৫ পয়সার কাউন্টারে যত গ্রুপ ফাইটিং। শুনতাম বিকেলের খেলার শেষে বন্ধুদের থেকে ঘাটের আড্ডায়। আর সিনেমার গল্প, কেচ্ছার জল্পনা–কল্পনা...।

স্বাধীনতার দিবসে ফ্রিতে সিনেমা দেখাতো। কী ভিড়! স্বদেশী সিনেমা। পেচ্ছাপখানায় পান–জর্দা–সিগারেটের একটা ককটেল গন্ধ। হালফাইটাইম এ পেতাম...।

আর ছিলো সাউন্ড কুইনের গমগমে আওয়াজ, হল এর পাস দিয়ে গেলেই শোনা যেতো।

সিলিং পাখা তার মত ঘুরত, নীচের সিট পেলে ভাল না পেলেও ঘাম গড়ানো মায়ালোক। মাথার ওপর একটা পদ্ম ফুলের মতো আলো। আস্তে আস্তে নিভে যেতো, আবার জেগে উঠতো। সিনেমা শুরু আর শেষের মধ্যন্তরে।

লিফলেট আসতো নতুন ছবির। রং–বেরং। 'ধন্যি মিয়ে', 'অমানুষ', 'লোফার', 'দুনিয়া মেরি জেব মে','দ্য গ্রেট গাম্বলার' থেকে 'দাদার কীর্তি'।

কুইন এখনও দাঁড়িয়ে আছে— একা প্রৌঢ়া, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ। আমার আশৈশব ইউফোরিয়া ক্যালেন্ডার। প্রোমোটারের প্রতীক্ষায়...।

পুলিশের ডায়েরি -৩

নবনীতা দেবসেন

তখন এয়ারপোর্টে পোস্টিং। কোনও একজন ওঁকে নিয়ে ইমিগ্রেশনে এলেন। অপেক্ষার জন্য সোফায় এসে বসলেন। ফ্লাইট নেই, আসবে। ওঁর ছোটো কন্যা নন্দনার গৌতম ঘোষের কোনও সিনেমায় আবির্ভাবের কথা আনন্দবাজারে পড়েছি। সে দিনই নিতে এসেছেন।

আলাপ করলাম। গল্প হচ্ছে, ওঁদের পাড়ার দাদা জ্যোতিবাবু (আটপৌড়ে গল্প, হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি, ওঁর মা–বাবা, বাড়ির সামনের কী একটা বহুদিনের গাছ, ফুলচুরি ইত্যাদি প্রভৃতি) সুনীল,শক্তি,সন্দীপন, অমর্ত্য (অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি), শান্তিনিকেতন, সাহিত্য, কবিতা, সাবলীল সহজ করে বলছেন সব এক এক করে। আমার কন্যার নাম ডোরেমি শুনে হেসে বললেন, বাহ্! কে দিয়েছে?

যাইহোক, বললাম একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আমাদের মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ,চিৎকার, চেঁচামেচি হয়। কন্যা ছোটো, ওর সামনেই করে ফেলি। সামলাতে পারি না। কন্যার এফেক্ট পড়ে। কিন্তু রাগের মাথায় সামলাতে পারিনা দুজনেই। উপায় কী?

একটু সময় নিয়ে বলেছিলেন, ও কি শুধু তোমাদের ঝগড়া দেখে? ভালবাসা, আদর–টাদর দেখেনা!

বললাম হ্যাঁ, সেটাও দেখে। উত্তরে বললেন, তাহলে চিন্তা করো না। শিশুরা সব বোঝে, ও তোমাদের ওর মতই শিশু ভাবে। এই ঝগড়া, এই ভাব...।

আমার চোখে মাসাই মারা

জবা চৌধুরী

রবি ঠাকুরের 'আফ্রিকা' কবিতাটি যখন প্রথম পড়ি, আমি তখন ক্লাস টেন–এর ছাত্রী। আমার ছোটকাকুর তখন সবে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের উপহার হিসেবে কাকিমণিকে 'সঞ্চয়িতা' দিয়েছিল কেউ। তখন এমন উপহারের বেশ চল ছিল। সে যাই হোক, একদিন আমাকে ওই বইটি পড়তে দেখে কাকিমণি সেটা দিয়েই দিল। কবিতা পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগতো ছোটবেলা থেকেই। ভাবলাম, সবাই যদি কবিতার বই–ই ওদের বিয়েতে উপহার দিত, কী ভালই না হত !

যাক গে সে কথা। ইতিহাস আর ভূগোল— এই দুটো সাবজেক্ট আমার কোনওদিনই তেমন ভাল লাগতো না। কোনও মতে স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত ধরে রাখতে হল। তাই 'আফ্রিকা'–কে কবির মনের খেয়াল ভেবে নিছক একটি কবিতা মনে করেই পড়েছি। এই রূপক কবিতার পেছনে কতটা সত্য লুকিয়ে রয়েছে তা জানারও চেষ্টা করিনি।

এখন অবশ্য সে গল্প পাল্টে গেছে। আমাদের ছেলে তুতাইয়ের নানান পছন্দের জিনিস কী করে যেন ভাললাগা হয়ে আমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে নিজের অজান্তেই। আমি এখন বিভিন্ন দেশের ইতিহাস জানতে উৎসাহী। পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের পছন্দের নানা দেশ খুঁজে বের করি আর সেই সঙ্গে সবচেয়ে ভাল লাগে বিভিন্ন দেশের কালচার বা সংস্কৃতি জানতে।

গতবছর আফ্রিকা বেড়াতে যাবার প্ল্যানটা যখন সবেমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই থেকে ওখানকার জনজীবন জানার ইচ্ছেটা প্রখর হল আমার। তিনটি দেশে বেড়ানোর প্ল্যান হলো— কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া আর উগান্ডা। কেনিয়া আর তাঞ্জানিয়ার নাম লিস্টে আসতেই এক বিশেষ উৎসাহ মাথায় চেপে বসল। ওখানকার মাসাই সম্প্রদায়ের কথা জানার ইচ্ছে। তার কারণ, ইতিহাস বলে মাসাই সম্প্রদায়ের লোকেদের বাস তাঞ্জানিয়া এবং কেনিয়াতে। তবে তাঞ্জানিয়াতে মাসাইদের অনেক ছোট ছোট গ্রাম থাকলেও, কেনিয়ার মাসাই মারা জনবসতির দিক থেকে এবং তাদের সংস্কৃতির দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে।

একটি জনগোষ্ঠীর জন্মকথা কখনওই তারিখ দিয়ে বলা সম্ভব নয়। ইতিহাসের পাতা শুধু বলে দেয় এর সমসাময়িক কিছু তথ্য। সেই হিসেবে মাসাইদের প্রাথমিক নিবাস ছিল দক্ষিণ সুদানে। মাসাইদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল ওরা বরাবরই যাযাবর জীবন–যাপন করেছে, ওরা যোদ্ধা। কৃষিকাজ আর পশুপালনকেই ওরা জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে মনে করত এবং এখনও করে।

২০২১ –এ যখন আমরা প্রথমবার কেনিয়ায় যাই, নাইরোবি থেকে শুরু করে বিশেষ বিশেষ অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক এবং ন্যাশনাল রিজার্ভে বেড়াতে যাই। সেই সব ন্যাশনাল পার্কের বা রিজার্ভের ভেতরে, যেখানে পশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে সেই

সব জায়গায় কখনও তাঁবুতে, কখনো লজে থেকেছি আমরা। এই অভিজ্ঞতা আমার লেখা এই ক'টি শব্দের মতো সহজ নয়। এতে অনেকটা সাহস আর মানসিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। আর যারা ওখানে প্রতিনিয়ত ট্যুরিস্টদের সুরক্ষার কাজে থাকে ওরা আর কেউ নয়, আফ্রিকার ইতিহাসের বিখ্যাত মাসাই প্রজাতির কোনও না কোনও বংশধর। হাতে বর্শা জাতীয় অস্ত্র নিয়ে খোলা আকাশের নীচে পর্যটকদের প্রহরী হয়ে রাতের পর রাত জাগে ওরা।

মাসাইদের পরিচিতির অহঙ্কার তাদের নিজেদেরকে যোদ্ধা বলে প্রমাণ করা। সেটা কিন্তু মোটেই মানুষে মানুষে কিংবা অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ নয়। ওদের যুদ্ধটা জঙ্গলের রাজা সিংহের সঙ্গে। সিংহকে হারিয়ে নিজেকে বিজয়ী প্রমাণ করাটা মাসাই পুরুষদের কাছে বিশেষ গর্বের। সিংহকে হারিয়ে নিজেকে বিজয়ী প্রমাণ করতে পারা মাসাইরাই একমাত্র মাথায় পালকের মুকুট পরতে পারে।

জঙ্গলের সিংহের সাথে লড়াই করে বীরত্ব প্রমাণ করা ছাড়া মাসাইরা কখনও মানুষে মানুষে শত্রুতামূলক হত্যায় বিশ্বাসী নয়। তাদের জাতির মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন না থাকলেও, জরিমানার প্রচলন আছে। আর এই জরিমানা দিতে হয় গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে। সারা পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগ সিংহের বাস এই অঞ্চলে হলেও, সিংহের সঙ্গে মাসাইদের যুদ্ধের কারণে একটা সময় সিংহের সংখ্যা কমে আসে। তবে এখন অবশ্য বিভিন্ন সংস্থা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। ফলে সিংহদের মৃত্যুর হার কমেছে।

২০২১ সালে মাসাই মারা বেড়াতে যাওয়ার বহু আগে থেকেই নানারকম প্ল্যান মাথায় ঘুরছিল। ওদের পোশাক পরার, ওদের মতো গয়না পরার, ওদের মতো করে চুল বাঁধার...। কিন্তু যেমনটা ভেবেছিলাম তার সবটা করা হয়ে ওঠেনি। আমাদের প্রতিটি দিন নানা ছকে বাঁধা ছিল। কাজেই সময়ের কথা ভেবে এবং যতটা বেশি দেখা সম্ভব সে কথা মনে রেখে গাইডের প্ল্যানেই চলতে হয়েছে।

মাসাইদের গ্রাম দেখতে যাওয়ার জন্য আগে থেকেই আমার স্বামী স্বপন ট্যুরিজম থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। তাই মাসাই মারা ন্যাশনাল রিজার্ভে আমাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিল ওদের গ্রাম প্রধানের-সহ আরও কয়েকজন মাসাই। গ্রাম প্রধান প্রথমেই আমাদেরকে তাদের গ্রামের ইতিহাস আর বর্তমানের সামাজিক অবস্থার কথা জানালেন। তারপর গ্রামের মাসাইরা আমাদের সামনে ওদের কয়েকটা নাচ পরিবেশন করল। বিশেষ ওই নাচের নাম 'আডুমু'। নাচের সাথে সাথে ওরা নিজেরাই গান করেছিল ওদের 'মা' ভাষায়। 'মা' হলো মাসাইদের নিজস্ব ভাষার নাম।

প্রাথমিক পর্ব শেষ হতেই ওরা আমাদের গ্রামের ভেতর নিয়ে গেল। আমার উৎসাহ আছে জেনে কয়েকজন মাসাই মহিলা আমাকে ওদের পোশাক আর গয়না পরিয়ে সাজিয়ে দিল। ওদের গানের সাথে আমিও একটু নাচার চেষ্টা করলাম। ওদের মতো করে না পারলেও ওই গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর সাথে কেমন যেন একটা একাত্মতা অনুভব করলাম।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম ওদের ঘরবাড়ি। ছোট ছোট আয়তাকার অনেকগুলো ঘর মিলে একটা গোলাকৃতি উঠোন প্রস্তুত করে ওরা। ওই উঠোনেই চলে বাচ্চাদের খেলাধুলো, মায়েদের আড্ডা। বাইরের জগতের সাথে ওদের যোগাযোগ নেই বললেই হয়। ওরা এখনও পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে পারার মধ্যে নিজেদেরই সাফল্য দেখে। বিজ্ঞান কী, তা ওরা জানে না।

স্বপন আর আমাদের মেয়ের উৎসাহে মাসাইরা ওদের ঘরের ভেতরও আমাদের দেখতে দিলো। খুব নীচু আর খড় দিয়ে ছাওয়া ঘরগুলো। যেখানে মাথা উঁচু করে চার-পা হাঁটাও সম্ভব নয়, ওখানে ওরা পরিবার নিয়ে থাকে! ঘরে ছোট্ট একখানা দরজা ছাড়া আর কিছুই নেই। না আছে বিদ্যুৎ। দেখে নিজের মনেই যেন হারিয়ে গেলাম। কী করে এমনভাবেও মানুষ খুশি থাকতে পারে! ভাবলাম নিজের মনেই। হয়ত বাইরের জগৎ না জানাটাই ওদের জন্য আশীর্বাদ হয়েছে। যা আমরা জানি না, তা না পাওয়ার কোনও দুঃখ থাকে না। মনে পড়ল 'কালচারাল রিলেটিভিজম' শব্দটা। নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার 0করা বা ভালোমন্দ বিচার করা ছেড়ে দিলে, না

পাওয়ার হতাশা আর দুঃখ আমাদের জীবনের খুশির পথে আসতেই পারে না।

এক অনাবিল ভাললাগা সাথে নিয়ে সেদিন যখন আমরা মাসাই মারার মাসাইদের গ্রাম ছেড়ে হোটেলে ফিরে এলাম, মনে হল এক নতুন অভিজ্ঞতা আমাকে জীবনের আরও একটা দিক চিনিয়ে দিল। জানলাম, প্রাচুর্য থাকলেই জীবনে খুশি আর সুখী হওয়া যায় না। চাই আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেকে খুশি রাখা আর নিজের খুশির জন্য অন্যকে জবাব না দেওয়া।

২০২২-এর আগস্টে আবারও আমরা দ্বিতীয়বার আফ্রিকায় গিয়ে কয়েকদিন কাটালাম প্রিয় মাসাই মারাতে। তবে এবার শুধুই গেম ড্রাইভ করলাম সকাল-সন্ধে। যখন দিনের শেষে হোটেলে ফিরতাম, রোজ একজন মহিলা ঘর পরিস্কারের জন্য আসতো। আমাদের পরিবারের তাঁবুর জন্য সব কাজ ছিল ওর দায়িত্বে। ওর প্রতি সন্ধের কাজ শেষ হত আমাদের চারজনের বিছানায় হট ওয়াটার ব্যাগ কমফোর্টারের নিচে রেখে যাওয়া। ওর নাম প্যাট্রিসিয়া। নিজের নামের সাথে মিল খুঁজে পেয়ে, আমাদের মেয়ের নাম তৃষা জেনে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। পরদিন আমরা মাসাই মারা ছেড়ে নাইরোবির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বো। প্যাট্রিসিয়ার কাজ শেষ হতেই ওকে ডেকে টিপস দিলাম। টুকরো টুকরো ইংরাজিতে জানতে চাইলো আমাদের কথা। বললো ও সাতটি সন্তানের মা। আমি দুটো সন্তানের মা জেনে সে করুণ চোখে তাকালো আমার দিকে।

মাসাইরা বিশ্বাস করে যার যত বেশি সন্তান, সেই পরিবার তত বেশি গৃহপালিত পশুর মালিকানা নিতে পারে। আর সে তত বেশি ধনী। জানি, আমি যে চোখে জীবনকে দেখি, প্যাট্রিসিয়াকে তা কখনওই বোঝানো যাবে না। তাই শুধু চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থেকে অনুভব করার চেষ্টা করলাম ওর বিশ্বাসের জীবনকে।

বিশাল মেরু প্রদেশে প্রথম বাঙ্গালী

স্বর্ণাভা কাঁড়ার

শরৎকুমার রায়। বাঙ্গালীর জীবনেতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া এক নাম। কয়েক দশক আগে কখন কিভাবে হারিয়ে যান শরৎকুমার আজ তা মনে থাকার কথা নয়। অথচ কৃতবিদ্য ওই মানুষটি বেঁচেও ছিলেন বছর ষাটেক আগে। তবে এদেশে নয়, বিদেশে। দেশ ছেড়ে বিদেশি গিয়ে ধাপে ধাপে উঠেও ছিলেন বেশ উঁচুতে, নিজের ইপ্সিত এক পদে।

শরৎকুমারের উত্তরণের সে কাহিনির যৎকিঞ্চিৎ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদেশের পত্র-পত্রিকাতেও। পুরনো ওই পত্র-পত্রিকায় তাঁর সে পরিচিতি অবশ্যই এক পথিকৃতের। বিজ্ঞানী শরৎকুমার রায়ই প্রথম বাঙ্গালী যিনি গিয়েছিলেন মেরু প্রদেশে। একা নয়, এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তদেশে পদচারণার অভিজ্ঞতা বাঙ্গালীর মধ্যে শরৎকুমারেরই প্রথম। তবুও তাঁর উত্তরপুরুষ মনে রাখেনি ওই পথিকৃতকে।

প্রায় একশতাব্দী আগের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে বিজ্ঞানী শরৎকুমারের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর মেরু প্রদেশের যাত্রার কথা পরিবেশন করতে গিয়ে 'মডার্ন রিভিয়ু' ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখেছিল — "An Indian Going with An Arctic Expedition

Mr. Sarat Kumar Roy, assistant 'Curator of Invertebrate Paleontology of the Field Museum of Natural History of Chicago, and formerly a member of the scientific staff of the New York State Museum in Albany, has been selected as one of the members of the Rawson-MacMillan Arctic expedition of the Field Museum."

তারপর একই সুরে শরৎকুমারের কথা জানাতে গিয়ে 'প্রবাসী'ও (আশ্বিন ১৩৩৪) লিখেছিল — "বাঙ্গালীর ছেলে সুমেরু প্রদেশের শীত সহ্য করিয়া তথায় নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে, এবং তাহার জন্য বিদেশীদের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারে, ইহা সুখের বিষয়। ইহাতে বাঙ্গালী যুবকদের উৎসাহ বাড়িবে।"

সেই থেকে শুরু হয়েছিল শরৎকুমারের অন্বেষণ। অতএব তন্নতন্ন করে দেখা শুরু হয় নানা কোষগ্রন্থ আর জীবনী-অভিধান। কিন্তু কোথাও নেই সেই অজ্ঞাত বিজ্ঞানীর নামোল্লেখ।

ব্যর্থতা আর অসাফল্যের সূচীভেদ্য অন্ধকারে ন্যুব্জ হয়ে খুঁজে চলা হচ্ছে যখন নানা দেশী বই আর পত্র-পত্রিকা তখন বিপুলায়তন এক বিদেশী জীবনী-অভীধান আমাদের সামনে আকস্মিকভাবে এনে দাঁড় করিয়ে দিল হারিয়ে যাওয়া শরৎকুমার রায়-কে।

বিজ্ঞানী শরৎকুমারের কাহিনি আমাদের দেশের কোনো গ্রন্থে তেমনভাবে পাওয়া না গেলেও বিদেশীরা কিন্তু যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করে

রেখেছেন ওই অভিধানে।

নদীয়ার তেহট্ট থানার শ্যামনগরে শরৎকুমারের জন্ম। দিনটি ছিল ১৮৯৭ সালের ২৭ আগস্ট। বাবা নবীনকৃষ্ণ পি ডব্লিউ ডি-র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মায়ের নাম গোবিন্দমোহিনী দেবী। হাজারিবাগের সেন্ট কলাম্বাস কলেজের ছাত্র শরৎকুমার। পরে কলকাতায় এসে ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। বঙ্গবাসী থেকে আই এসসি উত্তীর্ণ হয়ে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বি.এ তাঁর পড়া হয়নি। কারণ, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে যাবার। একদিন চলেও যান ইংল্যান্ডে। সঙ্গে ছিলেন রাজা বসু। স্বনামধন্য ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর পুত্র। সম্ভবত রাজাকে বিলেতে যেতে দেখে শরৎকুমারও উৎসাহী হন এবং রাজার সঙ্গে একই জাহাজে বিলেত যান তিনি।

লন্ডনে বাবার পাঠানো একশো পঁচিশ টাকা ছিল শরৎকুমারের সম্বল। কিন্তু সে টাকায় খরচ চলে না। তাই শরৎকুমার ঠিক করলেন আমেরিকায় চলে যাবেন। কারণ, পড়াশোনার সঙ্গে অবসর সময়ে চাকরি করে টাকা রোজগার করা যায় আমেরিকায়। অতএব রাজাকে ছেড়ে শরৎকুমার চলে যান আমারিয়াক। সময়টা ছিল ১৯২০ সাল।

অতঃপর আমেরিকায় শুরু হলো তাঁর জীবন সংগ্রাম। সত্যিই অবসর সময়ে, এমনকি রাতেও ওয়াচম্যানের চাকরি করে রোজগার আরম্ভ করেন শরৎকুমার। অবসর সময়ে চাকরি আর দুপুরে কলেজ করে ইলিনর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন তিনি (১৯২২)। দু'বছর পরে ইলিনয় থেকেই বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রিও পান। এরপর শুরু হয় কর্মজীবন। প্রথমে নিউ ইওর্ক স্টেটের অ্যালবানিতে 'নিউ ইওর্ক স্টেট মিউজিয়াম'-এ সহকারী জীবাশ্মবিদের চাকরি নেন ১৯২৪ সালে। বছর খানেক পরে চলে যান শিকাগোর ' ফিল্ড মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে। সেখানে জীবাশ্ববিদ্ অর্থাৎ প্যালিয়ন্টলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটার পদে যোগ দেন (১৯২৫)। নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান জীববিদ্যা ছাড়াও আর কয়েকটি বিভাগ নিয়ে গঠিত শিকাগোর এ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বিপুল গবেষণা সামগ্রী। সেই কারণে, বিস্ময়কর এই সংগ্রহশালায় আছে গবেষণা ও প্রকাশনার বিরাট ব্যবস্থাও। প্রায় নয় বছর শিকাগোর মিউজিয়ামে প্যালিয়ন্টলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটার ছিলেন শরৎকুমার। তারপর তিন বছর (১৯৩৪-৩৭) জিওলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটার রূপে চাকরি করে ভূতত্ত্ববিভাগের 'কিউরেটার' পদে উন্নীত হন। এই পদে ছিলেন ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ভূতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি-ও হন ১৯৪১ সালে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁকে বিমান বাহিনীতে যোগ দিতে হয়েছিল। কারণ, তখন তিনি আমেরিকার নাগরিক। যুদ্ধ থেমে যাবার পর শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়ামে ভূতত্ত্ব বিভাগের 'অ্যাকটিং চিফ কিউরেটার'-এর দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। প্রায় এক বছর পর স্থায়ীভাবে ভূতত্ত্ব বিভাগের 'চিফ কিউরেটার' নিযুক্ত হন ১৯৪৭ সালে। অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ওই পদেই ছিলেন তিনি।

ফিল্ড মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির প্যালিয়ন্টলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটার থাকার সময়েই সুমেরু অভিযানে অংশ নেন শরৎকুমার। শিকাগোর ওই মিউজিয়ামের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রয়োজনে আয়োজিত অভিযানটি 'রসন-ম্যাকমিলান আর্কটিক একসপিডিশান' নামে পরিচিত ছিল। গবেষণামূলক প্রয়োজনে দুবার 'রসন-ম্যাকমিলান আর্কটিক একসপিডিশান'-এর আয়োজন করে শিকাগোর ফিল্ড মিউজায়াম। ১৯২৬ সালে রসন-ম্যাকমিলান অভিযানের প্রথম আয়োজন। ওই প্রথম অভিযানের সদস্যেরা সুমেরুবৃত্ত পার হয়ে গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের ডিস্কো দ্বীপ পর্যন্ত যান। ফেরার পথে ব্যাফিন দ্বীপেও তাঁরা অনুসন্ধান চালান। এগারো সপ্তাহের সেই প্রথম অভিযানের যাত্রা শুরু হয়েছিল আমেরিকার মেইন স্টেটের উইসক্যাসেট বন্দর থেকে। 'বাওডোইন' ফিরে আসে আবার উইসক্যাসেটে। রসন এবং ম্যাকমিলান নামের যে দুজনের নাম যুক্ত হয়েছিল ওই অভিযানের সঙ্গে তাঁদের প্রথম জন শিকাগোর ব্যাঙ্ক মালিক ফ্রেডরিক এইচ রসন। সুমেরু প্রদেশে অভিযানের ব্যায়

বহন করেন বলেই অভিযানটির সঙ্গে যুক্ত হয় রসনের নাম। ফিল্ড মিউজিয়ামের তদানীন্তন সভাপতি স্ট্যানলি ফিল্ডের অনুরোধে রসন ওই অভিয়ানের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন।

অভিযানের নামের সঙ্গে জড়িত অপর ব্যক্তি ম্যাকমিলানের পূর্ণ নাম ডোনাল্ড ব্যাকস্টার ম্যাকমিলান (১৮৭৪-১৯৭০)। প্রথিতযশা অভিযাত্রী ম্যাকমিলানের জাহাজ 'বাওডোইন'-এই ফিল্ড মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা যান গ্রিনল্যান্ড। ম্যাকমিলানের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় ওই অভিযান। একারণে, ফিল্ড মিউজিয়াম প্রেরিত অভিযানটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'রসন-ম্যাকমিলান আর্কটিক একসপিডিশান' (১৯২৬)।

নীল ম্যাকমিলান উনিশ শতকে উত্তর মেরু অভিযানে গিয়ে হারিয়ে যান সুমেরুর সমুদ্রে। মেরু সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সময় নীল রেখে যান ছয় বছরের এক পুত্রকে। এই পুত্রই ডোনাল্ড বাকস্টার। পিতার আবিষ্কার আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা পেয়ে বসেছিল তাঁকে। ফলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাঁর মেরু অভিযান।

ক্যাপ্টেন রবার্ট পিয়ারির নেতৃত্বে আয়োজিত সুমেরু আবিষ্কারের ঐতিহাসিক অভিযানের স্বেচ্ছাসঙ্গীও হয়েছিলেন ম্যাকমিলান (১৯০৯)। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বছরে ত্রিশবার মেরু অভিযানে যান ডোনাল্ড। ১৯৫৪ সালে যখন ত্রিশতম মেরু অভিযানে যান তিনি তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ঊনআশি। মেরু অঞ্চলে অভিযানের জন্যে ম্যাকমিলান সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজস্ব জাহাজ 'বাওডোইন'। এটি একটি মাস্তুলওয়ালা জাহাজ ছিল। তা সত্ত্বেও পনেরো টন ওজনের এই জাহাজে লাগানো হয়েছিল ইঞ্জিন। চার সিলিন্ডারের ষাট হর্সপাওয়ার সম্পন্ন ওই ইঞ্জিনের সাহায্যে জাহাজটি ঘন্টায় সোয়া আট 'নট' চলতে পারতো। এই গতিবেগের জন্য পাঁচ গ্যালন তেলের প্রয়োজন হতো প্রতি ঘন্টায়। ম্যাকমিলানের এক বন্ধু নিজের খরচে জাহাজে বসিয়ে দিয়েছিলেন বেতারযন্ত্র। বহুবার মেরু অভিযানে গিয়ে ম্যাকমিলানের মত তাঁর 'বাওডোইন'ও হয়ে উঠেছিল বিখ্যাত। ওই জাহাজেই গ্রিনল্যান্ডের উত্তরে 'এটা' তে গিয়েছিলেন তিনি। কাঠের জাহাজ 'বাওডোইন' বহুবার প্রমাণ করেছে তার ক্ষমতা। ফক্স চ্যানেলের জমে যাওয়া বরফ সমুদ্রে অক্ষত অবস্থায় প্রবেশ করে 'বাওডোইন' তার অপরিহার্যতা প্রমাণও করেছিল। একবার সুমেরুতে গিয়ে জমে যাওয়া বরফের সমুদ্রে তিনশো ছয় দিন আটকে থেকেও অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে আবার অভিযানে গিয়েছিল জাহাজটি।

১৯২৬ সালের অভিযান সফল হবার পর দ্বিতীয় বার তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৭ সালে রসন-ম্যাকমিলান মেরু অভিযানের আয়োজন হয়। এই দ্বিতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন বঙ্গসন্তান শরৎকুমার রায়। রসন-ম্যাকমিলানের নামাঙ্কিত দ্বিতীয় এই অভিযানের উদ্যোক্তাও ছিল শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়াম। তবে এবারে কম্যান্ডার ম্যাকমিলানের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁরই আগ্রহে ব্যাঙ্কার রসন পুনরায় অর্থসাহায্যে রাজি হওয়ায় ফিল্ড মিউজিয়াম কাজটিতে এগিয়ে আসে।

এই বার 'বাওডোইন'- এর সঙ্গে মেরু প্রদেশে যায় আরও একটি মাস্তুতওয়ালা অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ 'রেডিও' এবং মোটর চালিত ছোট বোট 'সিকো'।

১৯২৭ সালের ২৫ জুন অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী আমেরিকার মেইন স্টেটের উইসক্যাসেট বন্দর থেকে যাত্রা শুরু 'বাওডোইন', 'রেডিও' এবং 'সিকো'র। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ওই অভিযানের লক্ষ্য ছিল এস্কিমো ও যাযাবর 'ন্যাসকেপি' মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গবেষণা এবং তাঁদের পোশাক-আসাক, অস্ত্রশস্ত্র, পরিবহণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহ। এছাড়া মেরু অঞ্চলের মনুষ্যতর প্রাণী, মাছ, পাখি, উদ্ভিদ ও জীবাশ্মের নিদর্শন সংগ্রহও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নির্বাচন করে নেওয়া হয়িছিল দলে।

যাযাবর 'ন্যাসকেপি'রা আদিম মানুষ। কুইবেক এবং ল্যাব্রাডোর অঞ্চলে এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। 'অ্যালগোনকিয়ান' ইন্ডিয়ানদের অনুরূপ ভাষাভাষীর এই মানুষেরা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল।

মুখ্যত, ক্যারিবু হরিণ শিকার করে জীবনধারণ করতো 'ন্যাসকেপি'রা। ট্রাউট মাছ, বুনো হাঁস, খরগোশ ও সীলের মাংস ছিল তাঁদের প্রিয় খাদ্য। স্লেজ ও কুকুর ছিল এদের সঙ্গী। বংশপরম্পরায় এস্কিমোদের সঙ্গে এদের বৈরিতা ছিল। ইন্ডিয়ান শব্দ 'ন্যাসকেপি'র অর্থ অসভ্য রূঢ় মানুষ। যে সময় রসন-ম্যাকমিলান অভিযানের আয়োজন হয়েছিল, সেই সময় সভ্য জগৎ ওদের সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানত।

এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন মোট পনেরো জন। এঁদের মধ্যে আট জন নাবিক-কর্মী। বাকি সাতজন বিজ্ঞানী। জাহাজের ক্যাপ্তেন স্বয় ম্যাকমিলান। তাঁর সঙ্গী নাবিক কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মেট ও সেকেণ্ড মেট র‍্যালফ রবিনসন এবং কেনেথ রসন। জন জেনিস এবং ক্লিফোর্ড হিমো। এঁনারা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ও বেতারযন্ত্র চালক। জাহাজের পাচক এবং কেবিন বয় মার্টিন ভর্স ও হেনরি ওয়ারেন। অষ্টম মানুষটি জোসেফ ফিল্ড — দুর্ধর্ষ এক নাবিক।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মৎস্যতত্ত্ব (ইকথিওলজি), নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং উদ্ভিদতত্ত্ব বিশারদ পাঁচজন বিজ্ঞানী ছিলেন। যথাক্রমে এঁরা অ্যালফ্রেড উইড, ডাঃ উইনিয়াম ডানকান স্ট্রং, শরৎকুমার রায়, আর্থার রুকার্ট এবং চার্লস সিওয়ান। এছাড়াও শল্যচিকিৎসক ডাঃ আর্ল ল্যাঙ্গফোর্ড ও চর্মসংরক্ষণ বিশারদ (ট্যাক্সিডারমিস্ট) নোভিও বারট্র্যাণ্ড দলের সদস্য হিসেবে গিয়েছিলেন ওই অভিযানে।

১৮ জুলাই উইসক্যাসেট থেকে যাত্রা শুরু করে নোভাস্কোশিয়ার সিডনি বন্ধর ছুঁয়ে ল্যাব্রাডোর-এর হোপডেল্-এ পৌঁছন অভিযাত্রীরা। অতঃপর আসন্ন শীতকাল উপলক্ষে ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হোপডেল-এর উত্তরে নেইন-এ ওঁরা অবতরণ করে ২২ জুলাই।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ল্যাব্রাডোর-এর আরও উত্তরে যাত্রা 'বাওডাইন'-এর। নেইন-এর উত্তরে ওকাক এবং হেবরন অতিক্রম করে ব্যাফিন দ্বীপের ফ্রোবিশার উপসাগরীয় অঞ্চলে তিন সপ্তাহ ধরে ভূতত্ত্ব ও পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর অনুসন্ধান চালান। ওই অঞ্চলে কিছু পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর অনুসন্ধান চালান। ওই অঞ্চলে কিছু পুরাতাত্ত্বিক বস্তুও সংগৃহীত হয়।

এরপর ব্যাফিন দ্বীপের আরও উত্তরে কাম্বারল্যাণ্ড সাউন্ড-এ (প্রণালী) প্রবেশ 'বাওডোইন'-এর। উল্লেখ্য, কাম্বারল্যাণ্ড প্রাণালীর উত্তরাংশ ছুঁয়ে রয়েছে সুমেরু বৃত্ত। সুমেরু বৃত্ত থেকেই শুরু উত্তর মেরু অঞ্চলের। ব্যাফিন দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল সুমেরু বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রোবিশার উপসাগরে উপস্থিতির সুযোগে কম্যান্ডার ম্যাকমিলান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও গিয়েছিলেন জাহাজ নিয়ে। এ কারণে ওই তিন সপ্তাহের মধ্যে এক বা দুদিন করে তাঁর অবস্থান ওই অঞ্চলে। তবে কাম্বারল্যান্ড প্রণালীতে ওঁদের অনুসন্ধানের বিবরণ দুষ্প্রাপ্য।

মেরু প্রদেশে প্রায় পনেরো মাস অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ১৯২৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর 'বাওডোইন' আবার ফিরে আসে উইসক্যাসেটে। অভিযানে গিয়ে শরৎকুমারও সংগ্রহ করেন নানা জীবাশ্ম। তাঁর সংগৃহীত ওই জীবাশ্ম মুখ্যত অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর (ইনভার্টিব্রেট ফসিল)। আমেরিকায় ফিরে নিজের আবিষ্কৃত ওই ফসিলগুলি অবলম্বনে দুটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি এদেশে দুর্লভ।

সুমেরু অঞ্চল থেকে ফিরে আসার পর আরও একটি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন শরৎকুমার। 'ক্যাপ্টেন মার্শাল ফিল্ড জিওলজি অ্যান্ড প্যালিয়ন্টলজিক্যাল একসপিডিশান' এর নেতা হয়ে তিনি ১৯২৮ সালে গিয়েছিলেন নিউফাউন্ডল্যান্ডে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ভারতেও এসেছিলেন শরৎকুমার। আমেরিকার ান বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়ে ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কাজ করে তাঁর ভারতে আগমণ। পদমর্যাদায় তখন তিনি মেজর। দেশ ছেড়ে চলে যাবার প্রায় পঁচিশ বছর পর ভারতে এসে পাঞ্জাবের 'সল্ট রেঞ্জ'-এ সমীক্ষা করেন ১৯৪৫ সালে। সমীক্ষা শেষে কিছুদিন ছিলেন ব্যারাকপুর আর কাঁচরাপাড়ার সামরিক ছাউনিতে। শরৎকুমারের মা তখন বেঁচে। মার সঙ্গে দেখা করতে শরৎকুমার এসেছিলেন, কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে।

বিজ্ঞানী শরৎকুমারের আর একটি পরিচয়ও আছে। সমকালীন যুগের আমেরিকার অন্যতম আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ তিনি। জীবাশ্ম, সুমেরু অঞ্চলের ভূস্তর, ভূপতিত উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কেও ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসা। এ কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশেও গিয়েছিলেন তিনি। শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়ামের বিজ্ঞানী হিসেবে পঞ্চাশের দশকে আগ্নেয়গিরি আকীর্ণ দেশ মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, এল স্যালভেডোর, নিকারাগুয়া এবং কোস্টারিকায় যান শরৎকুমার।

প্রসঙ্গত, সুপ্ত হয়, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেন। এ কারণে উল্লিখিত দেশগুলিকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। দুই আমিরাকার মধ্যবর্তী দেশগুলিতেই আছে প্রায় কুড়িটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। 'সারকাম-প্যাসিফিক গ্রিডল অব ফায়ার'-এর অন্তর্গত ওই অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে মাঝেমধ্যে অগ্নুৎপাত হতো। গবেষণার সময় আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত বা নির্গত লাভা, পাথর, ছাই ও বিবিধ খনিজ পদার্থ তিনি সংগ্রহ করেন শিকাগোর মিউজিয়ামের জন্যে। মধ্য আমেরাকার জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখতে গিয়ে তাঁর দুটি পা দু'বার পুড়েও যায়। আগ্নেয়গিরির আগুনে তাঁর শারীরিক ওই ক্ষতি প্রসঙ্গে ফিল্ড মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির বুলেটিনে লেখা হয়েছিল (অক্টোবর ১৯৫৭) :

"Dr Roy has twice suffered badly burned feet in accidents while investigating the hot craters of active volcanoes."

'ভলক্যানোলজিস্ট' শরৎকুমারের আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণাপত্রও আছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিদ্বৎসভার সম্মাননাও পেয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানী হিসেবে যুক্ত হয়ে আছে তাঁর নাম নানা সংস্থার সঙ্গে। ইংল্যান্ডের রয়্যাল জিওলজিক্যাল ও রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং জিওলজিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকার তিনি 'ফেলো' নির্বাচিত হন। এছাড়া, আর্কটিক ইনস্টিটিউট অব নর্থ আমেরিকা এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এবং সোসাইটি ফর রিসার্চ ইন মেটিওরাইটিস-এরও তিনি সদস্য ছিলেন। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

শিকাগোতেই শরৎকুমারের পরলোকগমন। ১৯৬২ সালের ১৭ এপ্রিল প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বিলিংস হাসপাতালে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। সে সময়ে কাছে ছিলেন দ্বিতীয় সহধর্মিণী এলসা। শিকাগোর ক্রিমেটোরিয়ামে শরৎকুমারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

আমেরিকায় কর্মজীবন শুরুর পর শরৎকুমার বিবাহ করেন শ্রীমতী পেজিকে। পেজির সঙ্গে অবশ্য শরৎকুমারের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হয়নি। তবুও তাঁর কথা স্মরণযোগ্য। কারণ, নববিবাহিত পেজির উৎসাহেই শরৎকুমার রসন-ম্যাকমিলান অভিযানে অংশ নেন। কলকাতায় শরৎকুমারের আত্মীয় পরিজনকে চিঠি লিখে মেরু প্রদেশ অভিযানের খবরা-খবর শিকাগো থেকে নিয়মিত লিখে পাঠাতেন পেজি। দ্বিতীয়বার এলসা ব্যারানডান নামে এক বিদুষীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শরৎকুমার। জীবনের দীর্ঘতম সময় এলসাই ছিলেন শরৎকুমারের জীবনসঙ্গিনী। শরৎকুমারের পরলোকগমনের খবর পরিবেশন প্রসঙ্গে 'শিকাগো ডিইলি নিউজ' তাঁর সুমেরু সফ+রের ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকানদের। 'বাওডাইন'-এর অন্যতম বিজ্ঞানী শরৎকুমারের উদ্দেশ্যে ওঁরা লিখেছিলেন:

"He was the first Hindu to visit the Arctic when he accompanied the Rawson-MacMillan expedition to Labradar and Baffin land (now Baffin island) in 1927-28."

শরৎকুমারের মৃত্যুর পর এলসা এসেছিলেন কলকাতায়। সঙ্গে ছিল শরৎকুমারের দেহাবশেষ।

বাঙ্গালীর জীবনেতিহাস থেকে এইভাবেই বিলীন হয়ে যায় শরৎকুমারের নাম।

আমার মনের ডায়েরি

জয়ন্ত ঘোষাল

কুসুম, তোর শুধুই শরীর?

মন নেই?

এ প্রশ্ন পুরুষ করেছিল নারীকে। নারী সেই একই প্রশ্ন তো করতেই পারে পুরুষকে।

আমার তো শরীর ও মন দুই-ই আছে। আমার শরীরের ২০৬টি হাড়। মেদ-মজ্জা। স্নায়ু থেকে হৃৎপিণ্ড। যকৃৎ-ফুসফুস-জিহ্বা–নাসিকা এদের সকলের সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়। এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এত কোষ, কলা-তন্ত্র, খণ্ড খণ্ড শরীর তবু অখণ্ড।

মন?

আমার মন আছে। কিন্তু এই মন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মন বাবাজির লেগেছে বিষম লড়াই। একটি মন আধিপত্যকামিতা চায়। অন্য মনটি সেই আধিপত্য, স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্বর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। বিদ্রোহী মনে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। উপজাতি বিদ্রোহ থেকে নকশাল আন্দোলন।

একটা মন ভোগ চায়, একটা মন সুখ চায়, একটা মন প্রচার চায়, হাততালি চায়। যশ–পুরস্কার চায়। ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে নার্সিসাস হতে চায়। অন্য মনটা বলছে, কী হবে এই সম্ভোগে। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। আর কত বড় হব আমি মেহের আলি?

ভেঙে যাওয়া সে খণ্ড মন চুপি চুপি ডায়েরি লেখে। সে বলে যা লিখি সবই কি প্রকাশের জন্য? হয়ে ওঠাই সত্য কিন্তু সে হয়ে ওঠার যাত্রা হোক এক অন্তর্গত যাত্রা। সে যাত্রা বহিরঙ্গের নয়। রক্তের মধ্যে বোধ কাজ করে সংগোপনে চিৎকার করে তো নয়।

সে মন বাবাজি ডায়েরিতে লেখে,

হে সাংবাদিক, কত পাতার পর পাতা, কত নিউজ প্রিন্টে তুমি লিখেছ বাবাজীবন। ঠিক কত টন লিখলে তুমি এভারেস্টের মত উঁচু হবে? গিনেস বুক অফ রেকর্ডস্ এ তোমার নাম যাবে? অথবা ম্যাগসাইসাই।

এ হল প্রভু মন আর দাস মনের লড়াই। শাসক মন বলে, এ গণতন্ত্র হল চিৎকারের গণতন্ত্র। এ চিৎকৃত সমাজে সামাজিক ডারউইনবাদকে তো মানতেই হবে। শক্তি সামন্তের অমানুষ টাকা যোগায় দাঁড়াও পথিকবরকে। টিনের তরোয়ালকে ধারালো বানাতে চাই টাকা।

মিথ্যাচার কোর না মন।

অমর্ত্য সেন—গায়ত্রী স্পিভাকেরও প্রচার চাই। বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমের প্রচার শুধু আদানির জন্য নয়, অমর্ত্য সেন থেকে নকশাল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য সকলের মনই তো এ অভিজাত সমাজেই চোঙা ফুকে আপামর গরিব মানুষের সেবা।

অতএব টাকার টঙ্কারে শুনি মায়া এ পৃথিবী। মন ভেঙে দু'টুকরো। বিদ্রোহী মন বলে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। প্রাইভেট মাকস্টার্স সাউথ সিটিতে বহুতল অট্টালিকায় বসে গবাক্ষ দিয়ে বস্তিতে বৃষ্টির ধারাপাত দেখে।

কোন মনটা সত্য? আকালের সন্ধানে ছবির স্মিতা

পাটিল বনাম শ্রীলা মজুমদার। আসল বনাম নকল।

সীতা বন্দি অশোক কাননে। সীতার জন্য রামচন্দ্র ক্রন্দনরত। সাক্ষী লক্ষণ। সীতার সঙ্গ চাইছেন তিনি। কাতর তিনি। সেও এক মানুষের কামনা। সে সময় লক্ষ্মণ দাদাকে বোঝালেন, এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। এমন প্রত্যাহারের মনকে পাত্তা দিলে চলবে না। কালও দেখেছি তোমার মধ্যে ছিল প্রয়াসের শক্তি। উদ্যোগ–আশা–প্রত্যাশা। সীতাকে অশোক কানন থেকে মুক্ত করতেই হবে। আজ কেন এই মনোভাব। সমগ্র রামায়ণে সম্ভবত লক্ষণ এই একবারই এমন বিচক্ষণতার নজির রেখেছেন। যেখানে তিনি নিজেই দাদাকে বুদ্ধি যোগাচ্ছেন।

এই প্রয়াস এই উদ্দমই হল জীবনীশক্তি। মন বলছে পারবে পারবে, ইউ ক্যান। ইউ উইন। অন্য মন বলছে, ওসব লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট আর সেল্ফ হেল্পের বই। জীবনটা তুমি কীভাবে চালাবে, সেটা কি ডেল কার্নেগি–শিব খেরা রা ঠিক করে দেবেন? দ্য আমেজিং রেজাল্ট অফ পজিটিভ থিংকিং? ক্যানসার হাসপাতালে সবার জামার বুকে ক্রুশচিহ্নের ডিজাইনে গোলাপি রিবন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে, হাসো তুমি হাসো। ক্যান্সার হয়েছে। তবু তুমি হাসো।

ক্যানসার নো আনসার। কিন্তু সে কথা ভাবলে চলবে না। সে হবে বিষাদ–যোগ। তোমার চাই কোয়ালিটি অফ লাইফ। তাই তুমি হাসবে। লাফটার ইস দ্য বেস্ট মেডিসিন। বিদ্রোহী মনের ডায়েরিতে লেখা হচ্ছে, সেল্ফ হেল্পের বই পড়ে জীবনের গুণগত উৎকর্ষ হয় না। প্রয়োজন আত্মবোধ। তার জন্য প্রয়োজন নিজের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার। না পান্না, না চুনি, এ এক অন্তর্যাত্রা। আমির সে তপস্যার জন্য জৈনরা বলেছেন, চাই অপরিগ্রহ। বৌদ্ধরা বলছেন, Knowing the not knowing. না জানাকে জানতে পাবার বিপুল ঐশ্বর্য পেলে আর কী চাই। অতএব হে ভোগী মন, মধুসূদনের মত গুপ্তধনের লোভে হিরে–জহরতের স্তূপের মধ্যে বন্দি হয়ে যেও না। বাসনা মম পূরিল না। মন ন হন্যতে আত্মা কি পরমাত্মা? জীবাত্মা ছুটেছে তার সঙ্গে মিলনের গোপন অভিসারে? শ্রীরাধার বর্ষাভিসারের মতো? ছোট আমি মিলতে চাইছে বড় আমির সঙ্গে। তাকে দোহাই তোমরা মিলতে দাও।

জুড়াইতে চাই কিন্তু জুড়াইতে পারি না। সীমাবদ্ধের শ্যামলেন্দুর মত শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। একতলা–দোতলা–তিনতলা। মন বাবাজি, লিফটা খারাপ। তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। এসব ছেঁদো যুক্তি দিও না। আসলে তুমি ওপরে উঠতে চাইছো। তোমার তর সয় না।

শাসক মন বলছে, এ পুঁজিবাদী সমাজে ইহাই নির্মম সত্য। আমরা জেলখানায় কয়েদি। অ্যান্টি–সিস্টেম কে? প্রকৃত আদর্শ সাধু অথবা বিপ্লবীরা কোথায়? সাধু তো কৌপিন পরে জঙ্গলে থাকেন না। তার মোবাইল ফোন আছে। ইউ টিউব সাধু ভক্তদের কল্যাণে প্রবচন শোনাচ্ছেন। আর যদি সাধু হন আরও উচ্চমার্গের তবে সব ত্যাগ করেও তিনি তো এ রাষ্ট্রের নাগরিক। তাঁর আধার কার্ড আছে। ভোটার পরিচয় পত্র আছে। সাধু ভোট দিন আর না দিন তিনি নাগরিক। দেশের মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক করতে চাইছেন তিনি।

এক মৃতপ্রায় বৃদ্ধা বিছানায় শয্যাশায়ী। প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করছেন মৃত্যুর জন্য। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে মৃত্যু সততই বেদনার নয়। মৃত্যু এক বিদায়। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুধর্ম বলে, শরীর ত্যাগ করে এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে পাড়ি দেওয়ার এক চক্র। ভ্রমণের মানচিত্র। সেই বৃদ্ধা মৃত্যু পিপাসী কিন্তু তাঁর আধার কার্ডটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় হারিয়ে গেছে। তিনি বারংবার তাঁর সন্তানাদিকে বলছেন, বাপু, আমার আধার কার্ডটি খুঁজে দে। ওটি আমার পাশে রাখ।

কেন মা? এখন আধার কার্ড কী হবে?

মা বললেন, ওরে শুনেছি শ্মশানে নাকি আজকাল আধার কার্ড দেখাতে না পারলে দাহ করতে দেয় না। এক এক করে শবদেহ পুড়ে ছাই হচ্ছে আমার দেহটি পাশে পড়ে থাকবে। তোদের আমাকে নিয়ে মৃত্যুর পরও কত কষ্ট হবে। হয়ত ডোমকে ঘুষ দিতে হবে!

এখন জেল বন্দিদের মত আমাদেরও এক একটা নম্বর আছে। আমরা মানুষ নই, আমরা এখন যেন সংখ্যা।

বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটে অতিপ্লাবনে গঙ্গার স্রোত ভাসিয়ে দিয়েছে। কাঠের গুঁড়িগুলো কাটা হয়েছে। দূরবর্তী স্থানে পতিতা মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ বন্ধ। যেন এই ভুবনবিখ্যাত ঘাটে হরতাল।

পুড়ে ছাই হয়ে যাব তো আমরা সবাই। তা বলে আজকের দিনটা বাঁচার মত বাঁচব না। পার্ক স্ট্রিটে হুল্লোড় ট্রিঙ্কাস-তন্ত্রে নৃত্যকলা আর চৌষট্টি কলার মহোৎসব। যিশুপুজোর কেক, চারদিকে আলোর ঝরনা ধারা সৃষ্ট কলকাতা পুরসভা আর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন পরকীয়া যৌনসুখ – ডাল ভাত পথ্য করে দিন কাটাবো কেন? অন্নজলের ঘোর অনটনও কবি দেখেছিলেন তাই বলেছিলেন, আনো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।

বিপ্লবী মন অন্নকোষে চিমটি কেটে বলে, তুই এ ভাবেই বেঁচে থাকবি? এ বেঁচে থাকাই কি তবে বাঁচা।

মনের এই অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাহলে কি ঘুচবে না? বরং মেনে নেওয়া ভাল, মায়া থাকবেই এই ইহ জীবনে। বুদ্ধদেব থেকে স্বামীজি মায়া দয়া কম ছিল? নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কি তবে মায়াদয়াহীন হতে হবে?

হে মন, বরং তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। দু'টুকরো মনকে কি ফেভিকল দিয়ে জোড়া যাবে না?

ব্ল্যাকলিস্টেড আপনি!!

গৌতম ভট্টাচার্য

অফ স্টাম্পের বাইরের চত্বরটা সাংবাদিকের জন্য কেমন গভীর, বিপদসঙ্কুল, অহর্নিশি নাটকীয় আর অনিশ্চিত বোঝাতে কাতার বিশ্বকাপের ব্যাকরুমের ঘটনার চেয়ে ভালো কোনও নমুনা মনে করতে পারছি না। নিজের মধ্যে রেকর্ডেড ভিডিয়ো ক্লিপের মতো বারবার ফ্ল্যাশব্যাক হতে থাকে এবং সন্দেহ হয়, বাকি জীবনও হয়তো হবে।

"কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। আপনার টিকিট ম্যাচ করছে না," যে ছেলেটি গেটে টিকিট চেক করছিল সে চমকে দিয়ে জানাল।

লোকেশন সেই লুসেল স্টেডিয়াম। যার একফালি ঘাসের টুকরোও এখন মেসিভক্তরা প্রচুর ডলার খরচ করে কিনে নেবে।

তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় সময় সন্ধে গড়িয়ে আটটা। ভারতে রাত সাড়ে দশটা। মিডিয়া শাটল থেকে সদ্য নেমেছি বিদেশি মিডিয়ার কিছু লোকের সঙ্গে। ফাইনাল নয়—তার দিন দশ-বারো আগে। পর্তুগাল বনাম সুইৎজারল্যান্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। গ্রুপ লিগ নয়, শেষ আটে ওঠার যুদ্ধ। নক আউট। কিন্তু ম্যাচের সম্ভাব্য ফল নয়, তার চেয়ে বেশি জল্পনা চলছে রোনাল্ডোকে কি টিম খেলাবে? যদি না খেলায় সে তো কেলেঙ্কারি। ক্যাপ্টেন হয়েও টিমের বাইরে চলে যাবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মাঠের মেজাজ আন্দাজে তাই দু-ঘণ্টা আগে চলে এসেছি। আজকের ম্যাচে খেলা যত না, তার চেয়ে বেশি মাঠের বাইরের খেলা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আর সেই মুডটাকে শেকড় থেকে ধরা দরকার। তখন তো জানি না মাঠের বাইরের সম্ভাব্য রোনাল্ডো স্টোরি চেজ করতে গিয়ে নিজেই যে শেকড়ের বাইরে চলে যাব।

যে ছেলেটি টিকিট স্ক্যান করে করে ঢোকায় সে জানাল, "তিনবারের চেষ্টাতেও হচ্ছে না। আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।" রীতিমতো তর্ক জুড়লাম তার সঙ্গে। ঢুকতে দিতে পারি না মানে? আমায় কাছে তো টিকিট রয়েছে। সিট নাম্বার রয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ফিফা ডেস্ক আমার ডেকে স্ট্যান্ড বাই লিস্ট থেকে টিকিট দিয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার টিকিটের ওপর লেখা রয়েছে মিডিয়া ট্রিবিউন। সিট নম্বর ৫। রো-জি। ব্লক ৬০৫।

সে মাথা ঝাঁকাল, "যতক্ষণ না আমার সিস্টেম ম্যাচ করছে, কিছু করার নেই।" তর্কাতর্কি হচ্ছে দেখে ছুটে এল তার বস গোছের কেউ। টিকিট নিয়ে সে নিজের হাতে থাকা যন্ত্রে স্ক্যান করল। একই কথা না, বারকোড মিলছে না।

জীবনে কখনও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের টিকিট না-পাওয়া, সিট না-পাওয়া তো বিশ্ব ফুটবল বা গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস কভারেজে ভারতীয় প্রতিনিধির খুব কমন পরিণতি। যেমন ইংল্যান্ড-ফ্রান্স ম্যাচ পাইনি। সেমি ফাইনালে আর্জেন্টিনা-ক্রোয়েশিয়া পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রেস কনফারেন্স পাস পাইনি। হতেই পারে। কিন্তু ফিফা মিডিয়া ডেস্ক থেকে বৈধ টিকিট নিয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না— এটা আবার হয় নাকি? হয় জাল

টিকিটের বেলা। এক্ষেত্রে যার প্রশ্নই ওঠে না। বললাম, আপনাদের কি টিকিটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে?

ওরা বলছে, না। তাহলে প্রশ্ন কোথায়? সরাসরি উত্তর না দিয়ে জানাল, আপনি পাশের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্টারে খোঁজ করুন তো। এতক্ষণ খেয়াল করিনি মিডিয়া সেন্টারে ঢোকার মুখে সিকিউরিটির ঠিক পাশে অস্থায়ী তাঁবু হল অ্যাক্রেডিটেশন সেন্টার। বাইরে লাইট নেভানো বলে নজরে পড়েনি এতদিন। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল লাইট জ্বলছে। দু-চারজন কর্মীও রয়েছে। এদের মধ্যে যে ফিফা-র সিনিয়র প্রতিনিধি সে আমার গলার কার্ডটা খুলে নিয়ে চলে গেল। বলল, চেক করে সব কিছু জানাবে। বসে আছি তো বসে আছি। সে ফিরছেই না। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর বললাম, আমায় তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। ভেতরে ঢুকে কাজ-টাজ করতে হবে।

ওখানে বসে থাকা ফিফা-র লোকজন বলছে, না, সেটা হয় না। আপনার সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। বললাম, এত সময় নষ্ট হচ্ছে। আমায় অন্তত ভেতরে ঢুকতে দিন। আমি মিডিয়া সেন্টারে বসে কাজ শুরু করি। ততক্ষণে আপনারা টিকিটের ব্যাপারটা অনুমতি নিয়ে নিন। এখানে বুঝিয়ে দিই, মিডিয়া সিকিউরিটি জোন ক্রস করে প্রথমে মিডিয়া সেন্টার। তারপর সেখান থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে মূল মাঠে ঢোকার গেট। আমাদের জন্য যে গেটের নাম মিডিয়া ট্রিবিউন। আজকের পরিকল্পনা— সেখানে বিখ্যাত ইংরেজ গর্নালিস্ট পিয়ার্স মর্গ্যানকে খুঁজে বার করা। ইনিই তো ম্যান ইউ নিয়ে রোনাল্ডোর ইন্টারভিউতে গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু কোথায় মর্গ্যান! কোথায় কী! বসে থাকতে থাকতে এবার এদের বস ফিফা-র মুখ্য প্রতিনিধি ফেরত এসেছে, "আমি তো এতক্ষণ কথা বললাম। সেটা করা যাবে না। মিডিয়া সেন্টারেও আপনাকে ঢুকতে দিতে পারি না।"

বাট কারণটা কী? সমস্যা কোথায় হচ্ছে?

"মিস্টার গৌতম, কারণ হল, ফিফা আপনাকে ঢুকতে দেবে না। ফিফা আপনাকে ব্ল্যাকলিস্ট করেছে।"

ব্ল্যাকলিস্ট!! বলছে কী! আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় আমার মাথায়। বিশ্বকাপে প্রথম উপস্থিত থাকার কথা ছিল জি-র সর্বভারতীয় এবং একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। আমার বস এবং কোম্পানির তখনকার সিইও-র নির্দেশ অনুযায়ী টিকিট এবং ডাউনটাউন দোহায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে যে ক্যামেরার কাজ করবে তারও যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। দৈনিক কভারেজ শুধু নয়। আমাকে রাত দশটার নিজের স্পোর্টস শো চালু করতে হবে ওখান থেকে। যা কলকাতা ফিরেও চলবে।

হঠাৎ করে মহানাটকীয় এক সন্ধ্যায় ক্রমহ্রাসমান রেভিনিউ নিয়ে গোলযোগে কোম্পানির সর্বভারতীয় পটচিত্র বদলে যাওয়ায় তিনশো লোকের কর্মচ্যুতি সমেত একটি নিউজ চ্যানেল জি হিন্দুস্তান বন্ধের সিদ্ধান্ত। সিইও সমেত আমার বসেরা অভাবনীয়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত। কর্পোরেট জগতে এমন পরিস্থিতিতে কী হয়ে থাকে টুইটারের আপাত নিশ্চিন্ত দুনিয়া দেখিয়ে চেয়েছে। আমাকেও ইস্তফা দিয়ে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে উঠতে হয়েছে। টিকিট থেকে শুরু করে থাকার জায়গা সব নতুন করে ব্যবস্থা করে। স্ত্রী-র পরামর্শে জাস্ট ভারহীন লেখা এবং বিশ্বফুটবল এনজয় করার জন্য।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে জীবনের প্রথম টুর্নামেন্ট কভারেজ। তা-ও কিনা বিশ্বকাপ ফুটবল। তবু মানিয়ে নিতে বিশেষ প্রবলেম হয়নি। দোহায় নামার পর থেকে গত নয় দিন নিয়মিত ফিফা-র মিডিয়া টিকিটে এই স্টেডিয়াম ওই স্টেডিয়াম ঘুরছি। ফেসবুকে লিখছি। লিখে বিস্ময়করভাবে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাচ্ছি। উৎসাহে লেখার সংখ্যা বাড়াব ভাবছি। উৎসাহে ভরপুর কোনও কোনও ফেসবুক রিডার এমনও লিখছে, ''দৈনিক কাগজ ছেড়ে আগে আপনার লেখা পড়ছি।'' তার মধ্যে এটা কী ব্যাপার?

গত ৩৯ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ইভেন্ট কভার করে আসছি দেশে-বিদেশে। দুঃস্বপ্নেও এমন কিছু করিনি যাতে কেউ 'ব্ল্যাকলিস্ট' শব্দটা উচ্চারণ দূরে থাকে, ভাবতেও পারে। এবার কী ঘটবে? এত অসম্মানজনক প্রত্যাখ্যানের জীবনে কখনো মোকাবিলা করিনি। একটা বৈধ টিকিট নিয়ে এরা মাঠে ঢুকতে দিচ্ছে না। যা কল্পনাতীত! এমন আচরণ করছে যেন আমি উগ্রপন্থী। ঢুকতে দিলে মাঠের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। আমেরিকান জার্নালিস্ট হলে কেস করে দিত। তুমি বৈধ টিকিটধারীর স্টেডিয়াম ঢোকা অত্যন্ত নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কী করে আটকাতে পারো? কিন্তু আমায় তো আপনাদের কারণ বলতে হবে যে কী কারণে আমার বৈধ টিকিট আপনারা নাকচ করছেন?

"সেটা আমি জানি না। আপনাকে মেন মিডিয়া সেন্টারে ফিরে গিয়ে জানতে হবে," জানাল ফিফা প্রতিনিধি। বুঝলাম ম্যাচটা গেল। কারণ মেন মিডিয়া সেন্টার লুসেল স্টেডিয়াম থেকে অন্তত কুড়ি কিলোমিটার। অনুরোধ করলাম— যে মিডিয়া শাটলে এখানে এসেছি সেটায় কি আমি ফেরত যেতে পারি? এমনিতেই তো ওটা মেন মিডিয়া সেন্টারে ফিরবে? যেন ভ্যাটিকান থেকে নির্দেশ নেমে আসছে সেই ভঙ্গিতে লোকটি বলল, "মেট্রো স্টেশন খুব কাছে। মেট্রো করে চলে যান। আটটা স্টেশন দূরে।"

ওই চরম অপমানিত অবস্থাতেও সাংবাদিকের ইনস্টিঙ্কট কাজ করছিল। মনে হল রোনাল্ডোকে ঘিরে নিশ্চয়ই মাঠের বাইরে কোনো না কোনো নাটক তৈরি হতে শুরু হয়েছে। আমি যেহেতু মূল স্টেডিয়াম চত্বরে ঢোকার অনুমতি পাচ্ছি না এবং আজ রাতে আর স্টেডিয়াম ফিরব না। যা যা চিত্রকল্প তৈরি হচ্ছে এখনই ছবি বা ভিডিয়োতে তুলে রাখা দরকার। মেট্রোয় ঢোকার মুখে দেখলাম বিশাল রোনাল্ডো কাট আউট নিয়ে পর্তুগাল জার্সিতে তাঁর ফ্যানেরা ঢুকছে। ব্যাপক কোরাস হচ্ছে রো-ও-না-ল-ডো। রো-ও-না-ল-ডো। কিছু ভারতীয়কেও দেখা যাচ্ছে পর্তুগিজ জার্সিতে। এক ঝলক দেখামাত্র বোঝা গেল, এরা পর্তুগালের চেয়ে বেশি রোনাল্ডো-দীক্ষিত।

তিনি রোনাল্ডোকে বেঞ্চে বসান অথবা খেলান। ওই ফার্নান্ডেজ সান্তোস না কী, তাঁকে বোঝাই যাচ্ছে আজ আবেগের আস্তরণে চাপা দিয়ে মারবে ভ্রাম্যমাণ সি আর সেভেন ফ্যান ক্লাব। ছ-বছর আগে ইওরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বিমানের সদর দরজার বাইরে মুষ্টিবদ্ধ হাতে রোনাল্ডো ও তাঁর বর্তমান কোচ-সেই ছবি এখন ইতিহাস। বরঞ্চ বিরোধের শিখর এবং তাকে ঘিরে মহাতারকার সঙ্কটকালে গভীর সমর্থনের চৌম্বকীয় অনুষঙ্গগুলো এখন থেকেই প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। এমন মুহূর্তে হৃদয় যতই বিদীর্ণ থাক, সেই টুকরো ছবিগুলো তো লেখার জন্য তুলে রাখতে হবে।

পাশাপাশি জীবনে ভুলব না কী মন নিয়ে সেই রাত্তিরে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার আসল ঘাঁটি কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ফেরত গেছিলাম। যেন মৃত সন্তান কোলে দাহ করতে যাচ্ছি। ব্ল্যাকলিস্টেড— তো একটা ভয়ঙ্কর শব্দ। যতদূর জানি বিশালরকম শৃঙ্খলাভঙ্গে ব্যবহার হয়। কাতারের নিয়ম ভেঙে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলে। শ্লীলতাহানি জাতীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে। প্রকাশ্যে সমকামীমূলক ব্যবহার করলে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে। এর একটাও প্রয়োগ করার প্রশ্ন নেই। তাহলে কীসের আইন ভাঙলাম আমি?

মিডিয়া সেন্টারের তিনতলায় যখন ধড়ফড়িয়ে এলিভেটরে উঠছি, দেখলাম সামনেই দাঁড়িয়ে আছে টিকিট যেখান থেকে দেওয়া হয়, সেই কাউন্টারের ভারপ্রাপ্ত মহিলা। ইতালিয়ান সুন্দরী। পরে জেনেছি এর নাম গ্রেটা বারবোসা। বললাম, আপনারই কলিগ ডেকে আমাকে বিকেলবেলা ম্যাচের টিকিট দিলেন এই ডেস্ক থেকে। অথচ সেটা প্রত্যাখ্যাত কেন বুঝিয়ে বলবেন? আমি তো এত বছর সাংবাদিকতায়। পৃথিবীতে কখনো এমন আজব কিছু দেখিনি।

গ্রেটা দেখা গেল পুরো কাহিনি সম্পর্কে অবহিত। বললেন, "রিফিউজ করা হয়েছে তার কারণ আমরা সূত্র মারফত খবর পেয়েছি আপনি শুধু ফেসবুকে লিখছেন। শুধু ফেসবুকে পার্সোনাল প্রোফাইলে লেখার জন্য ফিফা কেন অ্যাক্রেডিটেশন দেবে? তাহলে তো লাখ লাখ লোককে দিতে হয়।" আমি জবাবে বললাম, খুব অবাক লাগছে আপনারা আমার বক্তব্য না শুনে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন? সামনের টিভি-তে তখন দেখতে পাচ্ছি পর্তুগাল টিম মাঠে এবং রোনাল্ডো সাইডলাইনে। কিন্তু আমি নিজেও তখন সাইডলাইনে এবং ফার্নান্ডো সান্তোসের চেয়ে অনেক কঠিন প্রতিপক্ষকে খেলছি। যার নাম ফিফা।

বললাম, একটা বৈধ টিকিট আপনারাই দিয়েছেন মাত্র ক-ঘণ্টা আগে। হঠাৎ করে এত বড় রহস্য উদ্ধার করে আমাকে আটকে দিলেন? আইনত পারেন কি? প্রথম কথা আপনার তথ্যের ভুল। আমি অলরেডি উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি দৈনিকের হয়ে লিখছি। অসমের অন্য শহরের আর-একটি দৈনিক আমার লেখা চায় কাল থেকে। হয়তো তাদের জন্যও লিখব। সেদিনকার শিলচরের কাগজে ছেপে বার হওয়া পিডিএফ ফোনে ছিল। দেখালাম। গ্রেটা খুব আশ্চর্য। বললেন, "আমার আইডি-তে একটা মেল করে এই তথ্যটা পাঠাবেন। ওরা কি তাহলে বড় ভুল করল?"

আমি বললাম, দাঁড়ান, শেষ হয়নি আমার কথা। যেটা ফেসবুক প্রোফাইল বললেন সেটা আমার পাবলিক পেজ।

প্রায় সাত লাখ ফলোয়ার্স আছে ওই পেজের। পেজ ভিউ তার দ্বিগুণ। টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব আর ফেসবুক নিয়ে যখন কোনও পোস্ট আপলোড করি সেটা ৯ লাখ লোকের কাছে যে কোনও ইভেন্টের প্রোমোশন হয়। যেমন এখানে হচ্ছে। প্রায়শই তাই পোস্টগুলো স্পন্সরড হয় এবং ফেসবুক বিনিময়ে আমাকে টাকা পাঠায়। নিছক সংখ্যার বিচারে— কলকাতা থেকে যে ক-টা কাগজ এসেছে, একটা বাদে প্রত্যেকের প্রচারসংখ্যা আমার মোট ফলোয়ার্সের চেয়ে নিচে। ইন্টারনেট খুলে এখুনি চেক করতে পারেন আমি যা বলছি ঠিক কি না? যদি তৃতীয় বিশ্বের বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে ফুটবল প্রোমোশন বিচার্য হয়, আপনি আমাকে বাদ দেন কীভাবে? প্লাস আমি হয়তো ফিরে গিয়ে তিন বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখব। সেটাও তো প্রোমোশন।

প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট করে গ্রেটার মাধ্যমে ফিফা-কে মেল পাঠালাম। এটা যে আমার উপর্যুপরি তৃতীয় বিশ্বকাপ সেটাই শুধু নয়। এখন অবধি যা লিখেছি ফেসবুক পেজে তার কত রিচ? লাইক কত? শেয়ার কত? হাজার কমেন্টস কত। সব ওই রাতে স্ক্রিনশট তুলে তুলে পাঠালাম। সঙ্গে জুড়ে দিলাম কিছু ছবি। বিশ্বফুটবলের যেসব তারকাকে ইন্টারভিউ নিয়েছি সেইসব ক্লিপিংস বা তাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার ছবি। শুধু পেলে-মারাদোনা দেখেই ইতালিয় মহিলা আলোড়িত। কিন্তু আমি তখন আর থামতে রাজি নই। সব ক-টা জুড়ে দিয়েছি। ববি চার্লটন-রুড গুলিত-রজার মিল্লা-ডিয়েগো ফোরলান-টোস্টাও-কাফু-ব্র্যাঙ্কো-গোয়কোচিয়া-আমারিল্ডো-কার্লস ভালদারামা। লিখলাম যে মারাদোনার দুবার ইন্টারভিউ নিয়েছি শুনে এবং সেই সাক্ষাৎকারের ইংরেজি ক্লিপিংস দেখে এখানে দুজন আর্জেন্টিনা সাংবাদিক তাদের কাগজের জন্য আমায় ইন্টারভিউ করল। চাইলে তাদের নাম দিয়ে দিচ্ছি। এমন কোণঠাসা অবস্থা যে আপাত রুচিহীন কিন্তু সত্যি একটা কথা মেলে বাধ্য হয়ে লিখলাম, জীবিত বা মৃত ভারতবর্ষের কোন্ ফুটবল জার্নালিস্ট ভিনদেশি এতগুলো ফুটবল তারকার ওয়ান অন ওয়ান ইন্টারভিউ পেয়েছে আমায় দয়া করে প্রমাণসহ জানাবেন।

বহু বছর আগে অমিতাভ বচ্চন আমায় ক্রাইসিসে তাঁর বাবার পরামর্শের কথা বলেছিলেন; সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখবে। শত প্ররোচনাতেও সহজে যুদ্ধে যাবে না। কিন্তু একান্ত যদি যেতেই হয়, নিশ্চিত করো যে তুমি জিতে ফিরছ। আজ পর্যন্ত সেই মন্ত্র ভুলিনি এবং আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন আরও মনে পড়ে গেল।

টিভি-তে দেখছি রোনাল্ডোর পরিবর্ত গঞ্জালো রামোস তাঁর দুরন্ত দৌড় আর সুযোগসন্ধিৎসু মনোভাব দেখাতে শুরু করেছেন। আগের ম্যাচগুলোতে রোনাল্ডো একক স্ট্রাইকার থাকার সময় মনে হচ্ছিল, পেনিট্রেটিভ জোনে কেউ টুকটুক করে 'এল' স্টিকারওয়ালা গাড়ি চালাচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে রেসিং কার চলছে। দুরমুশ হয়ে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড ডিফেন্স। আমার পরিচিত দু'জন গ্যালারিতে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, রোনাল্ডো-ফ্যানেরা কী করছে টরছে? লেখায় ব্যবহার করা যাবে। লজ্জায় বলা গেল না আমি কোনও সঙ্গত কারণ ছাড়াই যে আচমকা ফিফা গারদে।

ম্যাচ চলতে চলতেই পরের ফোন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সংস্থার প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবেকে। ততক্ষণে ভারতে গভীর রাত। রোনাল্ডো সবে নেমেছেন। কল্যাণ বোধহয় ম্যাচ দেখছিলেন। নইলে অত রাত্তিরে জেগে থাকার কথা নয়। সবকিছু শুনে তিনি ব্যাপক আশ্চর্য এবং ব্যথিত। বললেন, "আপনি এখুনি জয়দীপদাকে মেল পাঠান। বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি।" জয়দীপদা মানে জয়দীপ বসু। এআইএফএফ-এর মিডিয়া দেখাশোনা করেন। পুরোনো কাগজে দীর্ঘ অনেক বছর ছিলেন সহকর্মী। ফুটবল প্রতিনিধি হিসেবে তিন দশকেরও বেশি সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং খুব ভালো মানুষ। জয়দীপ দ্রুত ফেডারেশনের তরফে ফিফা-কে আমার যোগ্যতার দিকটা হাইলাইট করে মেল করলেন। বয়ান খুব নির্দিষ্ট অথচ বলিষ্ঠ, ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন। ইনি আমাদের দেশের সম্মাননীয় সাংবাদিক। যদিও জয়দীপের মুখে একটা আশঙ্কা ঝরল যে একবার যখন আটকেছে, আবার দেবে কি না কে জানে? অথবা এমন হতে পারে যে ওদের ফেসবুক-বিরোধী কোনও লাইন আছে।

আমি কেন জানি না নিশ্চিত ছিলাম যে ফিফা-র ঝাঁপ আবার খুলবেই। সংখ্যার দাবিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না এদের পক্ষে। কারণ ডিজিট্যালি সংখ্যাই শেষ কথা। প্লাস প্রিন্সিপল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস মানা হয়নি এক্ষেত্রে।

ফিফা-র মতো সংস্থা খামখেয়ালিপনার বশে কোনো কিছু করতে পারে না। তাদের টার্মিনাল স্টেশন হতেই হবে যুক্তি। দু-একটা কাগজ বাদ দিলে ভারতের বিশেষ কোনও হাউসকে ফিফা পাত্তা দেয় বলে আমার কখনো মনে হয়নি। বরং আপনার টিম যখন খেলছে না তখন আপনার একমাত্র আশ্রয়স্থল আপনার প্রভাব। কত বেশি সংখ্যক ফুটবল নাগরিককে আপনি এর নির্যাস পৌঁছে দিচ্ছেন? আর সেই সংখ্যার মাপকাঠিতে আমি অনেকের এগিয়ে।

একটা রাত্তির খুব অস্থির কাটল। তার মধ্যেই লেখাটা আপলোড করলাম— সূর্যাস্ত হয়ে গেল সি আর সেভেনের? হেডিংটা কম্পোজ করতে করতে ভাবছিলাম, বিনা অপরাধে আমার বিশ্বকাপ কভারেজেরও কি সূর্যাস্ত হয়ে গেল? অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, ফিফা-র একটা অংশ ভারতীয় ফুটবল রিপোর্টারদের মানুষ বলে গণ্য করে না। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-এর যুগে তা হয়তো বদলেছে। কিন্তু কতটুকু? পুরো বদলালে তো এমন সিদ্ধান্তই নিত না।

পরের কয়েক মিনিটে ফিফা মিডিয়া সার্ভিসেস টিমের যে মেলটা আছড়ে পড়ল সেটা পরম যত্নে রেখে দিয়েছি। ভবিষ্যৎ দুর্যোগের মধ্যেও তার বয়ান হাসি ফোটানোর পক্ষে যথেষ্ট। দুবার ক্ষমা চাওয়া আছে সেই মেলের শুরুতে ও শেষে। আমি তার পরেও অত্যন্ত কড়া করে একটা মেল করি যা থেকে ফ্রেশ ঝামেলা শুরু হতে পারত। ফিফা উত্তেজিত হয়ে যেতে পারত যে আমরা ক্ষমা চাওয়ার পরেও এর এত অ্যাগ্রেশন? কিন্তু চরম আক্রমণাত্মক সেই মেলের কোনও জবাব আর আসেনি। যা এসেছে তা হল পরপর ম্যাচ টিকিট যার মধ্যে ফাইনালও রয়েছে।

এরপর দেখা হতেই মিডিয়া টিকেটিং ডেস্কের গ্রেটা এবং লুকা জিজ্ঞেস করত, "স্যার, আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?" গ্রেটা বার বার বলত, "এগুলো আমরা ঠিক করি না। প্লিজ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। যারা করে তাদের কাছে শুনলাম একটা ইনফর্মেশনের ভিত্তিতে ভুল হয়ে গিয়েছে।" আশ্চর্য-ফিফা-র মেলেও লেখা— আমাদের জানানো হয়েছিল যে আপনি এ মুহূর্তে কোনো প্রিন্ট বা ডিজিট্যাল মিডিয়ার সঙ্গে নেই।

মেলটা পড়া মাত্র অজান্তে মুখে চিলতে হাসি খেলে গেছিল। আমি ঠিক এটাই আন্দাজ করেছিলাম। আর দুর্ঘটনার প্রথম মিনিট থেকে যা ভাবছিলাম সেটাই তাহলে সত্যি প্রমাণিত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। অনেক সময় পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হয় যে অমুক আর আমাদের সঙ্গে নেই। এখানে সেটা হতে পারে না কারণ আমি পদত্যাগের শর্ত অনুযায়ী দু'মাসের নোটিশ দিয়েছি। এখনও বার বার বলেও পদত্যাগপত্র অ্যাকশেপ্টেন্সের চিঠি পাইনি। তারা হতেই পারে না। আর ফিফা-র খেয়েদেয়ে কাজ নেই তারা টুর্নামেন্টের মধ্যে অনুপুঙ্খ তল্লাশি চালাবে যে কে কী লিখছে? এদের বা আইসিসি-র ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা হয় যে পরের বার অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়ার আগে প্রমাণ পাঠাতে বলে, সেবার এসে আপনি কী কাজ করেছিলেন, আমাদের তার নমুনা পাঠান। কিন্তু ভরা টুর্নামেন্টের মধ্যে কার সময় আছে এসব দেখার? তা-ও ভারতের মতো গুরুত্বহীন ফুটবল-দেশের এক অজানা ফুটবল প্রতিনিধিকে নিয়ে?

সেই বাস্তবের সঙ্গে মানানো দুঃখজনক হলেও ধরে নেওয়া যায় এটা আমার পরিচিত শহরের পরিচিত কোনও ফুটবল প্রতিনিধির লাগানি-ভাঙানির পরিণতি। বাকিরা কেউ জানে না। বা এমনও হতে পারে সম্মিলিতভাবে দু-তিনজনের সুইট কর্মকাণ্ড। আমার এখানে আচমকা উপস্থিতি যার বা যাদের হয়তো মোটেও প্রীতিকর মনে হয়নি। বা কেউ হয়তো কলকাতায় বসে একটা আইডি ক্রিয়েট করে মেল করে দিয়েছে। কাতারে আমার শহরের যারা কভারেজে এসেছিল তারা অনেকেই যথেষ্ট কাছের। যারা নয় তাদের কেউ কেউ কাছের না হলেও এত নোংরামিতে জড়িয়ে ছিল ভাবতে মন চায় না। কিন্তু আর ব্যাখ্যা কী? ঈশ্বর জানেন।

সাংবাদিকতায় আসার পর থেকে এই জাতীয় ঘটনা এত বেশি দেখেছি যে এক-একসময় লজ্জা লেগেছে যে আমরা মিডিয়া কিনা অন্য লোকের দোষ ধরতে বসি? আমাদের বিচার কারা করবে? কে তুলে ধরবে আমাদের নীচতার কথা? আগে তো নিজেকে শুদ্ধ করো, তারপর না হয় অন্য লোকের দোষ ধরতে যাও?

মেঘে ঢাকা দিনলিপি

সত্যম রায়চৌধুরী

খুব কম সময়ের জন্যে তিনি এসেছেন এই পৃথিবীতে।

দারিদ্র, করুণ শৈশব, শোক, মৃত্যুর হাতছানি, বাগদত্তা প্রেমিকার ছেড়ে চলে যাওয়া — সব একের পর এক এসে গিয়ে খেয়েছিল তাঁর জীবন। কবি জন কীটস।

মাত্র আট বছর বয়সে হারিয়েছিলেন বাবাকে আর কৈশোরে কীটসের মা-ও চলে গেলেন দারুণ ক্ষয়রোগে। তারপর ভাই টমকে হারিয়ে বন্ধু ব্রাউন আর মিসেস ডিঙ্কের পরিবারের সঙ্গে একটি অপরূপ বাড়িতে বিক্ষত-হৃদয়ে আশ্রয় নিলেন কবি। মিসেস ডিঙ্কের পরিবারের সঙ্গে গল্প করে, তাঁর বেড়ালদের ছোটাছুটি দেখে, বন্ধু ব্রাউনের সঙ্গে পার্টিতে নাচ গান করে একটু হালকা হলেন কীটস। এই সময় জীবনে এলো প্রেম। যে প্রেমের সমাপ্তি দৃশ্যে সাজানো ছিল কবির মৃতদেহ।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কীটসের বাড়িতে ভাড়া এলেন মিসেস ব্রন। তাঁর বড়ো মেয়ে ফ্যানি। ফ্যানির প্রেমেই পড়লেন কীটস। আমোদ আহ্লাদপ্রিয় হালকা চটুল চপলমতি মেয়ে ফ্যানি। তবু কীটস তাকে ভালবাসলেন নিজেকে উজাড় করে। তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন চুনির আংটি। যেটা তাঁদের বিয়ের আংটি বলে ফ্যানিকে চিঠিতে লিখলেন কীটস।

ফ্যানিকে বর্ণনা করতে তাঁর দরকার হলো উজ্জ্বলের থেকেও উজ্জ্বলতর কোনও শব্দ।

প্রিয়তমা,

ক-দিন আগে তোমার আঙুলে আমি পরিয়ে দিয়েছি একটি আংটি। তুমি ভাবছো এবং লোকেও তাই ভাববে যে তুমি আমার বাগদত্তা। ওটা আমাদের বিয়ের কথা দেওয়া আংটি। তা নয়। তোমার হাতের অনামিকায় যে আংটিখানি আমি পরিয়ে দিলাম তুমি অন্তত জেনো ওটা আমাদের বিয়ের আংটি। আংটিতে যে রক্তিম চুনিটি জ্বলজ্বল করছে, সেই চুনির মধ্যে রইল আমার হৃদয়ের এক ফোঁটা রক্ত।

আমি আমার কপালের ওপর এসে পড়া কয়েকটি সোনালি চুল ছুঁইয়ে দিলাম ওই আংটিতে— হৃদয় আর শরীর এক হয়ে রইল। এরচেয়ে বেশি বিয়ে এ-জীবনে তোমার-আমার হবে না।

আমি তোমাকে বলিনি, কিন্তু আজ বলতেই হবে। আমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। বুঝতে পারছি আমার মধ্যে ক্ষয় ধরেছে। ক্রমশ অসুখটার সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলছি। ক-দিন আগে লন্ডন গেলাম, তুমি তো জানোই। তুমি যেতে বারণ করলে, তবু গেলাম। আসবার সময় আচমকা বৃষ্টি। ঠান্ডা লেগে গেল। ব্রাউন* আমাকে তাড়াতাড়ি গরম লেপের মধ্যে শুইয়ে দিল। কিন্তু ভয়ানক কাশি শুরু হলো। দমকে দমকে কাশি। হঠাৎ রক্ত উঠল কাশির সঙ্গে।

বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়তে লাগল বিছানায়। আমি

ব্রাউনকে বললাম বাতিটা একবার নিয়ে এসো, বাতির আলোয় রক্তের রংটা একবার দেখি। ফ্যানি, আমি ডাক্তার, রক্তের রং চিনতে ভুল করব না। বাতির আলোয় রক্তের রংটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। নিশ্চিত হলাম। তারপর সম্পূর্ণ আবেগহীনভাবে ব্রাউনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি রক্তের ওই রং চিনি। এটা ধমনীর রক্ত। আমাকে এই রং ঠকাতে পারবে না। ওই রক্তবিন্দু আমার মৃত্যুর পরোয়ানা। আমাকে মরতেই হবে। ফ্যানি তোমাকেও বলছি, ওই রক্তের রং আমি চিনি। ধমনীর একবিন্দু ওই রক্ত আমার মৃত্যুর চিঠি নিয়ে এসেছে। মরতে আমাকে হবেই। আমি মরতে চলেছি সেই অসুখে, যে রোগে মরেছে আমার মা, আমার ছোট ভাই। যে অসুখের কোনও ওষুধ নেই ফ্যানি।

আমি এত দুর্বল, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না। ঘর থেকে, আমার রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে, কখনও কখনও তোমাকে দেখতে পাই বাগানের রোদ্দুরে সতেজ প্রাণবন্ত। মনে অভিমান হয়। আমার নিঃসঙ্গতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফ্যানি 'দ্য ক্যাপ অ্যান্ড বেলস' নামে যে শ্লেষাত্মক লেখাটা আমি লিখছিলাম সেটা শেষ করার শক্তি আমার আর নেই। শ্বাস নিতে পারি না ঠিকমতো। প্রতিটি নিঃশ্বাসে মিশে যায় বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। ওই লেখার পাশে এই ক-টি লাইন লিখে গেলাম— বলতে পারো আমার শেষ লেখা—

নতুন প্রেম ও তার আনন্দ বেশিদিন সহ্য হয়নি কীটসের। হঠাৎ খারাপ হতে লাগল তাঁর শরীর। দুর্বলতা গ্রাস করল। কাশির সঙ্গে উঠল রক্ত। যেদিন প্রথম রক্ত উঠল সেদিন ঘরে আলো নেই। বন্ধু ব্রাউনকে মোমবাতিটা আনতে বললেন কীটস। রক্তের রং-টা দেখে ডাক্তারি পড়া কীটস বুঝে গেলেন এই রং মৃত্যুর পরোয়ানা।

কীটস এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই পারতেন না। পাশের ঘরেই ফ্যানি। কিন্তু ফ্যানির কাছেও যেতে পারতেন না। চিঠি লিখতেন পাশের ঘরের প্রেমিকাকে— যে প্রেমিকা তখন ব্যস্ত নেমতন্ন যেতে, পার্টি করতে, নাচতে এবং বেড়াতে। কীটসকে ব্রাউন নীচের ঘরে জানলার ধারে খাট পেতে দিলেন। সেখানে শুয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি। দেখতে পান ফ্যানি খুব সেজেগুজে বেড়াতে বেরিয়েছে।

বিছানার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যান কীটস। লন্ডনের ঠান্ডা সহ্য করতে পারবেন না বলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইতালি। অসুখ উত্তাল হয়ে উঠল। একসময় থেমে গেলো কীটসের হৃৎস্পন্দন।

— পাখি কোনওদিন জানে না মানুষের কষ্ট। আকাশের অনেক নীচে, অরণ্য থেকে বহুদূরের ভুবনে এই পৃথিবীর মানুষের শরীর পোড়ে জ্বরে, মানুষ ক্লান্ত হয়, তার হৃদয়ে দহন-উদ্বেগ। পাখি আর মানুষ; তারা শুধু পরস্পর যন্ত্রণাকাতর শব্দ শোনে। মানুষের বার্ধক্য এসে ছায়া ফ্যালে শেষ কয়েকটি বিষন্ন ধূসর চুলে। এখানে তরুণ যুবক ক্রমশ হয়ে পড়ে রক্তশূন্য, কঙ্কালসার। তারপর মরে। এখানে কিছু ভাবতে চাইলেই এসে পড়ে দুঃখ। দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে হতাশার ভাষা। এখানে সৌন্দর্যের দ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। অথবা আজকের প্রেম কালকে হারায় সেই আলো। যে আঁখিপাতের আলোয় আজ আমি মুগ্ধ, কাল সে আলো অন্যের।

— ওড টু এ নাইটিংগেল।

প্রিয়তমা,

আমার হাত এখন উষ্ণ, জীবন্ত। এখনও কঠিন আলিঙ্গন করতে পারে যে হাত। ধরো, এই হাত বরফশীতল সমাধির নৈঃশব্দে যদি ঠান্ডা হয় তখন সেই হাত তোমার প্রতিটি দিনরাত্রিকে তাড়া করে বেড়াবে।

ভয় পাবে তুমি।

এতটাই ভয় পাবে যে তোমার মনে হবে তোমার হৃদয়ের লাল রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে আর তারপর সেই রক্তধারা আবার প্রবাহিত হচ্ছে আমার ধমনীতে।

দ্যাখো সেই হাত, আমি তুলে ধরছি তোমার দিকে।

প্রিয়তমা, তুমি মনে রেখো না আমার এই নির্মম, নিষ্ঠুর কবিতাটি। আমি বাঁচতে চাই ফ্যানি, আমি তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাই। আমি তোমাকে পেতে চাই আমার জীবনজুড়ে। আমার জীবনে তোমার থেকে উজ্জ্বল, সুন্দর,

সত্য আর কিছু নেই। ভুলে যেও না, আমিই তোমাকে লিখেছিলাম— তোমার আমার বিরহের আড়ালে থেকে গেল তোমার কোমল বক্ষ–স্পন্দনের স্মৃতি, আর আমার আমার অতন্দ্র বাসনা, আমি শুধু বাঁচতে চাই তোমাকে পাবার জন্য। আমাকে ডাক্তার বলেছে শীতকালে ইংল্যান্ডে থাকলে সেই শীত আমার সহ্য হবে না। শীতকালটা আমার ইতালিতে কাটানোই ভাল। ইতালি থেকে যদি ফিরতে পারি তোমাকে বিয়ে করব, এই কথা আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি। যাচ্ছি। যেতেই হবে। কিন্তু আমি জানি তোমাকে আর বেশিদিন আমি দেখতে পাব না। তোমার প্রেমের মায়া খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে। এই ভুবনের নিঃসঙ্গ চরাচরে আমি একা। চেয়েছিলাম প্রেম, হয়েছিলাম কবিযশোপ্রার্থী। প্রেম আর খ্যাতি সব শূন্যে মিলিয়ে গেল।

তোমার চিরকালের

জন কীটস

মাত্র পঁচিশ বছর চার মাস তাঁর বয়স। তারপর তাঁর সমাধি ফলকে ওপর দিয়ে বয়ে গেল যুগ–যুগান্তর। কবির চিঠিগুলি থেকে গেল, তাঁর কবিতার খাতাটি ভরে উঠল, তারার আলোয়। আর একটি নাইটিংগেল পাখি বাসা বেঁধেছিল তাঁর বাড়ির বাগানে। সেই পাখিটির সুর কোনওদিন থামল না।

* ব্রাউন কবির শেষদিনগুলির সর্বক্ষণের ছায়াসহচর শুশ্রূষাকারী।

সাদাত হোসাইনের

প্রেমের কবিতাগুচ্ছ

১.
শহরে অন্ধ ভবঘুরে এক মাঝি
নৌকা ছেড়ে সড়কে রেখেছে বাজি।
তোমার দুয়ার বন্ধ দেখে সে ভাবে—
তুমি তারে ডাকো রুদ্ধ দ্বারে এভাবে।

শহরে অন্ধ ভবঘুরে এক চাষি
কাস্তে ছেড়ে হয়েছে সে সন্ন্যাসী।
তোমার গৃহে আর কারো ছায়া দেখে
বুকেতে দুঃখের ফসল ফলাতে শেখে!

২.
আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।
যেখানে শেষ দেখা, সেখানে পড়ে থাকবে শিউলি ফুল, অথচ গন্ধ ছড়াবে রাফ্লেশিয়া। অলকানন্দা নামের যে নদী, সেও শুকিয়ে যাবে। আর সেখানে জেগে উঠবে আদিগন্ত সাহারা। আমাদের বুকের ভেতর ক্ষয়ে যেতে থাকবে স্মৃতির সৌধ। জেগে উঠতে থাকবে আলোকবর্ষ পথ।
আমরা দূরে চলে যাবো বিবর্ণ মেঘ, ধূসর কুয়াশা কিংবা দিগন্তরেখার মতো। দূর থেকে দূরে। আরও দূরে।
আমাদের আর কখনোই দেখা হবে না। কথা হবে না।
প্রাচীন রোম, গ্রিস, মেসোপোটেমিয়া, কিংবা মহেঞ্জোদারোর মতো আমাদের ঝলমলে দিন, সৌকর্য ক্রমশই ঢেকে দিতে থাকবে সময়ের অমোঘ আলখাল্লা। বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে থাকবে আলো। নেমে আসতে থাকবে অন্ধকার। আমাদের দগদগে বেদনার ক্ষত হয়ে উঠতে থাকবে ক্রম ক্ষয়িষ্ণু দাগ। আর আমরা সময়ের ধূলোয় ঢেকে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক পাথরের মূর্তি, নির্বাক।

আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।
যেখানে শেষ দেখা সেখানে পড়ে থাকবে পুরনো আতরের ঘ্রাণ, টুকরো হৃদয়, অনন্ত বিচ্ছেদ।
আর ক্রমশই জেগে উঠতে থাকবে অলঙ্ঘনীয় দূরত্বের প্রাচীন প্রাচীর।

৩.
মানুষ বড় অভিমানী প্রাণী।
সে চায়, তার মন খারাপ হলে প্রিয় মানুষটাকে না বললেও সে বুঝে ফেলুক। ফোন করে খানিক ম্লান গলায় ‘হ্যালো’ বলতেই ওপারের মানুষটা বলুক, ‘তোমার মন খারাপ?’

তার এলোমেলো চুল, খানিকটা লাল চোখ দেখে বলুক, ‘তোমার ঘুম হয় নি রাতে? দুঃস্বপ্ন দেখছ? টেনশন করছ কিছু নিয়ে?’
সে চায়, মানুষটা বুঝুক, কখন শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরতে হয়, চোখের সামনে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বন্ধ করে দিতে হয় চোখের পাতা।

সে চায়, মানুষটা বুঝুক, কখন হাতের মুঠোয় হাত রাখতে হয়, ফিসফিসিয়ে বলতে হয়, ‘আমিতো আছিই। তবে? মন খারাপ কেন?’

সে চায়, মাঝরাত্তিরে সে টের পাক, পাশের মানুষটা তার মাথার নিচের সরে যাওয়া বালিশটা ঠিক করে দিচ্ছে। শেষ রাতে যখন খানিক হিম নামে, তখন জড়িয়ে দিচ্ছে ওম চাদরে।

সে চায়, তার জন্য মাঝরাত্তিরেও কেউ বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকুক। মনে রাখুক তার জন্মদিনের কথা, প্রথম দিনের কথা, স্পর্শ ও অনুভূতির কথা।

সে চায়, তাকে ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে কেউ মিথ্যেমিথ্যি অজুহাত বানাক। কেউ কপাল ছুঁয়ে বলুক, ‘দেখি, দেখি, তোমার জ্বর নয় তো?’

অভিমানে দূরে সরে যেতে চাইতেই কেউ বলুক, ‘খানিক ভুল করেছি বলেই দূরে সরে যেতে হবে? তবে এই যে এতো ভালোবাসি, তাতে আরও কাছে আসা যায় না? আরও আরও কাছে? অনেক অনেক কাছে?’

মানুষ বড় অভিমানী প্রাণী।
তারা দুজনই কেবল ভাবে, এসবই ওই মানুষটা করুক। ওই অন্য মানুষটা।
কিন্তু শেষমেশ করা হয় না কারোই। তাই কাছে আসার রঙ্গিন দিনেরা ক্রমাগত দূরে যাওয়ার ধূসর, বিবর্ণ গল্প হয়।
মানুষ বড্ড অভিমানী প্রাণী।

অভিমানে সে ক্রমশই দূরে চলে যায়।
বুকে পুষে রাখে এক সমুদ্র আক্ষেপ।

৪.
এই যে অসংখ্য মানুষ ফেলে আমি চলে আসি তোমার কাছে,
অজস্র পথ রেখে চলে আসি তোমার পথে,
এই যে জগতের সব প্রাপ্তি উপেক্ষা করেও আমি অপেক্ষায় থাকি তোমার।

তুমি কি তা বুঝতে পারো?

এই যে জলের মতন আমার বুকেও ছলাৎছলাৎ শব্দ হয়,
এই যে মেঘের মতো আমার বুকেও বিষাদ জমে।
এই যে বৃষ্টির মতো আমার চোখেও কান্না হয়।

তুমি কি তা বুঝতে পারো?

এই যে অগণন ঠিকানা রেখেও আমি চিঠি লিখে যাই তোমার ঠিকানায়,
অগুনতি আনন্দ ফেলেও আমি দুঃখ পেতে যাই তোমার কাছে।
এই যে অসীম আকাশ ফেলেও আমি বন্দি হতে চাই তোমার খাঁচায়।

তুমি কি তা বুঝতে পারো?

জানি পারো না, তাতে দুঃখ নেই আমার।
কারণ, ভালোবাসা কিংবা দুঃখতো জানেই, এ সিঁড়িতে পথ নেই নামার!

৫.
এই যে সন্ধ্যা, তারার আকাশ, রাত্রির রঙ জানে
কাছের মানুষ দূরে সরে যায় কী গোপন অভিমানে!
আমরা জানিনা শুধু
মেঘের ওপর মেঘ জমে জমে দূরত্ব বাড়ে ধু ধু।
ধূসর কুয়াশা মুখ ঢেকে দেয়— ধুলো মোছে পদচিহ্ন,
আমরা জমাই হিসেবের খাতা, কার ক্ষত কত ভিন্ন!

অথচ জীবন জানে—
দূরে যাওয়া মানে কাছে আসবার শপথ সঙ্গোপনে।

৬.
এই যে এমন করে ফিরিয়ে দাও—

আমি চলে গেলে কে লিখবে কবিতা?

যদি বিদ্রোহ করে বসে চোখ, কাজল না বসে আর চোখে?
যদি ম্লান হয় ঠোঁট, কবিতার শোকে!

যদি নীল শাড়ি রঙ ভুলে যায়, উড়ে যায় সুগন্ধি চুল,
যদি মন হয় বরফের নদী, মৃত্যুর বিষাদে ব্যাকুল।

আমি চলে গেলে, জোছনায় কে হবে ভুল?
কে হবে ছায়ার মতো লীন— তোমাতে আকুল!

এই যে ফিরে যাই অবহেলা বুকে, ফিরে চাও?
ডেকে বলো— থাকো? তুমি ছাড়া কিছু আর নেইতো কোথাও!

কবিতার খাতা যদি ফাঁকা থাকে, ফাঁকা থাকে মন,
আমি ছাড়া তুমি, তোমার কাজল চোখ, বাঁচে কতক্ষণ?

এবার ফিরাও তবে, আমাকে হে নারী,

আমাতেই বেঁচে আছো তুমি, আমাতেই বাড়ি।

তবে, আবার কবিতা হোক,
বুকে বুকে জাগুক আবার,
একজোড়া মায়াবতী নদী—
তোমার কাজল চোখ।

৭.

তোমার জন্য যতটা পথ হেঁটেছি, ততটা পথ হাঁটলে—
আমি পৌঁছে যেতে পারতাম জেরুজালেম,
আমার প্রিয়তম শহর।
তোমার জন্য যতটা রাত কেঁদেছি,
ততটা কান্নায় আমি ছুঁয়ে দিতে পারতাম মেঘ,
বরষায় ভিজিয়ে দিতে পারতাম তৃষ্ণার্ত সাহারা।
যে দহনে রোজ পুড়ে গেছি,
তাতে জ্বেলে দিতে পারতাম অজস্র-গনগনে ভিসুভিয়াস।
যতটা তৃষ্ণায় গুনে গেছি অপেক্ষার প্রতিটি প্রহর
ততটা মেটাতে পারে সাধ্য নেই সাইবেরিয়ার।

যতটা ডুবে গেছি রোজ, যতটা উবে গেছি রোজ,
যতটা ভেসে গেছি চুপ, যতটা বেহিসেবি ডুব,
সবটাই মিশে গেছে ওই।

তোমাকে পাওয়া হলে দেখি
এই আমি, সেই আমি নই।

৮.

আবার বৃষ্টি এলে একটা নদী কিনে ফেলব, কিনে ফেলব ছই আর বৈঠাবিহীন একখানা নৌকোও। জলের ভেতর খইয়ের মতন ফুটতে থাকা বৃষ্টিফোটার দিকে তাকিয়ে আমার হয়তো ডুবে যেতে ইচ্ছে করবে। ডুবে যেতে ইচ্ছে করবে জলের গভীর শরীরে। সেখানে নদী। সেখানে অন্ধকার। কিন্তু পৃথিবীতে ঝপ করে নেমে আসা গাঢ় বনের মতন অন্ধকার আকাশ হঠাৎ থমকে যাবে নৌকার গলুইয়ে। সেখানেও ভিজে যাচ্ছে আকাশ, কিংবা সেখানে ভিজে যাচ্ছো তুমি। তোমার কিংবা আকাশের মতন ভিজে যাচ্ছে শাড়ির আঁচল। নীল।

আমার তখন সেখানেও ডুবে যেতে ইচ্ছে হবে।

ডুবে যেতে ইচ্ছে হবে বেপরোয়া ঢেউয়ের মতন, মাতাল ঝড়ের মতন কিংবা মেঘ বা বৃষ্টিরর মতন। আমার তখন ডুবে যেতে ইচ্ছে হবে। খুব। আমি হয়তো তখন সত্যি সত্যিই ডুবে যাবো। নদীতে কিংবা নারীতে। নারীতে কিংবা নদীতে।

শুনেছি নদীই নারী, কিংবা নারীই নদী...

৯.
কখনো কখনো আমার খুব কথা কইতে ইচ্ছে হয়,
কিন্তু মানুষ মেলে না।
জগতে কথা কইবার মানুষের খুব অভাব।

অন্ধকারের মতন গাঢ় এবং গভীর মানুষ
আলোর মতন অকপট ও অপার মানুষ
বৃক্ষের মতন শান্ত, সহজ ও স্থির মানুষ
নদীর মতন জলজ ও গভীর মানুষ।

আমি তাই পথের সঙ্গে কথা কই—
নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে সে আলগোছে বুকে পুষে রাখে মমতায়,
অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই- সর্বংসহা মায়ের মতন।
কথা কই অন্ধকার ও আলোর সঙ্গে, নদী ও বৃক্ষের সঙ্গে,
একটা জনমজুড়ে বন্দি পাখির মতো খুঁজে ফিরি ইচ্ছের ডানা মেলে উড়ে চলবার অসীম আকাশ।

আমাদের প্রত্যেকের বুকের ভেতর সংগোপনে থেকে যায় আমাদের ব্যক্তিগত নদী ও বৃক্ষ, আলো ও অন্ধকার, পথ ও আকাশ। আমরা সেই একাকী পথে হেটে যেতে যেতে কথা কই। আমাদের সঙ্গী হয় এইসব একাকীত্ব।

কারণ, আমাদের কথা কইবার মানুষ মেলে না,
জগতে কথা কইবার মানুষের খুব অভাব।

১০.
তোমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে,
একটা দোয়েল একটা চড়ুই পাখি,
খানিকটা পথ উড়েই এলো,
কুড়িয়ে নিল খানিক বিষাদ জমা।
তোমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে,
শিমুল ফুলের একটা নবীন কুড়ি,
পড়ল ঝরে অকাতরে,
উতল হাওয়ার বুকের ভেতর কে সে প্রিয়তমা?
তোমার জন্য অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে,
মেঘ বলেছে খানিক আঁধার ঢেলেও,
বৃষ্টি আসুক আর কিছুক্ষণ পরে।
তোমার জন্য অঝর অশ্রু জলে, একটা জনম কাটিয়ে দিলাম বলে,
এই পৃথিবী হাজার বছর ধরে,
নদীর নামে নারীর কথা বলে।

আনিসুর রহমান

পাঁচটি গদ্যকবিতায় পাঁচটি গল্প

এক

মন খারাপের বেলা

বাবা, আচ্ছা তুমি কি ছোট সময় এমনটাই ভেবেছিলে?
কেমনটা মা?
এই যে পড়াশোনা করে বড় হবে, ভালো একটা চাকরি নিবে, স্যুট টাই পরে অফিসে যাবে।
আমাদের যখন যা দরকার সব কিনে দিবে,
এই যেমন সুন্দর জামা কাপড়,
খেলনা,
ঘুরতে নিয়ে যাওয়া।
ফ্যান্টাসি পার্কে নিয়ে যাওয়া।
উড়োজাহাজে চড়ে বিদেশে যাওয়া।
এই আর কী, আমরা অনেক ভালো আছি তাই না বাবা?
আমাদের কোনোই সমস্যা নাই।
কিন্তু তারপরও আমার মন খারাপ থাকে কেন বাবা?
তাই তো কেন মন খারাপ থাকে মা?
বলো তো।
বাবা আমিও ঠিক ঠিক বের করতে পারি নি কেন মন খারাপ থাকে?
পুতুলগুলোকে তো জিজ্ঞেস করে লাভ নাই।
ওগুলো তো কথাই বলে না।
মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা বললো এরে পাকাবুড়ি পাকামো না করে পড়তে বস।
তোর বাপ এলে তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস।
এটা তো চিন্তার বিষয়।
তুমি সবকিছুতেই চিন্তার কথা বলো।
আচ্ছা তোমার মা, তোমার বাবা কী তোমাকে শুধু চিন্তা করতেই শিখিয়েছে?
চলো খাবার টেবিলে যাই, তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টা আলোচনা করি।
ঠিক আছে, তার আগে এখানে একটু বস।
আমার কী মনে হয় বাবা— দাদুকে বা নানুকে জিজ্ঞেস করলে ওঁরা একটা সুন্দর বুদ্ধি দিতে পারতো
কেমনে মন ভালো রাখা যায়।
ধেৎ।
ওরা এখানে থাকলে তো মন এমনিতেই ভালো হয়ে যেত।
মন খারাপের সময়ই পেতাম না।
তুমি কি ওদের দুজনকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে পারো?

আমরা তিনজনে এক খাটে ঘুমাতাম, আমি মাঝখানে।
আর সারাদিন কি যে মজা করে কাটাতাম।
মজা আর মজা।
আমাদের ক্লাসের সবাইকে ছুটির দিন আমাদের বাসায় দাওয়াত করে নিয়ে আসতাম।
আর ওদেরকে দেখতাম আমার দাদু নানু কত কী মজা দেয়, মজার মজার গল্প করে।
আর ওদেরকে নানুর আর দাদুর হাতের মজাদার খাবার খাওয়াতাম।
এরপরে ওরাও ওদের দাদু নানুদের নিয়ে আসতো আমার দেখাদেখি।
এবার চলো মার সঙ্গে কথা বলা যাক।

দুই
আমার মায়ের সারাদিন

বাবা, আচ্ছা আমাকে বলো তো তোমরা বড়রা সারাদিন অফিসে কী করো?
আমরা যেমন স্কুলে সারাদিন খেলাধুলা করি, ক্লাস করি।
স্যারেরা, ম্যাডামেরা আমাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।
আর যারা বাজারে যায় দোকানে যায় কেউ দোকান করে কেউ জিনিসপত্র কিনে।
বাসের চালক বাস চালায়, হেলপার হেলপারি করে।
কন্ডাক্টর বাসের ভাড়া নেয়।
আর বাসায় যারা থাকে ওঁরা তো বাসার কাজকর্ম করে অনেক।
ধরো রান্নাবান্না, কাপড়চোপড় গোছগাছ করে রাখা আরও কত কী যে কাজ।
মা তো সারাদিন কাজ আর কাজের উপর থাকে।
যখন একটু সময় পায় আমার পেছনে লেগে পড়ে।
এই এইদিকে আয় তো বুড়ি, সারাদিন স্কুলে কী পড়লি কী করলি বল তো সোনা।
এসব করে করে দিন চলে যায়।
মা ঘুম থেকে উঠে সবার আগে, আর ঘুমাতে যায় সবার পরে।
যেদিন একটু কাজ কম থাকে তখন বই নিয়ে বসে।
আর মাঝে মাঝে হেসে উঠে।
আমি তখন জিজ্ঞেস করি কেন হাসলে?
মা বলে বইয়ের ভেতরে মজার একটা ঘটনা।
তখন আমি বলি আমাকে বলো, আমাকে বলো।
তখন মা আমাকে কাছে টেনে চাইপা ধরে আদর করে কপালে একটা চুমু দিয়ে বলে—
এটা বড়দের গল্প ছোটরা শুনে মজা পাবে না।
এরপরে তোমার বাবার সঙ্গে আমরা যখন তিনজনে বাইরে যাবো তোমার জন্যে মজার মজার গল্পের বই কিনবো।
আবার কখনও খুব গভীর মনযোগ দিয়ে বইয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে মা।
আমি যেই বলি, এই মা তুমি কি মন খারাপের বই পড়তেছো?
তখন মা বলে, এই বুড়ি তুই বুঝলি কেমন করে?
না তুমি যেভাবে ডুবে গেছো, চোখেমুখে কেমন যেন মনখারাপের মতো মনে হল।
মন খারাপ ঠিক না।

ক্লাইমেক্স।
যেই বললাম ক্লাইমেক্স কি গো মা?
তখন মা বলে কি, ক্লাইমেক্স থেকে বের হই তারপর শুনিস, অথবা তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।

তিন
মাছ ধরা বাবা

বাবা, তুমি কী কখনো জলে নেমে মাছ ধরেছো?
এই ধরো, জমিনে জল সরিয়ে; একটা জমিনে জল আছে—
সেই জল সরিয়ে ফেললো, কোনটা মেশিন দিয়ে আবার কোনটা নিজেরাই কীভাবে যেন কায়দা করে।
মা আমাকে গ্রামের প্রকৃতি জল পাখি এসব বিষয়ে বলতে গিয়ে সুন্দর একটা ছায়াছবি দেখিয়েছে আজকে।
বাবা, তুমি যদি দেখতে কী যে মজা পেতে।
তুমি একটা মিস খেয়েছো।
মাকে বলে দেখবো তোমাকেও যদি এই ছবিটা দেখায়।
আর তুমি যে ব্যস্ত।
তোমার মা কী তোমাকে বড় হয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকতে বলেছিলো?
আচ্ছা, ছায়াছবিটা দেখতে দেখতে কী ভেবেছি জানো?
তুমি যদি ছায়াছবির ওরকম মাছধরার মতো কোনো বাবা হতে, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে জমিনে নেমে অনেকগুলো মাছ ধরতাম।
আর মাকে বলতে তুমি পাত্রটা ধরে রাখো আমি মাছগুলো ধরে ধরে পাত্রে রাখছি।
সে কী আর হবে এখন?
দাদুর সঙ্গে দেখা হলে বলবো তোমার ছেলেটাকে কী শিখিয়েছো?
তোমার ছেলেকে কী একটা বানিয়েছি শুধু অফিস আর অফিস।
এইটা কিছু হলো?
পৃথিবীতে কত কাজ ছিল যেমন ফেরিওয়ালা, ঘুড়িওয়ালা, মাছ ধরা, তারপর বনের কাঠুরে এসবে কী যে মজা!
দাদুকে বলবোই বলবো : তোমার ছেলেটাকে অন্তত মাছ ধরাটাও শেখাতে পারোনি কেন?

চার
বিজ্ঞানী হবার মজা দেখাচ্ছি

বাবা, একটা সমস্যায় পড়েছি।
মনটা ভালো নাই।
মাকে যে বলবো, সে সুযোগ নাই আজকে।
মা রান্নাবান্না আর এতো সব কাজ করে কখন যে সোফায় এসে একটু বসবে;
আর বলবে কইগো আমার বুড়িটা, আমার পরীটা, এইদিকে একটু আসো তো।
সে এখনো অনেক দেরি।
বাবা তোমার ছবিটা যদি কথা বলতে পারতো।
তাহলে ছবির বাবাটাকে বইয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতাম।

বিজ্ঞানীদের নিয়েও আমার মন খারাপ।
ওঁরা অনেক কিছু আবিস্কার করেছে—
রেলগাড়ি
উড়োজাহাজ
চাঁদে যাওয়ার রকেট
টেলিভিশন
রেডিও
মোবাইল
আরে এগুলো সবগুলো তো বড়দের জন্যে।
ছোটদের জন্যে কিছু খেলনা ছাড়া আর কি করেছে?
ছোটদের মন ভালো করার জন্যে বিজ্ঞানীরা করলোডা কী?
এই যেমন এখন যদি বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করতো ছবির বাবাও কথা বলবে।
তাহলে ছোটরা বাবাদের ছবি বইয়ের ভেতরে নিয়ে স্কুলে যেত।
দারুন একটা ব্যাপার হতো।
তারপর মানুষ মরবে কেন?
মানুষ নাকি মরে আকাশে চলে যায়।
মানুষ নাকি মরে ভগবানের কাছে যায়, আল্লার কাছে চলে যায়।
ভগবান, আল্লা ওঁরা নিজেদের কী মনে করে?
কথা নাই বার্তা নাই, ওঁদেরকে দেখাও যায় না কখনো।
ওঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে আর এক একটা মানুষ নিয়ে নিবে?
আমার নানুকে নিয়েছে দাদুকে নিয়েছে।
এরকম অনেককেই নিয়েছে।
আমাদের ক্লাসের অনেকের অনেককেই নিয়েছে।
এমন কি কখনো মাকে বাবাকেও নাকি নিয়ে নেয়।
কী খারাপ কথা?
না না ভগবান আল্লা ওদেরকে তো পাওয়া যায় না।
যদি পাইতাম, তাহলে একদম সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম
তোমরা নিজেদের কী মনে করো?
তোমরা কী পেয়েছো?
এটাই কী তোমাদের ভগবানগিরি আর খোদাগিরি?
খবরদার আর কোনো মানুষ নিবে না কিন্তু!
বিনিময়ে তোমাদের সুন্দর সুন্দর ছড়া শোনাবো।
আর বিজ্ঞানীদের বলে দেব এমন কিছু একটা আবিস্কার করো মানুষ যেন না মরে।
আর ওঁরা যদি এটা না পারে, ওদের বলে দিবো তোমাদের বিজ্ঞানী থাকার দরকার নাই
তোমরা বরং অন্যকিছু করো, এই যেমন গান কর, মাছ ধর, নাচ শেখো, খেলাধুলা করো।
আমি একটু বড় হয়ে নিই তোমাদের বিজ্ঞানী হবার মজা দেখাচ্ছি।
আমি তখন বিজ্ঞানী হয়ে মানুষের মরে যাওয়া ঠেকিয়ে তোমাদের বোকা বানিয়ে দিবো।
তখন তোমাদের বোকা বোকা মুখের ছবির উঠিয়ে তোমাদের বাসার বাচ্চাদের কাছে পাঠিয়ে দিবো।

তোমরা এমন ডস খাবে!
তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

পাঁচ
তক্কোবাজ মেয়ে

বাবা, আমার খুব মন খারাপ কাকে যে বলি?
তুমি তো থাকো সারাদিন অফিসে।
তুমি তো আবার ছবি বাবা।
ছবি বাবা তো আর কথা বলে না।
মা আমাকে বলেছে, তুমি একটা তক্কোবাজ মেয়ে।
আমি তো তক্কো করিনি।
আমি শুধু আমার মনের প্রশ্নগুলো মাকে বলেছি।
তাহলে শুনো, আমাদের বাসার বাউন্ডারির বাইরে পিচ্চিগুলো যদি যখন ইচ্ছে খেলতে পারে,
আমি খেলতে পারবো না কেন?
মা বলে, তুমি বাসার ভেতরে খেলনা নিয়ে খেলো।
তোমার তো অনেক খেলনা।
আমি বলেছি, এই খেলনাগুলো নিয়ে বাইরে গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলি।
মা বলে, বাইরে যাওয়া যাবে না, তোমাকে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে।
ওদেরকে যদি ছেলেধরায় না নেয় আমাকে নিবে কেন?
আমি ছেলে ধরার সামনে গিয়ে ওর শার্টের মধ্যে টান দিয়ে বলবো, আমাকে নিতে আসবে না।
তোমাদের বাসায় যদি বাচ্চার দরকার পড়ে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসো।
আমার মা আমাকে তো হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছে।
জানো বাবা, আমি মাকে কত্ত করে বললাম বাইরের বাচ্চাগুলোকে আমাদের বাসায় ডেকে নিয়ে আসি।
ওদের সঙ্গে আমার খেলনাগুলো নিয়ে একসঙ্গে খেলি।
মা তাতেও রাজি না।
মা বললো, ওরা যদি যাবার সময় তোমার খেলনা নিয়ে যেতে চায়।
আরে, নিতে চাইলে দুই একটা নিবে।
আমার তো অনেক খেলনা।
আমার কত আঙ্কেল আন্টি, দাদু নানু, সবাই তো আমার জন্যে সবসময় খেলনা কিনে দেয়।
আমার নানু তো বলেছে, দরকার হলে পুরো খেলনার দোকানটাই আমাকে কিনে দিবে।
ভালোই হয়েছে, এখন থেকে সবাইকে বেশি বেশি খেলনা কিনে দিতে বলবো, আর ওখান
থেকে বাইরের বাচ্চাদের দিয়ে দিবো।
আমি এসব নিয়ে মা'র সঙ্গে যখন জেদাজেদি শুরু করেছি।
তখন মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে চাইপা ধরে কপালে চুমু দিয়ে বলে, এই যে সোনা বুড়িটা পরীটা, এখন কিছু একটা খেয়ে নাও !
তোমার বাবা বাসায় আসুক তারপর এসব নিয়ে তিনজনে মিলে জমিয়ে গল্প করবনি।
তুমি যা চাইবে, তাই হবে সোনা।

বীথি চট্টোপাধ্যায়

গুচ্ছ কবিতা

শোক

(কোভিড অনেক কিছু নিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।
পৃথিবীকে হয়তো কিছুটা বদলেও দিয়ে গেছে সে।
এই অতিমারীতে যাঁদের জীবন থেমে গেল, তাঁদের
মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁদের বয়স যাইহোক,
জীবনের মঞ্চে তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। অনেকেই কাজ
করতে করতে চলে গিয়েছেন। তাঁরা কি খুব সহজে
মুছে যাবেন পৃথিবী থেকে?)

দ্বিতীয় ঢেউ

একটি মেয়ে ইশারা হয়ে পার্কস্ট্রীটের মোড়ে
দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতের ভেতর দিকে সরে,
কিন্তু তার দেখা পায়না পথচারীর চোখ
তার কথা কি ভুলেই গেল তামাম ইহলোক?

খবর ছুঁয়ে তুফান তোলা কোন সাংবাদিক?
অফিস থেকে ফেরার পথে এসে দাঁড়ান ঠিক,
ঘুমিয়ে পড়া গড়িয়াহাটের মোড়ে
শিশিরভেজা সদ্যফোটা ভোরে,
কিন্তু তার দেখা পায়না পথচারীর চোখ
তার কথা কি ভুলেই গেল সমস্ত দর্শক?

দুজন নার্স নিঃশব্দে বসে, শূন্য চেয়ার
গাছের পাতা পড়ছে খসে খসে।
পর্দা ওড়ে ; যে ডাক্তার ক্লান্ত মুখ
একঝলক ;সে মুখ জুড়ে শুধু অসুখ।
ওদের দেখা কেউ পায়না আর
ওদের কথা ভুলে গিয়েছে জগৎ সংসার?

দোকান রোজ সময় মতো খোলে
দোকানে বসে প্রৌঢ় কেউ এসে
কার ছবিতে ফুল দিয়েছে কারা?
কে চলে গেছে দিগন্তের দেশে?
দোকানে বসে তাকিয়ে থাকে দূরে
বিসমিল্লা সানাই বাজান করুণ কোনও সুরে
কিন্তু তার তাকিয়ে থাকা কেউ দ্যাখেনা ফিরে?
দোকান বন্ধ হবার পরে,সকলে ঘরে ফিরেছে ধীরে ধীরে।

ডালাওসিতে অফিস চত্বরে,
রাতের দিকে রোজ কে এসে ঘোরে?
কী দেখতে সে শেষপ্রহরে আসে?
কেমনভাবে গেটের কাছে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে
ঘাসে?
কিন্তু তাকে কেউ দ্যাখেনা, জলফোয়ারা ছাড়া

মধ্যরাতে ঘুমিয়ে থাকে এই অফিস পাড়া?

পার্টি অফিস আগের মতো নেই
সেখানে সব আজকে নিশ্চুপ,
কেউ-ই তাকে খেয়াল করেনা
কিন্তু সব শূন্য লাগে খুব।
সবাই রাতে যে যার মতো ফেরে
একটি লোক সত্যি থাকে দুয়ারে কড়া নেড়ে,
কিন্তু তার কড়া নাড়ার শব্দ শোনে কে?
তার কথা কি ভুলেই যাবে দলের সকলে?

মঞ্চ জুড়ে আলো, আলোর ঢেউ ঘুরছে মনে মনে
কলাকুশলী গায়ক সব দাঁড়িয়ে আছে স্টেজের পাশে
অন্ধকার কোণে।
নতুন করে চলছে থিয়েটার, বাজছে সুর, বাজছে গান
কত।
তাদের কেউ মনে রাখেনি, স্টেজের পাশে অন্ধকার
অভিমানের মতো।

থানার কাছে তাকে, দেখা যায়না
তবুও সেতো উর্দিতেই থাকে।
দুটো কুকুর এগিয়ে যায়, খুঁজে পেয়েছে কাকে
থানার কাছে এখনও সেতো উর্দিতেই থাকে।
পাঁচিল থেকে পাঁচিলে নামে মৃদু অন্ধকার
তাকে কি কেউ মনে রেখেছে এই শহরে আর?

পাড়া কাঁপানো নিছক মস্তান
ছিলনা কোনও উপাধি সম্মান
পকেটে ছুরি, বেশি কথায় আর কী দরকার?
এলাকা যেন থমকে যেত ছায়া দেখলে তার।
এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে গলির মোড়ে সে
কিন্তু তাকে ভয় করবে এমন বোকা কে?

টালিগঞ্জে ক্যামেরা রোল হলে,
ছায়ার মতো কে সরে আসে? বাতাস পথ ভোলে।
আলোকময় কল্লোলিনী ঘরে,
দিনরাত্রি পেরিয়ে এসে; নতুন কেউ চিত্রনাট্য পড়ে
কিন্তু ওই আলোতে তাকে দ্যাখা যায়না আর
মানুষ ঠিক মনে রাখবে অপুর সংসার।

কবি কি তাঁর চেয়ারে বসে গোধূলি-আলো মাখেন,
বইপত্র ভরা বিধুর শূন্য ঘরটাকে
আরও শূন্য লাগে তখন...
যখন তিনি এসে,
নিঃস্তব্ধ বসে থাকেন সেই বই-এর দেশে
কিন্তু তাকে দ্যাখেনা কেউ, চারপাশের লোক
তার লেখা কি মনে রাখবে অগুন্তি পাঠক?

বাৎসরিক

কোথাও কি আর দেখা হয়ে যাবে
কেউ কি কোথাও থাকে?
সূর্যের আলো ঝিকমিক করে
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

ধুলো ঝেড়ে কত গুছিয়ে রেখেছি
হারিয়ে গিয়েছে বলে,
নদীর ঢেউতে এ-জীবন ভেসে
বহুদূরে গেল চলে।

এমন বৃষ্টি তখনই নামলো
পথে ফুল ছিল পড়ে;
কোথাও আবার দেখা হয়ে যাবে
কোনও ছায়াপথ ধরে...

চরণ চিহ্ন

বকুল ঝরেছে ছোট্ট চাতাল জুড়ে
রোদ ওঠে যেন বিসমিল্লার সুরে।

আকাশের কোন ঠিকানায় চিঠি আসে?
সেই ঠিকানা কি খুব সাদা ফুল ভালবাসে?

ফুল পড়ে থাকা পথ ধরে চলে যাওয়া,
পৌঁছেও দেখে বাকি কতকিছু চাওয়া।

উঠোনে অতিথি ক্ষণিকের আলপনা,
তারায় তারায়; মেঘে মেঘে আনাগোনা।

যে তারা প্রয়াত, সেও আলো নিয়ে আসে,
সেই আলো বুঝি সাদা ফুল ভালবাসে?

অতিথি

গতি মুছে দিয়ে ; এসে পৌঁছল ট্রেন
সহযাত্রীরা কেউ তো আপন নয়।
কোনও কলরব কোথাও থাকবেনা?
জন্মানো মানে এতবড়ো পরাজয়?

কথায় কথায় দূরে দিন ঢলে পড়ে
কোথা থেকে এত কথা এসে যায় মনে?
কলকাতা ফিরে দেখা হবে একদিন-
আগে থেকে সব ঠিক করে নেব ফোনে।

পৌঁছে গেলে তো আলাদা হতেই হবে
কেউ আটকাতে পারবেনা জোর করে।
কিন্তু কখনও যদি মনে পড়ে যায়
চলে এসো দূর কুয়াশার পথ ধরে...

কোনও কলরব কোথাও সেখানে নেই
প্রদীপ নিভিয়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ;
গঙ্গার জল সবই নিয়ে যায় তবু
কাউকে কখনও ভুলতে পারে কি কেউ?

জন্মানো মানে এতখানি ভেসে যাওয়া?
কে লিখছে এই অলীক জীবনধারা?
সব পড়ে থাকে সকলেরই জানা কথা
চশমা ও ঘড়ি অতল কূল-কিনারা।

নাসরীন জাহান

প্রেমের গল্প

ট্রেন ছেড়ে যেতেই ছুটতে ছুটতে সে এল,
পুরো স্টেশনে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার, ডাব, চা-গরম
ভিখারি, আর মানুষের গন্ধের গিজগিজ পেরিয়ে আমি তখনই এসেছি, অনেক দূর থেকে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে
কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে যখন তাকে কবুল বলতে শুনেছি।
সীমাহীন প্রেমে মোহে একটা সময় শরীর যখন পুড়ে ছাইছাই, তখন শুনেছি অন্য কারো প্রেমে আছে সে,
যতবার সেই দৃশ্য চোখের সমানে আসত,
মনে হত, বিষ খেয়ে মরে যাই। কলেজ পার হওয়ার পরে
অন্তর্মুখী সে আমাকে কাঁপিয়ে ছাড়খার করে বলেছিল,
ভালোবাসি।

মনে হচ্ছিল প্রকৃতির দোলনায় উড়ছি,
ভ্রমর আর বাতাসের গুঞ্জনে ঘুম নষ্ট আমি সারা রাত তার মোবাইলের নাম্বারের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।
ভীষণ নিয়ম মেনে চলা তাকে ফোন করতে ভয় পেতাম, কথা বলতে গিয়ে তোতলাতাম, নিজেকে সুন্দর করতে যত
সাজাতাম নিজেকে, বলত,
সাজ ছাড়াই সুন্দর লাগে তোমাকে।
আর? ভার্সিটির পরে সব, আগে ভালো রেজাল্ট করো।

প্রেমে পড়লে এত বুক পোড়ে কেন?
যেন শব্দ পেয়ে যায়,বলে তুমি
অনেক ইমোশনাল।

অরণ্যে উড়তো ঘাসফড়িং আর বাতাসে উড়ত, মরণ, মেঘের মরণ উড়ে উড়ে আমার বুক চেপে ধরত।
তার হাত যখন আমার ঠোঁট আর বুকে
মনে হতো, এ আমার শেষদিন হোক।

তুমি এত লতিয়ে পড়ো, তার এমন কথায়
কষ্ট আর দৃঢ়তাকে ক্রমশ আমি আমার মনের বাক্সবন্দি করতে থাকলাম। এরপর সে স্পর্শে এলেই ছিটকে যেতাম।
দূর থেকে যখন দেখতাম, সে আসছে, আমি অন্য কোথাও সরে গিয়ে বহুকষ্টে চোখের জল চেপে ধরতাম।

আগে ছিল আমার, এরপর তার ঘনঘন ফোন করা বেড়ে গেল। বুঝে গেলাম, যে যত পাত্তা কম দেয়, তার প্রতি
আকুলতা
অন্যের বাড়তে থাকে। আসলে প্রেমেরও ভারসাম্য রাখতে

হয়, এ বুঝতে সময় লেগে গিয়েছিল আমার।

ফোন পেলেই অস্থির হয়ে ধমক দিত,
কোথায় থাকো তুমি?
অন্য কারো প্রেমে পড়েছ?
নাহ!
তো?
আর পারলাম না। এরপর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আমাকে
পাগলের মতো আঁকড়ে ধরে যখন আমরা স্বর্গের পথে হাঁটছি, যেন হুঁশ এল আমার,যেই তাকে ছিটকে ফেলতে যাব,
উল্টো সে আমাকে ধাক্কা দাঁড়িয়ে বলল, তুমি এইভাবে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারো?

বহু বছর তার জন্য একতরফা প্রেমে পুড়ে পুড়ে তাকে পাওয়ার পরে এমন যখন অবস্থা, মা বলল, এর পরিণাম যদি
বিয়ে হয়, জীবনেও টিকবে না। প্রেমে পড়লে নিজেকে সরলভাবে
মেলে ধরতে এখনি যদি ভয় পাও, টিকবে না। ভালোবাসা পারস্পরিক প্রায় সমান হতে হয়।

এরপর চাকরি নিয়ে তাকে কিছু না বলে মার ভরসায়
দূরে চলে যাই। মোবাইল নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ সব পালটে।

অদ্ভুত পাহাড়ের সাথে চলত আমার একা
কথাবার্তা আর অবচেতন অপেক্ষা।
কতবার মনে হয়েছে, তার সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে বলি, আমি এমনই, কিন্তু আমি পাগলের মতো ভালোবাসি।

এরপর মা-র মুখে যখন শুনেছি আমাকে অনেক
খুঁজছে, এক পর্যায়ে কিচ্ছু না জেনে মা র হাত ধরে তার
বিয়ের আয়োজনে যাই।
বিয়ে শেষে যেন আমার দুপা পাহাড়েরর মতো স্তব্ধ হয়ে গেল।
পুড়িয়ে গেল চোখ আমার ফুরিয়ে গেল চোখ,
মা আমাকে চেপে ধরে টিকিট আমার হাতে টিকিট ধরিয়ে দিয়ে
বলল, আমি চাইছিলাম, দৃশ্যটা তুই দেখ। আমি
বড় একলা রে,তুমি এখানে এসে আরেকটা কাজ খোঁজ।
আমি ছুটতে ছুটতে ট্রেনে এসে উঠি।

তাকে হঠাৎ দেখে প্রথমে ভাষা হারিয়ে
ফের ব্যাগ থেকে আয়না বের করি,

তুমি মনে করো, তোমার দোষ নেই?
ছুটতে ছুটতে বলে সে,

আমি বললাম, যাও,
এই যে ছুটছি, এ কার জন্য?
তোমার ইগো হার্ট হয়েছিল,বলে আমি জানালায় হাত দিই,
হাঁপাতে থাকে সে, কতদিন যোগাযোগ করোনি, পাত্তা দাওনি, এজন্য তোমাকে শিক্ষা দিতে আমি বিয়ে করেছি।
তুমি বুঝতে পারছ না?

আশপাশের মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।
ধীরে ধীরে অনেকদূরে সে চলে যায়।
বহুদিন পরে বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্ত শীতের বাতাস বইতে থাকে। কানে জাগতিক ঠুসি ঠেলে শুনতে থাকি,
তুমি যাকে ভালোবাসো, চোখের জলের বাষ্পে ভাসো,

কোনো সমস্যা?
একজন তরুণ মাথা বাড়ায়,
বলি, নাথিং।
আমি জানালা বন্ধ করে দিই।
চশমা মুছে বলি, তাহলে জানালা খুলে দিই? বহুদিন পরে অন্য
কারো চোখ দেখি, আপনি পাহাড় থেকে
এই অব্দি আমার পিছু নিয়েছেন? গান খুলে বলি,
সে চারপাশের মানুষজন দেখে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে,
বলে, আমি নিয়মিত এই ট্রেনে যাতায়াত করি।
ওহ!
তো? জানালা?
খুলে দিন।

কী যন্ত্রণা

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেটা সম্ভবত ১৯৮৩। পত্রভারতীর কলেজ স্ট্রিটের অফিস, আমার সামনে দুজন। সাহিত্যিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর আত্মীয় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে একজন যোগ্য মানুষ খুঁজছি। কিছুদিন আগেই একটা গল্প প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'বুদ্ধ উদ্ধার' গল্পের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। পেশায় রাজ্য সরকারের অফিসার।

স্বপনদা বললেন, 'বুঝলে, তরুণকে কিশোর ভারতীর জন্য ভাবতে পার। যখন লিটল ম্যাগাজিন করতাম, বাছাই, ঘষামাজা তরুণই করত। ও এডিট করতে ভালোবাসে।'

প্রথম আলাপেই মানুষটাকে ভালো লেগে গেল। সোজাসাপ্টা মজার মানুষ। যদ্দূর মনে পড়ে, পরের মাস থেকে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হয়ে পড়লেন পত্রিকা ও প্রকাশনার সঙ্গে। যুক্ত বললে কিছুই বলা হয় না, খুব শিগগির তরুণদা কিশোর ভারতীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেলেন।

এর প্রধান কারণ—তরুণদার সততা আর নিরপেক্ষতা। নিজের লেখা ছাপার জন্যে তাঁর একফোঁটা হ্যাংলামি ছিল না, শুধু কিশোর ভারতী নয়, অন্য পত্রিকাতেও। ওই যে দপ্তরের মাথায় বসে 'আমি তোমারটা ছাপছি, তুমি আমারটা ছেপো', এই বিনিময় প্রথা তরুণদার কাছে চলত না! যে গল্প বা উপন্যাসটা পছন্দ হয়নি, সে যারই লেখা হোক, তরুণদা অনড়। বাবাকেও মুখের উপর বলে দিয়েছেন, 'দাদা, আপনার এডিটোরিয়াল বড্ড পলিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আজকাল। কিশোর ভারতী কোনও দলের কাগজ নয়।' আর আমাকে? কতবার যে লেখা বদল করিয়েছেন। আসলে উনি নিজের লেখার চেয়েও অন্যের লেখার এক দুর্দান্ত সমঝদার। প্রচুর পড়েন।

এডিটিং-এর কাজেও তরুণদা ছিলেন সাংঘাতিক নির্মম। আমাকেও যে কতবার তরুণদা বিপদে ফেলেছেন, কহতব্য নয়।

শারদীয়া বেরিয়েছে। এক ঘনিষ্ঠ লেখক-বন্ধু বই নিতে এসেছেন। আশি-নব্বই দশকে রেগুলার বড় হাউসের রবিবাসরীয়, বা ম্যাগাজিনগুলোয় লেখা বেরোত। কাছাকাছি থাকতেন। নিপাট সজ্জন মানুষ, সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। 'পত্রিকা কেমন হয়েছে দাদা?'

'খুব সুন্দর।... তরুণ আসেনি?'

'না, দাদা। তবে আসার সময় হয়ে গেছে।'

'দেখা করেই যাই। ওর তুলনা হয় না।'

তরুণদা যথারীতি হইহই করতে করতে ঢুকলেন। হাতে পত্রিকা। 'ওহ্! হাতে নিলেই দিল খুশ। অফিসে বসেই ছটফট করছিলুম, কতক্ষণে আসব! জব্বর হয়েছে, কী বলো?' বলতে বলতে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল লেখকের ওপরে, 'আরে—দা! কতক্ষণ এসছেন? ভালো হয়েছে না?'

'কী যে বলো! শারদীয়া কিশোর ভারতী ভালো হবে না? তবে হ্যাঁ, নিজের লেখাটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

‘অ্যাঁ—সে কী! খুঁজে পাচ্ছিলেন না? ’ আমি থতমত, ‘ক্-কেন দাদা? এ- এই তো--’

‘না—না, সূচিতে দেখেছি। তবে কথাটা হচ্ছে, ওটা কি আদৌ আমার লেখা? মানে আমি দিয়েছিলাম উপন্যাস হিসেবে... হাতে লেখা তেতাল্লিশ পাতা... যেটা বেরিয়েছে, সেটা চার পাতার একটা ছোট গল্প।’

‘হেঁ হেঁ— ’ তরুণদা মাথা চুলকে বললেন, ‘ব্যাপারটা কি জানেন দাদা, হঠাৎ করে এমন স্পেস ক্রাইসিস হয়ে যায় না, কী বলব! অ্যাকেবারে লাস্ট মোমেন্টে ত্রিদিব এসে হড়াম করে বলবে, এক্সট্রা অ্যাড এসে গেছে, পাতা চাই... হেঁ হেঁ, তখন বোঝেনই তো... এরম করে কত লেখা পুরো বাদ দিতে হয়... আপনি ঘরের মানুষ... তাই আমি ওর সঙ্গে বহুত টানামানি করে শেষ অব্দি— ’

‘হুম! বুঝেছি, তবে পুরোটা তুমিই লিখে দিতে পারতে তরুণ।’ তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ‘গল্পের নাম আর লেখকের নামটুকুই বলতে গেলে আমার!’

লেখক বেরিয়ে গেলেন, তরুণদা সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। নিজের টেবিলে বসতে বসতে সখেদে বলে উঠলেন, ‘ছাতার মাতা ! গেঁজিয়ে ফেনিয়ে পচিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যায়, সেই মাল লিখবে কিনা ডিটেকটিভ উপন্যাস? হুঁ—! পাঠক গালিয়ে ভূত করবে আমাদের। পইপই করে বললুম, ‘ছোট সফট গল্প দিন, তা না, উনি একখানা রহস্য উপন্যাস গজিয়ে দেবেন! ডিসগাস্টিং! গতবার দেখল, লেখাটা গেলই না, তাও’

‘তাই বেমালুম আমার ঘাড়ে তুলে দিলেন!’

‘আরে ভাই, আর কী রাস্তা ছিল? চট করে বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল, তাই বলতে পেরিছি। হাজার হোক আমাদের বন্ধু মানুষ, আবার বড় বাড়ির লেখকও !’

‘তরুণদা, আমার খুব আশ্চর্য লাগে, বড় বাড়িতে কত উঠতি লেখকের লেখা পড়ে থাকে, সেখানে এইসব গার্বেজ লেখা কী করে ছাপা হয়?’

‘হুঁ হুঁ, সে কি এমনি এমনি হয়! ও বাড়ির ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তার ছেলেকে উনি ফ্রিতে পড়ান। এক্সচেঞ্জ! বুঝলে, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। যদ্দিন সেই ছেলে স্কুলে পড়বে, তদ্দিন ওনার লেখা ওই হাউসে বেরুবে, তুমি দেখে নিও।’ তরুণদার এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছিল।

তবে সকলেই কি আর অমুক দাদার মতো! তরুণদার কাটাছেঁড়া করা বা আমন্ত্রিত লেখা ফেরত দেওয়া কি হাসিমুখে মেনে নেন? নব্বই শতাংশ প্রতিষ্ঠিত লেখক বা কবি মনে করেন (আমিও তার ব্যতিক্রম নই), তাঁরা যা লিখছেন, সেটাই সেরা।

দুটো ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমাদের আমন্ত্রণে তিনি শারদীয়া কিশোর ভারতীর জন্যে একটি গল্প জমা দিয়েছেন। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত লেখক। অনেক নামী প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর বই বেরিয়েছে, সরকারি–বেসরকারি পুরস্কারও পেয়েছেন।

অফিস থেকে ফিরে দেখি, তাঁর লেখা গল্পটা আমার টেবিলে। উপরে একখানা চিরকুট সাঁটা, উপরে x চিহ্ন, নীচে মুক্তাক্ষরে লেখা—এটা কিস্যু হয়নি। তরুণদার সই ও তারিখ।

মুহূর্তে আমি ঘেমে গেলাম, ছুটে গেছি পাশের ঘরে, ‘ও তরুণদা! এটা কী লিখেছেন? এটা তো ইনভাইটেড লেখা। ’ ‘তো? আমন্ত্রিত মানে যা গু-মুত দেবে, ছাপতে হবে নাকি, অ্যাঁ? দেখো ত্রিদিব, দাদা (বাবাকে উনি দাদা ডাকতেন) সবসময় বলতেন, কিশোর ভারতীতে লেখা সিলেকশনে নো কম্প্রোমাইজ। আমি বাপু এই চেয়ারে বসে এইসব অখদ্দে মালের দায়িত্ব নিতে পারব না। তুমি মনে হলে একবার চুমকিকে পড়াও, সে কী বলে শোনো।’

চুমকিও ঘাড় নাড়ল, লেখাটার মাথামুণ্ড নেই। তাহলে উপায়? চুমকি ঘোর বাস্তববাদী। হাজার হোক আমরাই লেখা চেয়েছি, লেখকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও বেশ ভালো। সে গিয়ে তরুণদাকে বলল, ‘দাদা, একটা লেখা না হয় একটু কমজোরিই হল! না ছাপলে উনি যে আবার নিন্দে করে বেড়াবেন।'

‘বেড়াক গে। একটা কাজ করতে পারি, বীজটুকু নিয়ে কেটেকুটে লিখে দিতে পারি। তবে আগে জিগ্যেস করে নাও, লোকটা কিন্তু বেশ খিটকেল।’

তরুণদার অ্যাসেসমেন্ট মিলে গেল। দিন দুয়েক বাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে খুবই বিনীতভাবে বললাম, ‘দাদা, লেখাটা ইয়ে মানে... মানে ঠিক ছোটদের জন্যে হয়নি। আমরা কি একটু এডিট করতে পারি? ধরুন, এই গোড়ার দিকটা একটু যদি—'

‘কী!’ তিনি খ্যাঁক করে উঠলেন, ‘আমার গল্প তোমরা

চেঞ্জ করবে? কে করবে? তুমি? নাকি ওই তরুণ? তোমরা কি সাগরময় ঘোষ নাকি? আমাকে লেখাটা ফেরত দাও। আর কখনও লেখা চেও না।' গটগট করে সেই যে বেরিয়ে গেলেন, পত্রিকার সঙ্গে তাঁর লেখালেখির সম্পর্ক শেষ।

পরের দুর্ঘটনাটাও কাছাকাছি। লেখক রাজ্য সরকারের অত্যন্ত উচ্চপদস্থ আমলা, লেখক হিসেবেও নাম আছে। সেসময় পত্রভারতী থেকে তাঁর বইও ছিল। কিন্তু যেটা সমস্যা, সকলে সব বয়েসের জন্য সব ধারার লেখা লিখতে পারেন না, অথচ এই না-পারাটা মেনে নিতেও পারেন না। ইনিও বড়দের জন্য ভালোই লেখেন, ছোটদের লেখা খুবই সাদামাটা। তবু খুব ঘনিষ্ঠ বলে মাঝেমধ্যে গল্পটল্প ছাপি।

হঠাৎ সেবার, কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে গোটা উপন্যাস এনে হাজির, 'বুঝলে ভাই, খুব খেটেখুটে লিখেছি।' তারপর যা হয়! তরুণদা এককথায় খারিজ করে দিয়েছেন। আর আমি না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে। উনি আবার লিখেছেন সায়েন্স ফিকশন! সাই-ফাই মানে কি যা খুশি তাই লেখা যায়? অথচ মানুষটি সেসময় প্রশাসনে খুবই ক্ষমতাশালী।

মজার কথা হল, আমরা লেখাটি সবিনয়ে বাতিল করলেও উপন্যাস হিসেবে সেবছরই সেটা বেরিয়ে গেল আরেকটা নামী পুজো সংখ্যায়। ততদিনে অনীশদা (দেব) এই পরিবারের একজন। তিনি তরুণদার কাছে সবটা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'বুঝলেন তরুণদা, এনাদেরই বলা যায় চেয়ার সাহিত্যিক। যতদিন চেয়ারটা আছে, তদ্দিন সাপব্যাঙ যা লিখবেন, পত্রিকা তাই ছাপবে।'

পাঠক, কিছু বুঝলেন! চেয়ার মানে প্রশাসনিক পদটুকু শুধু নয়। এই মানুষরা যুক্ত থাকেন বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে, যেখানে ঠিক হয় সাহিত্য পুরস্কার, কিংবা বই নির্বাচন করে সরকারি প্রোজেক্টে লক্ষ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়। মনে আছে, এক বয়স্ক সুহৃদ প্রথম আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেছিলেন, নস্য নিয়ে মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'ভায়া, একে বলে ব্যবসার ইনভেস্টমেন্ট। ওর বই না চলল তো আমার কী এসে গেল? পুষিয়ে তো দিচ্ছে।'

বাবা এই 'ইনভেস্টমেন্ট'কে চরম ঘৃণা করতেন, আমিও করি। উপরন্তু অযোগ্য 'চেয়ার সাহিত্যিক'দের নিয়ে আমাদের যা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সারা জীবন মনে থাকবে। বাজে লেখা সুপারিশ করা, ভুলভাল জ্ঞান বিতরণ করা, পত্রিকার টাকার শ্রাদ্ধ করা... কী ভাগ্যিস, ওই উপদেষ্টা বোর্ডে অনীশদাও থাকতে রাজি হয়েছিলেন। আমার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' দশা। তরুণদাও রেগে ফায়ার! কিছু করতেও পারছি না।

শেষ পর্যন্ত 'মধুসূদন দাদা' সেই অনীশদা। ওদের সামনেই একদিন বললেন, 'ত্রিদিববাবু! আমাদের নাম আর কিশোর ভারতীতে ছাপবেন না। লেখা ছাপানোর জন্যে লেখকেরা আমাকে জ্বালিয়ে মারছেন!' অনীশদার জন্যেই পত্রভারতী রাহুমুক্ত হল।

লেখা ছাপানোর জন্যে জ্বালিয়ে মারা! হ্যাঁ, সেও জবুর অভিজ্ঞতা। তরুণদা খাদ্যদ্রব্যের প্রতি খুবই দুর্বল। লেখক মহলে একথা কি অজানা থাকে? ছাপাপ্রত্যাশী লেখকরা নোন্‌তা মিষ্টি নিয়ে চলে আসতে শুরু করলেন দপ্তরে,

'বুইলেন কিনা, কলেজ স্ট্রিট এসছিলুম। ভাবলুম দেখা করে যাই। আসার পথে সন্তোষে গরম গরম নিমকি, কচুরি ভাজছিল, নিয়ে এলুম। তরুণদা আবার এসব খুব ভালোবাসেন কিনা... কী বলেন অনীশদা... হেঁ হেঁ!'

অনীশদা গম্ভীর। টেবিলের সামনে বসে বিড়বিড় করছেন, 'তরুণদা, সাবধান। মালটা কিন্তু বেশ বাজে লেখে। মালটার মাল যখন খাচ্ছেন, পয়মালও ছাপতে হবে। রিরাইট করা ছাড়া উপায় নেই। আপনি তো আর অমুকদার মতো মুখ মুছে ফেলতে পারবেন না!'

এরকম যশপ্রার্থীদের অফুরন্ত পিরীতে তরুণদার অবস্থা শোচনীয়। বেচারা শেষ অব্দি দপ্তরে আসার সময় বদলে ফেললেন।

শুধু খাবার বা গিফট নয়, লেখা ছাপার জন্যে আঁশটে প্রলোভনও দেদার আসত। যেমন অনীশদা কখন দপ্তরে থাকবেন, এক তরুণী লেখক জেনে ফেলল। ব্যস! ওইসময়েই সে আসতে শুরু করল। অনীশদা দপ্তরে কাজ–আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরবেন, সেও তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যাবে। কী জ্বালাতন ভাবুন! শেষে অনীশদা আমাদের নীচের গেটে বলে দিলেন, 'অমুক এলে বলে দিও, আমি আজ আসিনি।' যতক্ষণ আমাদের দপ্তরে থাকতেন, তাঁকে ফোন বন্ধ রাখতে হত। মহিলা এক

সময় হাল ছেড়ে দিলেন।

তরুণদারও এমন দুচারজন অনুরাগিণী ছিল, কিন্তু তরুণদা আসার সময় বারবার বদলে ফেলায় বেচারিরা ধাঁধায় পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তখনও তরুণদা মোবাইল ব্যবহার করতেন না।

আর আমি! এতরকম কাজে আমায় জড়িয়ে থাকতে হতো বা হয়, পালাবার পথ নেই। কলেজ স্ট্রিট অফিসে না যাই তো, সদর দপ্তরে দেখা করতে চলে আসে। সেখানে না পায় তো, বইমেলা অফিসে হানা দেয়। আর আবদারও কি এক রকম! লেখা ছাপা, বই করা, বইমেলাতে একটা অন্তত সুযোগ...। একবার ফেঁসে গেলে সাড়ে সর্বোনাশ! প্রাণে বাঁচতে পাঁকাল মাছের মতো হড়কে যাওয়ার ট্রেনিং নিতে হয়েছে আমায়। তবে সব সময় কি আর পিছলে যেতে পেরেছি?'

মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই লেখিকাকে নিয়ে কী নাজেহাল হয়েছিলাম আমি! সেটা আশির দশক। মোবাইল ধারেকাছে নেই। পত্রভারতীর অধীরবাবু (তখন দায়িত্বে) প্রায়ই বলেন, 'আপনি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পরে পরে অমুক ম্যাডাম এসে ঘুরে গেছে। ওদের অফিস তো আমাদের উল্টোদিকেই। বলে গেছে, নেক্সট যেদিন যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে।'

মেয়েটিকে বিলক্ষণ চিনি। আমহার্স্ট স্ট্রিটের পত্রিকা দপ্তরে বাবার কাছে অনেকবার এসেছে। একটু স্ক্রু ঢিলে গোছের মনে হয়েছে। তা এ আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? লেখা দেওয়ার হলে দিয়ে যাক না! পছন্দ হলে ছাপা হবে।

তা দু–তিন দিন পরে পত্রভারতীতে গিয়ে আমিই অধীরকে খবর দিতে বললাম। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি হাজির। বাইরে থেকে গলা পেলাম, 'ত্রিদিব কি ভিতরে? ' বলতে বলতে শ্রীমতী সুইং ডোর খুলে ঢুকে পড়ল। একমুখ হাসি।

'আসুন, আসুন। বসুন।'

'এ মা, এ আবার কী! আমরা তো সমবয়েসি... না না, আপনি টাপনি হবে না। তুমি।'

'আ- আচ্ছা। আপ- ইয়ে মানে তুমি আমার সঙ্গে ---'

'কেন, দেখা করতে পারি না? তুমি এমন মিষ্টি একটা ছেলে... কত ভালো কাজ করছ... কাকাবাবু (আমার বাবা) বলছিলেন... তোমাকে না আমার এত ভালো লাগে... '

আমি দরদর করে ঘামছি। ক্যাবলার মতো হাসি ঝুলিয়ে রেখেছি।

'অ্যাই, চলো না, কোথাও গিয়ে একটু বসি। আমার অনেকরকম বইয়ের প্ল্যান আছে...'

গদগদ গলায় বলল, 'অ্যাই, আমি কি খুব খারাপ দেখতে?'

'আ- আরে না... কী যে বলছ... আমার আবার আজকে এশিয়া পাবলিশিং-এর মৃণালদার সঙ্গে দেখা করার কথা...' আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

'তুমি আমায় অ্যাভয়েড করছ! কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ছি না, বুঝলে। একটা লেখা এনেছি, ছোটদের দারুণ ছড়া... শুনবে একটু?'

'পড়ে নেব, পড়ে নেব...। আ-আমাকে ... বললাম না, যেতে হবে... ' উঠে দাঁড়িয়েছি। ওকে টপকে বেরোতে হবে, এখনই।

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। কী ভীতু লোক রে বাবা! তুমি কি পুরুষ মানুষ? এমন করছ যেন... আমি কি বাঘ না ভালুক, খেয়ে ফেলব তোমায়! নেক্সট দিন কিন্তু আমার সাথে বসতেই হবে, বলে দিলাম।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। চলি।'

অনেক কাল পরে সুনীলদা, সমরেশদার সঙ্গে কয়েক হাজার মাইল দূরে এক রাতের আড্ডায় বুঝেছিলাম, রোম্যান্টিক লেখকেরা কখনও কখনও কতটা অসহায়!

চুপিচুপি আরেকটা কথা এক ফাঁকে বলে রাখি, জগুমামার স্যাঙাৎ অনন্ত সরখেল চরিত্রে আমাদের তরুণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কিন্তু অনেকখানি মিশে আছেন। শুধু খাওয়ার প্রতি দুর্বলতা নয়, তরুণদা ভূত আর রক্তেও ব্যাপক ভয় পান। ওনার কথা বলার স্টাইলটাও আমি অনন্ত সরখেলের মুখে বসিয়েছি!

দ্বিতীয় মৃত্যু

মাজহারুল ইসলাম

অপারেশন থিয়েটারের বাইরে পায়চারি করছে নিবারণ। দরজার উপরে লাল বাতি জ্বলছে। ভেতর থেকে ডাক্তার বা নার্স কেউ বেরিয়ে এলেই ছুটে গিয়ে জানতে চাচ্ছে কোনও খবর আছে কি না। একজন নার্স বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি বসুন। কোনও খবর হলে আমরাই আপনাকে ডেকে নেব। তবুও চিন্তাগ্রস্ত নিবারণ একবার মার কাছে গিয়ে বসছে আবার কিছুক্ষণ পরই অপারেশন থিয়েটারের দরজায় উঁকিঝুঁকি মারছে। এর মধ্যে এক নারীকে তার সামনে দিয়েই ট্রলিতে করে নিয়ে গেল পোস্ট অপারেটিভ রুমে। নারীর আত্মীয় স্বজনরা ট্রলি ঘিরে এগিয়ে যাচ্ছে। তার যমজ সন্তান হয়েছে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। আহা! কী আনন্দ সবার মধ্যে।

নিবারণ মাকে বলল, শেফালিকেও এখান দিয়ে নিয়ে যাবে।

নিবারণের মা আশালতা এ কথার কোনো সাড়া না দিয়ে কৌটো থেকে একটা পান বের করে মুখে দিল।

নিবারণ বলল, তোমাকে তো ডাক্তার পান খেতে বারন করেছে। তারপরও তুমি পান খেয়ে যাচ্ছ? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলে আমি কিন্তু মিথ্যা বলতে পারব না।

আশালতা এবারও কোনও কথা বলল না। আপন মনে পান চিবোতে থাকল।

নিবারণের মতো আরও অনেকেই এখানে, এই অপারেশন থিয়েটারের বাইরে, অপেক্ষা করছে। উদ্বেগ সবার চোখে-মুখে। কিন্তু তারা নিবারণের মতো অস্থির নয়।

নিবারণ লক্ষ্য করল অপারেশন থিয়েটার থেকে যারা বের হচ্ছে, ডাক্তার –নার্স এমনকি ওয়ার্ড বয়, সবার পরনে সবুজ পোশাক। তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কিছুদিন আগে ক্লাসে এক ছাত্র তাকে প্রশ্ন করেছিল, অপারেশন থিয়েটারে সবাই কেন সবুজ বা নীল পোশাক পরে? উত্তরটা নিবারণের জানা ছিল না বলে লজ্জা পেয়েছিল। পরে অবশ্য কারণটা সে জেনেছে।

অপারেশন থিয়েটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাছেঁড়া আর রক্ত নিয়ে কাজ করতে হয়। দীর্ঘ সময় একটানা রক্ত দেখার ফলে সেখানকার চিকিৎসক-নার্সদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তারা সব কিছুতেই ছোপ ছোপ লাল রং দেখতে পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর জন্য অপটিক্যাল ইলিউশন বা দৃষ্টিভ্রম দায়ী। এর ফলে অস্ত্রোপচার চালিয়ে যেতে সমস্যা হয়। আর তাই এ সময় চারপাশের পরিবেশ অথবা পোশাকে সবুজ বা নীল রঙের উপস্থিতি চোখকে আরাম দেয় এবং দৃষ্টিভ্রমের প্রভাব কমিয়ে দেয়।

২

নিবারণের স্ত্রী শেফালি ঘোষের তৃতীয় সন্তান হবে আজ।

প্রথম দুই কন্যা সন্তানের পর পুত্র আসছে ঘরে। তাই নিবারণের যেন আর ভর সইছে না। শেফালির সন্তান প্রসবের তারিখ ছিল আগামী মাসের ১৮। এক মাস আগেই সার্জারি করতে হচ্ছে। আজ দুপুর থেকে বাচ্চার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। শেফালির মাথাখারাপের মতো অবস্থা। নিবারণ বাড়িতে নাই। শাশুড়ির কাছে দৌড়ে যায় শেফালি। শাশুড়ি বলে, বাচ্চা কি সারাক্ষণ পেটের মধ্যে লাফালাফি করবে নাকি? দুই বাচ্চা পয়দা করছ, এখনও এইসব বোঝো না।

শাশুড়ির কথায় শেফালি শান্ত হতে পারে না। নিবারণের মোবাইল ফোন বন্ধ। সে ছুটে যায় পাশের বাড়ির কল্পনা মাসির কাছে। মাসি সব শুনে বলে, এখনই ডাক্তারের কাছে যা শেফালি। ভুল করিস না। ভগবান তোর মুখের দিকে চাইয়া পুত্রসন্তান দিছে। মা দুর্গা, মা দুর্গা।

শেফালি আকুল স্বরে বলে, ওনার ফোন বন্ধ পাচ্ছি। আমি এখন কী করি? তুমি আমারে নিয়ে যাবা মাসি?

শেফালিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে কল্পনা মাসি। সঙ্গে তার শাশুড়ি আশালতাও আসে। আশালতা অবশ্য প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। কল্পনার জোরাজুরিতে মত বদলায়। এর মধ্যে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে নিবারণ। ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, আরও আগে আসেননি কেন? বাচ্চার মুভমেন্ট তো মনে হচ্ছে সকাল থেকেই বন্ধ। এখনই একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে হবে।

ডাক্তারের কথা শুনে শেফালি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। নিবারণের চোখে-মুখে আতঙ্ক। ডাক্তারের লেখা কাগজ নিয়ে শেফালিকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ছুটে যায় আল্ট্রাসোনোগ্রামের জন্য। সেখানে দীর্ঘ লাইন। ডাক্তারের আর্জেন্ট লেখা কাগজ দেখালে অবশ্য দ্রুত আল্ট্রাসোনোগ্রাম হয়ে যায়। রিপোর্ট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাক্তারের কাছে ছুটে আসে নিবারণ। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলে, এখনই সার্জারি করতে হবে। নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে পূজা মানত করে।

দুই কন্যা সন্তানের পর ভগবান মুখ তুলে তাকিয়েছেন। পর পর দুই কন্যা জন্ম দেওয়ায় শেফালিকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। আশালতা তো উঠতে বসতে গালমন্দ করে শেফালিকে। নিবারণ শোনে অনেক কথা, দেখেও কিছু কিছু। মাকে সে বোঝানোর চেষ্টা করে, এটা শেফালির দোষ না। সন্তান পুত্র না কন্যা হবে সেটা মেয়েদের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু মা কিছুতেই ওসব বুঝতে রাজি না। নিবারণের পক্ষে এর থেকে বেশি কিছু মাকে বলা সম্ভব হয় না। অল্প বয়সে বাবা মারা গেলে অনেক কষ্টে মা তাকে এবং তার ছোট বোনকে বড় করেছে। অভাবের সংসারে বাবা ঋণ ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। নিবারণ কোনো রকমে বিএ পাস করে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে। তাও চাকরি নিতে হয়েছে মায়ের বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া জমি বিক্রির টাকা ঘুষ দিয়ে। ছোট বোনের বিয়েও দিয়েছে মা।

আশালতার বিয়ের পর নিবারণের বাবা তাঁকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সেটাই ছিল একমাত্র ভরসা। আশালতা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড় এনে সেলাই করে সংসার চালানো শুরু করে। এক পর্যায়ে তার খুব সুনাম হয়ে যায়। তখন তাকে আর কাজের জন্য মানুষের বাড়িতে যেতে হত না। সবাই বাড়িতে এসে কাজ দিয়ে যায়। রাত জেগে আশালতা সেসব কাপড় সেলাই করে। নিবারণ দেখেছে কী অমানুষিক কষ্ট করে তার মা সংসারটাকে আগলে রেখেছে। এর মধ্যে নিবারণের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা। নিবারণ মাত্র চাকরিটা শুরু করেছে। এখনই সে বিয়ে করতে চায় না। মা একদিন বলল, পুরুষ মানুষের সময়মতো বিয়া করতে হয়। তা ছাড়া ঘরে আমি একা থাকি। আমার তো একটা কথা বলার মানুষ দরকার।

মায়ের পছন্দেই বিয়ে করে নিবারণ। শেফালির গায়ের রঙটা একটু ময়লা বলে নিবারণের খুব একটা পছন্দ ছিল না। মা বলল, শোন বাবা, মেয়েদের পরিচয় হলো গুণে। রং দিয়া কী করবি? নিবারণ আর টুঁ শব্দটা না করে মাথায় টোপর পরে সাত পাক ঘুরে শেফালিকে ঘরে নিয়ে আসে। মার সঙ্গে শেফালির সে কী খাতির! ছুটির

দিনে কিংবা স্কুল থেকে ফিরে অলস বিকেলে শেফালিকে নিজ ঘরে পায় না নিবারণ। মা তাঁর ঘরে নিয়ে আটকে রাখে। রাজ্যের গল্প করে শেফালির সঙ্গে। চুলে বেশি করে তেল দেয়, সিঁথির সিঁদুর ঠিক করে দেয়। মা–র এসব বাড়াবাড়িতে মাঝে মাঝে নিবারণ খুব বিরক্ত হয়। কিন্তু মা কষ্ট পাবে ভেবে কিছু বলে না।

এক বছরের মাথায় শেফালির কোলে এল কন্যাসন্তান। নিবারণের মা বলল, আশা করছিলাম প্রথম সন্তানই বংশের বাতি জ্বালাবে। কী আর করা! আমার কপালে নাই।

কথাটা শুনে শেফালি কষ্ট পেলেও শাশুড়িকে বুঝতে দেয় না। নিবারণ মাকে বলল, চিন্তা কইরো না, তোমার আশা পূরণ হবে। কথাটা বলেই নিবারণ একটু লজ্জা পেল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, এখন নাতনির একটা নাম রাখো।

নাতনির বিষয়ে মার তেমন আগ্রহ নেই। তিন মাস পর নিবারণ নিজেই নাম রাখল কন্যার- শাওনি দত্ত। মার এধরনের আচরণে নিবারণ কষ্ট পেলেও কাউকে কিছু বুঝতে দিল না।

এরপর দুই বছরের মাথায় শেফালি আবার পোয়াতি হলো। আশালতা অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল-এবার নিশ্চয়ই পুত্রসন্তান হবে। এবারও শেফালির কোলে এল কন্যাসন্তান। আশালতা রাতারাতি বদলে গেল। শেফালিকে কোনওভাবেই সহ্য করতে পারছে না সে। একদিন রাগ করে বলল, তুমি একটা অপয়া। একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পার না।

দূর থেকে কথাগুলো শুনে নিবারণের খুব রাগ হলো। কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল। মাকে সে কোনওভাবেই কষ্ট দিতে চায় না।

শেফালি খুব কান্নাকাটি করল। নিবারণ তাকে বোঝায়—মা পুরোনো দিনের মানুষ। তুমি কিছু মনে রাইখো না। কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোনও কিছুই ঠিক হয় না। উঠতে–বসতে শেফালিকে শাশুড়ির খোঁটা শুনতে হয়। দুই নাতনির দিকে ফিরেও তাকায় না আশালতা। নিবারণ বুঝতে পারে না তার মা কেন এতটা একরোখা, অবুঝ!

পাঁচ বছরের মধ্যে শেফালি আবার সন্তানসম্ভবা হলো। আতঙ্ক ঘিরে ধরল তাকে। বিষয়টা বোঝার পর নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল সে। কদিন চুপচাপ থাকার পর অনন্যোপায় হয়ে স্বামীকে জানাল। তবে শাশুড়ি শুনে চোখ কপালে তুলে বলল, আবার?

নিবারণের ইচ্ছাতেই সন্তান নেয় তারা। শেফালি কোনওভাবেই চায়নি। সে বলেছিল, এবারও যে মেয়ে হবে না তার কি কোনো ঠিক আছে? কিন্তু নিবারণ শোনেনি সেকথা। একরকম জোর করেই...

আগের দুবার আলট্রাসোনোগ্রাম করার সময় ডাক্তার বলতে চেয়েছিল শেফালির গর্ভে পুত্র না কন্যা। নিবারণ জানতে চায়নি। সে একবারেই জানতে চায়। তাঁর কাছে পুত্র–কন্যা একই ব্যাপার। নিবারণ জানে এক্ষেত্রে শেফালির কোনও দোষ নেই। পুত্র–কন্যা নির্ভর করে পুরুষের ক্রোমোজোমের ওপর। এবার শেফালির মতো সেও খানিকটা চিন্তিত। বিশেষ করে তার চিন্তা হল মাকে নিয়ে। তাই আলট্রাসোনোগ্রামের সময় ডাক্তারকে বলল, দিদি, এবারও কি...? ডাক্তার একগাল হেসে বলল, মিষ্টি খাওয়ান। এবার রাজপুত্র আসছে। ডাক্তারের কথা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আনন্দে নিবারণের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

বাড়ি ফিরে মাকে খবরটা বলতে গিয়েও বলেনি নিবারণ। থাক না মার জন্য একটা সারপ্রাইজ!

অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে শেফালি বলছিল, ডাক্তারের কথা যদি সত্যি না হয়?

নিবারণ লক্ষ্য করল কথাটা বলতে গিয়ে শেফালির চোখ দুটো টলমল করছে। শেফালির হাতটা শক্ত করে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে নিবারণ বলল, ধুর পাগলি! আল্ট্রাসোনোগ্রামের রিপোর্ট কখনও ভুল হয়?

শেফালি বলল, সত্যি তাহলে আমাদের একটা রাজপুত্র আসছে?

নিবারণ কিছু একটা বলার আগেই নার্স ভেতরে নিয়ে গেল শেফালিকে।

অপারেশন থিয়েটারের সামনে অপেক্ষা করতে

করতে এসব কথা মনে পড়ছে নিবারণের।

এর মধ্যে একজন নার্স এসে নিবারণকে ভেতরে যাওয়ার কথা বলল। নিবারণ ভেবেছে বাচ্চা দেখার জন্য ডাকছে। সে বলল, আমার মা বসে আছে। তাকে নিয়ে আসি?

নার্স বলল, ডাক্তার আপনাকে একা আসতে বলেছে।

নিবারণ মাকে হাতের ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেল। মূল অপারেশন থিয়েটারের আগে ডাক্তারের বসার একটা জায়গা আছে। নিবারণকে দেখে ডাক্তার এগিয়ে এসে বলল, আপনার পুত্রসন্তান হয়েছে। কিছুটা ইমম্যাচিউরড বেবি। তাই দুই-তিন দিন ইনকিউবেটরে রাখতে হবে। কিন্তু...

নিবারণ বলল, কিন্তু কী? শেফালি কেমন আছে?

ডাক্তার বলল, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল আপনার স্ত্রীর। গত কয়েকদিন মনে হয় অ্যাজমার ওষুধ ঠিকমতো খাননি তিনি।

নিবারণ অস্থির হয়ে বলল, শেফালির কী হয়েছে?

আমরা অনেক চেষ্টা করেও ওনাকে বাঁচাতে পারলাম না।

নিবারণের মাথায় যেন বিশাল এক বাজ পড়ল। সে বলল, কী বলছেন? শেফালি নাই? আমার শেফালি নাই?

তারপর বিকট এক চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল নিবারণ। আশালতা ছেলের চিৎকারে দৌড়ে এল। নিবারণ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, শেফালি তোমার বংশের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল মা। শেফালি চলে গেল।

আশালতা নিবারণকে জড়িয়ে ধরে বলছে, বংশের প্রদীপ আমার দরকার নাই। ডাক্তার-নার্সদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলছে, আমার বউমাকে আপনেরা ফিরায় দেন। ও নিবারণ, কী হইয়া গেল রে বাবা। বংশের প্রদীপ দিয়া কী হইব আমার?

মা-ছেলের মাতমে অপারেশন থিয়েটার যেন কান্নাপুরীতে পরিণত হলো। একসময় আশালতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

৩

তুলশীগাছের তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে। বাড়িভর্তি মানুষ। সবারই অশ্রুসজল চোখ। খবর পেয়ে শেফালির মা অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে এসেছে। মেয়ের মুখ দেখে বলল, তুই বড় সৌভাগ্যবানের মা। শাখা-সিঁদুর নিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া তো ভাগ্যির ব্যাপার। এরপর অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে আর কিছুক্ষণ পর পর জ্ঞান হারায়।

শেফালিকে খাটিয়ায় তোলা হয়েছে। চোখে মোটা করে কাজল, কপালে চন্দনের ফোঁটা ও চুল বেণী করা। পায়ে লাল টকটকে আলতা দেওয়া হয়েছে। নিবারণের ছোট বোন মনের মতো করে বৌঠানকে সাজিয়েছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। জোছনার আলোয় শেফালিকে যেন রাজরানির মতো লাগছে। আশালতা উঠোনের এক কোনায় বসে কিছুক্ষণ পর পর শুধু প্রলাপ বকছে।

নিবারণের চোখে কোনও জল নেই। পাথরের মতো শক্ত হয়ে খাটিয়ার সামনে বসে আছে। সাদা ফুল নিয়ে সাজানো খাটিয়া। এক মুহূর্ত সে শেফালির কাছ থেকে দূরে সরছে না। পুরোহিত চলে এসেছে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। নিবারণ হঠাৎ লক্ষ্য করল, শেফালির শরীরটা মনে হয় একটু নড়ে উঠল। পর মুহূর্তেই মনে হলো খাটিয়ায় হয়তো কারও ধাক্কা লেগেছে। কিন্তু না, আবারও নড়ল শেফালির শরীর। নিবারণের শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল। শেফালি মিট মিট করে তাকানোর চেষ্টা করছে। নিবারণ কি স্বপ্ন দেখছে? 'শেফালি!' বলে নিবারণের চিৎকারে সবাই দৌড়ে এল। শেফালির মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া হলো। সে আবার হালকা চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করছে। পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে। কে একজন দ্রুত অ্যাম্বুলেস ডেকে নিয়ে এল। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো শেফালিকে। নিবারণ মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা, শেফালি মরে নাই। শেফালি বেঁচে আছে।

সাইরেন বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে। নিবারণ শেফালির ডান হাত ধরে বসে আছে। শেফালি অস্পষ্ট স্বরে জানতে চাইল তাদের সন্তান কেমন আছে। নিবারণ

বলল, আমাদের রাজপুত্র ভালো আছে। তুমি এসব নিয়ে এখন চিন্তা কইরো না। ভগবানরে ডাকো। ভগবানের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

শেফালি আরও কিছু বলতে চাচ্ছে। কিন্তু কথা জড়ানো ও অস্পষ্ট হওয়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নিবারণ তাকে কথা বলতে নিষেধ করছে। তারপরও শেফালি কিছু একটা বলতে চাচ্ছে। নিবারণ লক্ষ করল শেফালির দুই চোখ নিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

নিবারণের বাড়ি থেকে হাসপাতাল প্রায় নয় কিলোমিটার। অর্ধেক রাস্তা আসার পর শেফালির শ্বাসকষ্ট শুরু হল। অ্যাম্বুলেন্সের অক্সিজেন সিলিন্ডার কাজ করছে না। নিবারণ অ্যাম্বুলেন্সের লোকদের বকাঝকা করছে। শেফালির শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকল। সে চেষ্টা করছে বুকভরে শ্বাস নিতে। কিন্তু পারছে না। হাঁপাতে লাগল শেফালি। বুক ক্রমাগত উঠানামা করছে। নিবারণ বলল, জোরে শ্বাস নাও শেফালি। আর একটু কষ্ট করো। এই তো আমরা প্রায় চলে এসেছি। মনে হলো শেফালি বলছে, আমি আর পারছি না নিবারণ। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।

নিবারণ শেফালিকে পরাজিত হতে দেবে না। এবার চিৎকার করে সে বলল, শেফালি, জোরে শ্বাস নাও। আরও জোরে। আমরা হাসপাতালের কাছে চলে এসেছি। দয়া করো ভগবান। তুমি দয়া করো।

হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই শেফালির দেহটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল। নিবারণ চিৎকার করে কাঁদছে। হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্র নিবারণ পাঁজাকোলা করে শেফালিকে দ্রুতগতিতে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল। ইমার্জেন্সির ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলল, সি ইজ ডেড।

নির্বাক নিবারণ প্রস্তরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই হাসপাতাল দ্বিতীয়বার শেফালির ডেথ সার্টিফিকেট লিখল।

পরিশিষ্ট : সন্তান প্রসবের পর ভুলভাবে শেফালিকে মৃত ঘোষণা করায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার মামলা করেছিল নিবারণ। মামলার রায়ে ওই চিকিৎসকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দশ লক্ষ টাকা জরিমানা ও তাঁর চিকিৎসা-সনদ বাতিল করা হয়।

মুলক

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

জিনাত আজ শাহিনবাগের জমায়েতে যাবে কিনা চিন্তা করছে। গত পাঁচদিন ধরে পার্ক সার্কাসে আন্দোলনের জমি কামড়ে পড়ে ছিল। আজ জিনাতের ভয় ঢুকেছে। তবসসুম, জারা দু'জনেরই কাল থেকে হালকা কাশি। সাকিরার জ্বর এসেছে কাঁপুনি দিয়ে। ফোন করে জানিয়েছে। জিনাত এদের সবাইকে নিয়ে জোট বেঁধে গেছিল শাহিনবাগের সমর্থনে।

যাবে নাই বা কেন? এ দেশ তো তাদের। জন্ম জন্ম ধরে মা-চাচি-দাদিদের দেখে আসছে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে। যতই হজ করতে মক্কায় যাও আর যাই করো, নিজের মাথার ছাদ, চার দেওয়াল, পায়ের মাটির মত পবিত্র আর কিচ্ছু নেই। যেখানেই দাঁড়িয়ে আল্লাকে ডাকা যায়, আল্লা সেখানেই নেমে আসেন। কাজেই এনআরসি-র নামে রাগে গা জ্বলে গেছিল। কেন আলাদা করে পরিচয় দেখাতে হবে?

জিনাত এ ক'দিন দর্জির কাজ বন্ধ রেখেছে। তিলজলার বেশিরভাগ মেয়েবউ তার কাছেই ব্লাউজ বানায়। হেব্বি হেব্বি কাটের ব্লাউজ বানাতে শিখেছে জিনাত। সবই আব্দুল ভাইয়ের থেকে। মুম্বাইতে পাঁচবছর টেলারিং করে আব্দুলভাই এখন নিউ মার্কেটে ছেলেদের স্যুট বানায়। আর মেয়েদের ব্লাউজ, কুর্তি বানানো হাতে ধরে শিখিয়েছে জিনাতকে। লো কাট, রেখাগলা, বোটনেক, স্লিভলেস, আরও কত কী! হালফিল চলছে স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ ও হল্টার নেক ব্লাউজ। রমরমা বাজার। এসব ছেড়ে শাহিনবাগে গেছিল শুধু নিজেদের অধিকার আদায় করতে।

আলালের ঘরের দুলাল ওই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া। বাঁদর ছেলে। কে বলেছিল তোকে রোগ লুকিয়ে সবাইকে ছড়িয়ে দিতে? মেরে পাটপাট করতে হয় বড়লোকের ব্যাটাদের। সফিকুল বলছিল, যত সমস্যা করছে আসলে পয়সাওয়ালারা। বাইরে থেকে রোগটাকে নিয়েও আসছে ওরা। জিনাতের মাথা গরম হয়ে যায় এগুলো শুনলে। কিন্তু মিছে কথা বা গল্প নয়। সত্যিই স্পেশাল প্লেনে চড়িয়ে যাদের ফেরত আনা হল, ইন্ডিয়ায় তারাই তো রোগটা ছড়াচ্ছে। কতজনের ভিতরে লুকিয়ে ছিল গুপ্ত, ফালতুস্য ফালতু ফিরিঙ্গি রোগটা! সফিকুল বলল, বাইরে থেকে যারা বিমানে করে এল, তারাই ইবলিশ।

তবসসুম কাশতে কাশতে ঘরের বাইরে এসেছে। জিনাত দূরে দাঁড়িয়ে কল থেকে জল ভরছে বালতিতে। কর্পোরেশনের টাইম কলের জল। এখন না ধরলে আবার সেই দুপুরে আসবে। দেরি হয়ে যাবে। ঘরের রান্নাবান্না কাচা-ধোওয়া, বাসন মাজা কিছুই হবে না। কাল টিভিতে শুনেছে, হতচ্ছাড়া বিলেত ফেরত ছেলেটা নাকি বাড়ি ফিরেই পুরো শহরটা চষেছে। এসেছিস বেশ বাপু, চোদ্দদিন ঘরের কোণায় বসে থাক। তা না বাবুর ফুর্তিফার্তা না করলে চলবে কেন! নবাবি দেখিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মল, প্লাজা ঘুরে বেরিয়েছে। রোগটাও ছড়িয়ে দিয়েছে হুহু

করে। ইস্, এই একটা ছেলেকে যদি আটকানো যেত...।

জিনাত আফসোসে হাতের বালতি কাত করে ফেলল। জলভর্তি বালতি ছলাৎ করে উঠে জল চলকে পড়ল। তবসসুম কাশতে কাশতে মুখে হাত চাপা দিল। শরমিন বানু সামনে দাঁড়িয়ে জলের লাইনে। খিঁচিয়ে উঠল, বুরবকের মতো জল ফেলচিস কেন?

শয়তান ছেলেটাকে চোদ্দদিন আটকালেই বিমারি ছড়াত না। চাচি বলল, বিমারি আমাদের ঘরে ঢুকেছে? সব বড়লোকদের থেকে এসচে প্লেনে চেপে। ওদেরই হচ্ছে। আমাদের হবে না ওসব। আমরা কি প্লেনে চেপে এসচি?

জিনাত ঝটিতি তবসসুমের দিকে তাকাল। তবসসুম ঘরে গেছে। কাশির আওয়াজ আসছে না।

বিলকুল ঠিক বলেছে শরমিন চাচি। শাহিনবাগে জমায়েতে যাচ্ছে বলে কদিন ধরেই বুকের মধ্যে চাপা ভয় গুবগুবিয়ে উঠছিল। টিভিতেও চ্যানেলে চ্যানেলে বলছে জটলা না করতে, মাস্ক পরতে। কিন্তু আসল সত্যটা হল, আমিরদের থেকে রোগটা আমিরদেরই ছড়াচ্ছে।

জিনাত কুচোচিংড়ি দিয়ে পটলের তরকারি কষাতে কষাতে ভাবল, জারাকে একবার ঝট করে দেখে আসবে কিনা। জ্বর না থাকলে জারাকে নিয়ে শাহিনবাগ যাবে। ব্লাউজগুলো কাস্টমারদের ডেলিভারি দিয়ে এলে ভাল হত। হাতে হাতে টাকা মিলত। এখন তো কাস্টমাররা কেউ তিলজলার ঘুপচি দোকানে আসবে না। একরত্তি ভাইরাসের ভয়ে যে যার ঘরে।

মসুরির ডাল আর পটলের তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে জিনাত। জারার ধুম জ্বর। ও মেয়েটা চুলবুলে চটপটা। কসবার বাইরে সায়েন্স সিটির আশেপাশে ফ্ল্যাটবাড়িগুলো সব চেনে।

জিনাত ভেবেছিল শাহিনবাগ হয়ে ফেরার পথে ব্লাউজগুলো ডেলিভারি দিয়ে চলে যাবে। কড়কড়ে টাকাগুলো হাতে পেলে খুব ভাল হত। আব্দুল ভাইয়ের নিউ মার্কেটের দোকান বন্ধ। সফিকুল বলছিল, কার্ফু না কী একটা ডাকবে সরকার। সব বন্ধ করে দেবে। পেট চলবে কীভাবে এক হপ্তা টানা কাজ বন্ধ থাকলে! জিনাত বোরখা পরে নিল। মাস্ক কেনার টাকা নেই। শরমিন চাচি চেঁচিয়ে বলছে, বোরখা পরলেই হবে। মাস্কের বাবা। কোনও বিমারি বোরখায় ঘেঁষবেনা।

রাস্তা পার হওয়ার সময় চমকে গেল জিনাত। কোনও গাড়িই নেই বললে চলে। দু-একটা হলুদ ট্যাক্সি, উবেরের সাদা চারচাকা। গাড়ি নিয়ে না বেরোলে যাদের পেট চলবে না, তারা ছাড়া কিছু ভ্যান, রিক্সা, বাইক আর সাইকেল। জমায়েতেও আজ লোক কম। দূর থেকেই দেখতে পেল জিনাত।

কী করবে বুঝতে না পেরে ব্লাউজগুলো ব্যাগের থেকে বের করল। তবে কি ফিরে যাবে? বরং এখন বেলা থাকতে থাকতে এগুলো খরিদ্দারদের হাতে দিয়ে আসতে পারলে...। ওহ এখন তো কেউ হাতেও ছোঁবে না জিনিসগুলো। তাহলে? জিনাত চিন্তিত হল।

ঠিকানা লেখা কাস্টমারদের বিল বইটা সঙ্গে করে এনেছে। মোবাইল নম্বরও আছে। কিন্তু তার ফোনে অতো ব্যালেন্স নেই ধরে ধরে ফোন করার।

সামনে হনুমান মন্দির। ঘণ্টা বাজছে না, শাঁখের আওয়াজও আসছে না। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আজ নিশ্চয়ই পূজারি আসেনি। চারদিক কেমন শুনশান। জিনাতের কীরকম ভয় ভয় করছে! এইসব চেনা রাস্তাঘাট যেন অচেনা হয়ে গিয়েছে রাতারাতি।

মন্দিরের পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়েকে প্রায়ই খেলতে দেখেছে জিনাত। তিন বছরের সেই অবোধ শিশু

গুটিগুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে দেখল জিনাত। সারা গায়ে কালিঝুলি মাখা। নাক দিয়ে শিকনি পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জিনাত এগিয়ে এল বাচ্চাটার কাছে।

মা কই বেবি?

বাচ্চাটার দৃষ্টিতে শূন্যতা। যেখান থেকে বেরিয়ে এল সেদিকে এগোল জিনাত। দরজা হাট করে খোলা। বাড়ির লোকজন গেল কোথায়?

মুখ তুলতেই দেখতে পেল জিনাত, আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে লোকজন।

তার মানে পাড়া প্রতিবেশি সবাই আছে! দেখছে, কিন্তু ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছে না।

কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও হচ্ছে জিনাতের।

বাচ্চাটা খোলা নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে। ড্রেনের মধ্যে যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

মন্দির সংলগ্ন বাড়িটার ভিতরে জিনাত কোনওদিন ঢোকেনি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি দিল।

ঘরের মধ্যে চৌকির উপর পড়ে এক প্রৌঢ়া। ঘোমটা দেওয়া একটা বউও শুয়ে আছে। পরনের কাপড় আলুথালু। বউটাকে আগে দেখেছে জিনাত। মেটে সিঁদুর পরা, নাকে নথ। বউটা মন্দিরে বসে কাঁসর-ঘণ্টা বাজায়।

জিনাত কী করবে বুঝতে না পেরে জোরে বলে উঠল, কা আপলোগ ইতনা ছোটে বাচ্চেকো ছোড় দিয়া?

প্রায়ান্ধকার ঘরেও দেখতে পেল জিনাত, বউটা কোনওরকমে পাশ ফিরে উঠে বসল।

শরীর মোচড়াচ্ছে। নিশ্চয় কিছু হয়েছে বউটার।

ঘোমটা খসে পড়েছে। তুলসির গায়ে এত ব্যথা যে উঠে বসবার শক্তিও নেই। তিনদিন ধরে শাশুড়ি আর তার জ্বর।

জিনাত ভাবল এক দৌড়ে পালিয়ে যায়! সাংঘাতিক! রোগটা যদি তাকেও ধরে ফেলে!

তুলসি ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে, পাড়ার বেশিরভাগ মরদেরা সব চলে গিয়েছে আসন্ন রামনবমীর মেলায়। শ্বশুর ও বরও তাদের সঙ্গে গিয়েছে।

আর যাবে নাই বা কেন! একশ বছর ধরে চলে আসছে ত্রেতাযুগের ভগবান রামচন্দ্রের জন্মতিথির এই মেলা। ২৫ তারিখ বিরাট মূর্তি বসবে রামচন্দ্রর। দেশের সেই পুণ্যস্থান অযোধ্যায় পুণ্যলগ্নে না গেলে চলে?

কিন্তু মুশকিল হয়েছে তাদের দুই অওরতের। তুলসি আর তার শাশুড়ি দুজনেরই ঘুষঘুষে জ্বর, কাশি। শাশুড়ির হাঁপ ধরছে। উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে।

আজ দু'দিন রান্না করতে পারেনি তুলসি। গা তুলতেই পারছে না। প্রতিবেশী লোকজন কিছু ফলমূল পাঠিয়ে দিয়েছিল কাল। কিন্তু রোটি অউর ভাত না খেয়ে কদ্দিন থাকা যায়? ইলাজ করার জন্যও তো হাসপাতালে যেতে হবে। সেটাই বা হচ্ছে কোথায়?

তুলসির দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে।

জয় শিয়ারাম, বলতে বলতে তুলসি হাতদুটো জড়ো করে বুকের কাছে ঠেকাল।

হামার বিটিয়াকে কুছু খিলাবে?

জিনাত চেঁচিয়ে বলল, হামি মুসলমান আছে। চলবে?

তুলসি কাঁদছে। হাতজোড় করে নিজের মাথায় নিল। তোমাকে পাঠিয়েছে রামচন্দ্র। ওদের বাবা আসার আগে যদি কিছু হয়ে যায় আমার, বিটিয়াকে দেখো। কেউ নিচ্ছে না ওকে বিমারির ভয়ে।

বাচ্চাটা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

মাথার বালিশের তলা থেকে দুটো নতুন মাস্ক বার করে দিল তুলসী।

জিনাত ব্লাউজের প্যাকেট ফের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। এখন সবার আগে দরকার বাচ্চাটাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া। এক প্যাকেট বিস্কুট কিনতে হবে বাচ্চাটার জন্য। দু'দিন কিছু খায়নি অবোধ শিশু। শুধু কেঁদেই চলেছে।

তুলসির ছুঁড়ে দেওয়া মাস্ক মুখে বেঁধে নিতে নিতে জিনাত বুঝল, শাহিনবাগ হোক কী রামনবমী, জমায়েত এখন তাদের জন্য হারাম! রোগটা যে শুধু বড়লোকরা এনেছে তা নয়। আরব- দুবাই-ইরানে যে হাজার হাজার গরিব লোক রাজমিস্তিরি, প্লাম্বার, ছুতোর, কামার, স্যাঁকরার কাজ করতে যা,য় তারা তো হামাগুড়ি দিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢোকেনি! বিমানে চড়েই কাজ করতে গেছিল, আবার কাজের সূত্রে বিমানেই ফেরত এসেছে। তাহলে?

নাহ্, শরমিন বানু একদম ঠিক বলেনি। বোরখা ইয়া ঘোমটা নয়, এই একটুকরো চৌকো কাপড়ই এখন দেশটাকে বাঁচাতে পারে।

জিনাত ভাবল, সে তো দর্জি। টুকরো টুকরো কাপড় দিয়ে মাস্ক বানাতে পারবে না? ব্লাউজ পরে হবে। এখন আগে বাচ্চাটাকে বাঁচানো দরকার। জিনাত মোবাইল বার করে ফোন করল।

সফিকুল আসবি সাইকেলটা নিয়ে? রান্নাঘরের তাকে রাখা ডেকচি শুদ্ধ ভাত, ডাল আর পটলের তরকারি নিয়ে চলে আয়।

তুলসিকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করে জিনাত।

সব ঠিক হো যায়েগি। চিন্তা মত্ করো।

ওদিকে, শাশুড়িকে নিথর দেখে তুলসির বুক ধড়াসধড়াস করে।

জিনাত তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, বিসমিল্লাহ রহম করো। তুম রামজি কো ইয়াদ করো বহেন। কুছ নেহি হোগি। ইয়ে মুলক ছোড়কে কহি নেহি যাওগে তুম। তুমহারি বিটিয়া হ্যায় না?

মুখে বললেও জিনাতের বুক ধড়ফড় করে। এই একফোঁটা বাচ্চা মেয়েটাকে এখানে কার জিম্মায় দিয়ে সে তিলজলার বসতিতে ফিরবে?

তুলসি ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠে, রাম রাম! জয় শিয়ারাম! জিনাত জোর গলায় বলে আলহামদুলিল্লাহ...।

দয়ালের দোস্ত

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

সামান্য টলোমলো পায়ে সাহেব বাগানের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল দয়াল। রাত এখন মনে হয় দশটার আশেপাশে। হাতে ঘড়ি নেই দয়ালের। ছিল এককালে। তারপর নেশাকেই ঘড়ির চেয়ে আপন ভেবে বেচে দিয়েছিল সেই ঘড়ি। এই যে এখন যেমন ফুরফুর করছে মেজাজটা, এই সুখ কি ঘড়ির পক্ষে দেওয়া সম্ভব? না, কোনও কঠিন জিনিসই এই তরলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। জলই জীবন।

'চলো দিলদার চলো, চাঁদ কে পার চলো...।' দয়ালের বড় প্রিয় এই গানটা। সেটাই গুনগুন করতে করতে হাঁটছিল সে।

'চাঁদ কে পার যাবেন নাকি বাবু?' কানের পাশে কারোর গলা শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দয়াল।

'কে ভাই, আমাকে বাবু বলছ আবার চাঁদের পারে নিয়ে যেতে চাইছ?'

'আমি আছি বাবু, এই যে।'

বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দয়াল দেখে এক টাঙাওয়ালা বলছে কথাগুলো। দুটো হাড় জিরজিরে সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। টাঙাওয়ালা তার আসনে বসে আছে। একটা ঝাপড়া গাছের নীচে গাড়িটা থাকায় খেয়াল না করলে চোখে পড়ছে না।

'যাবেন নাকি বাবুসাব। আজ সারাদিন একঠো ভি সওয়ারি পাইনি। ঘোড়াদের দানাপানি দেবার টাকাও জুগাড় হয়নি। যদি দয়া করে বসেন আমার টাঙাতে তো আপনাকে চাঁদ কে পার বেহেস্ত দেখিয়ে আনি।'

'আরে গুরু, তুমি তো জবরদস্ত কথা বলো!' নিজেকে সোজা ভাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল দয়াল। আজ মাথাটা একটু বেশিই হালকা মালুম হচ্ছে। 'আমি তো এমনিতেই বেহেস্ত দেখছি হে, তুমি আমাকে আর কী দেখাবে!'

'চড়ে দেখুন না বাবুসাব, না হয় এ গরিবকে একটু মেহেরবানিই করলেন।'

'ওহো, আগে বলো তোমার নাম কী...বাকি কথা পরে হবে...'— গান গেয়ে দেয় দয়াল।

'দিলদার মিঞা নাম আছে জনাব।'

'আরে গুরু, আমি দয়াল আর তুমি দিলদার! এতো দয়ার ছড়াছড়ি গো, কেবল পকেটটাই গড়ের মাঠ, হে হে। শোনো দিলদার মিঞা, তুমি যে আমাকে তোমার রথে চড়াবে তার জন্য তো তোমাকে ভাড়া দিতে হবে। আমার সারা শরীর ঢুন্ডেও তুমি পাঁচটাকা বের করতে পারবে না। কীসের জোরে আমি তোমার ঘাড়ে চাপি বলো তো মিঞা?'

'আমার নসিব বাবু। কেয়া বোলে!'

'এই, বাবু-ফাবু মত বুলাও, দয়াল বলো, দয়াল। নসিব আপনা আপনা। হা হা। শোনো মিঞা, তুমি বরং আমার ঘরে চলো। দুটো চাল আর আলু ফুটিয়ে নিয়ে দু'জনে খেয়ে নেব আর পেছনে মাঠ আছে, ঘাসও আছে তাতে। তোমার চুন্নু মুন্নু পেট ভরে খেতে পারবে। আর আমারও তোমার টাঙায় চড়া হয়ে যাবে। কী বলো মিঞা?

‘লেকিন... বাবু...অ্যায়েসে ক্যায়েসে চলে যায়েঙ্গে আপকে ঘর...?’

‘এইত্তো না! এই ন্যাকামোর জন্যেই আমি লোকের সঙ্গে মিশি না। সব ঢঙের অবতার! ভাল কথা বললাম, তা দিলাদার মিঞার দিল মানলো না। যাক গে, আমি তবে চললাম... চলা যাতা হুঁ কিসিকে ধুন মে...।’

‘আরে বাবু, গুসসা কেনো করছেন, ঠ্যায়ের যান।’ ঘোড়াদুটোকে টাঙায় জুততে শুরু করে দিলদার। ‘আসুন দোয়ালবাবু, বসুন।’

‘এ্যাইব্বাস, মিঞাসাব মান গয়ে। তবে চালাও পানসি বেলঘরিয়া...।’

লাগামে টান পড়তেই চলতে শুরু করে ঘোড়াদুটো। ফুরফুরে হাওয়ায় ঝিম ধরে আসে দয়ালের। মনে হয় যেন উড়ে চলেছে। আহা, কী সুখ কী সুখ! ‘আজ ম্যায় উপর আসমা নিচে...।’ জড়ানো গলায় গান ধরে দয়াল।

‘ইঁয়াহা রুকে দোয়ালবাবু?’

ঘুমিয়ে পড়েছিল দয়াল। দিলদারের কথায় চোখ খুলে দেখে ওর ঘরের একটু আগে লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে টাঙা। লাইটপোস্টের আলোটা ভাঙা। দয়াল হেসে বলে, ‘বিলকুল ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছ মিঞা, এই ল্যাম্পপোস্টটাও আমারই মতো। চলো, ঘরে চলো। টাঙা এখানেই থাক, চুন্নু-মুন্নুকে খুলে নিয়ে এসো।

ঘোড়াদুটোকে ঘরের পেছনে খোলা মাঠের ধারে ছেড়ে দেয় দিলদার। বলে, ‘হেই, কঁহি নহি জানা, ইঁয়েহি রহনা।’

টালির চালের একটাই ঘর। ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে দয়ালের সঙ্গে ভেতরে ঢোকে দিলদার। ‘ইসকা হালত তো মেরে জ্যায়সাই হ্যায়’ ভাবে দিলদার। মেঝেতে বিছানা পাতা। রংচটা চাদরটা কুঁচকে আছে। ঘরের কোণে একটা কুঁজো। তার ওপরে গেলাস উপুড় করা। জল দেখে চেষ্টা অনুভব করে দিলদার। হাতে করে জল নেওয়া কি ঠিক হবে! ও হিন্দু আছে, আমি...।

‘পেয়াস লাগা, থোড়া পানি...।’

‘আরে নাও না, ওই তো পানি। মিঞাসাব, আমি চাল আর আলু দিচ্ছি, তুমি ধুয়ে ভাত চড়িয়ে দাও। ওই যে স্টোভ। একটা পেঁয়াজ আছে, ভাগ করে খেয়ে নেব। আমার হাত-পা ঠিকঠাক চলছে না, তাই তোমাকে বললাম। নইলে মেহমানকে কেউ কাজ করতে বলে?’

‘কী বলছেন দোয়ালবাবু, কাঁহাসে মেহমান হুয়ে হম। আমি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।’

নিজের অ্যালুমিনিয়ামের থালাটা দিলদারকে দিয়ে নিজে ভাতের হাঁড়ির ঢাকনায় ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ আর নুন নিয়ে মেঝেতে খেতে বসে দু’জনে।

‘তোমার বিবি আছে তো মিঞা? বাচ্চা?’

‘হাঁ দোয়ালবাবু, বিবি, এক বেটা, এক বেটি। গাঁওতে আছে। ওখানে ভাইয়ালোগ আছে, থোড়া জমিন হ্যায়। খানাপিনা হো যাতা হ্যায়। ইঁয়াহা আপনাই নহি চলতা তো উন লোগো কো হম কেয়া খিলায়েঙ্গে। দো ঘোড়াকে হমি ঠিকসে খানা দিতে পারি না।’

‘হ্যাঁ, ভালই করেছ। তুমি কোথায় থাকো? গাঁও যাও না?’

‘যাই, লেকিন বহোত কম। যানে আনে কা খরচা ভি তো হ্যায়। একঠো ছোটা কামরায় পাঁচ লোগ মিলে থাকি। ঘোড়া দোঠো কামরার বাহার রাস্তায় থাকে। আপকা বিবি কাঁহা হ্যায়?’

খাওয়া থামিয়ে দিলদারের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে দয়াল। তারপর বলে, ‘ভেগে গেছে বুঝলে, ভাগ গিয়া। আমার তো টাকা নেই যে ওর মনের মতো শাড়ি-গয়না কিনে দেব, তাই যে দিত তার সঙ্গে ভেগে গেছে।’ দিলদার ভেবে পায় না কী বলবে।

‘খুব ভালবাসতাম ওকে, জানো মিঞা। ও যতদিন ছিল, আমি নেশা করতাম না। যতটুকু পারতাম, ওর জন্যেই করতাম। ফুলুরি খেতে ভালবাসত, নিয়ে আসতাম। মেলায় ঘুরতে ভালবাসত, মেলায় নিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, কিনে-টিনে বিশেষ কিছু দিতে পারতাম না ঠিকই, তবে ভালবাসতাম খুব। টিপ, চুলের কিলিপ, নখ পালিশ... এসব কিনে দিতাম। কিন্তু সেই ছেলে যেই মুক্তোর হার আর দুল দিলো, ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলো জানো, চলে গেলো।’ হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল দয়াল।

দিলদার উঠে এসে দয়ালের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, ‘খুদা কি মর্জিকে আগে হম ইনসান কেয়া কর সকতে হ্যায়। রোইয়ে মত। আপ বহোত হি আচ্ছে ইনসান আছেন। অ্যায়াসা ইনসান আজকাল মিলতাহি নহি। আল্লা

আপনার ভাল করবেন।'

লুঙি তুলে নাক-চোখ মুছে নেয় দয়াল। তারপর বেশ জোরে বলে ওঠে, 'এই দিলদার, তুমি আপনি আপনি করছ কেন বলো তো, অ্যাঁ? আমাকে কি বন্ধু ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে তোমার? যদি আর একবারও আপনি বলেছ তো কাল থেকে মুখ দেখতে পাবে না আমার!'

দয়াল রেগে যাচ্ছে দেখে দিলদার তড়িঘড়ি বলে, 'তুমি করেই বলব বাবা, গুসসা মত হো।' কয়েক ঘন্টার আলাপে এত বন্ধুত্ব কী করে হয় তা ভেবে পেল না দিলদার। লোকটা ভাল না বদমাস কে জানে! শালার কোনও গলত মতলব নেই তো? ঘোড়া দুটো আর টাঙাটা হড়প করার তালে আছে না কী কে জানে।

খাওয়া শেষ হলে দিলদার বলে, 'বহোত বহোত শুকরিয়া দোয়ালবাবু! অভি হামি যাই। দেখি আমার ঘোড়া জোড়ি কী করছে।'

'চলে যাবে দিলদার মিঞা? থাকবে না? কাল সকালে চুন্নু-মুন্নু পেট ভরে ঘাস খেলে পরে চলে যেতে না হয়? এত রাতে বাসায় গিয়ে কী করবে? থেকে যাও ইয়ার। একটু গল্পগাছা করি। কতদিন কেউ থাকে না আমার ঘরে, পাশে শোয় না, গল্প করে না, ভালবাসে না।'

দয়ালের আবদারে থেকে যায় দিলদার। ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোড়া দুটো আর টাঙাটা দেখে আসে। সব ঠিকই আছে। ঘোড়া দুটো অনেক দিন পর পেট পুরে ঘাস খেয়েছে।

ছেঁড়া চট, রঙচটা পুরনো চাদর দিয়ে যত্ন করে বিছানা পাতে দয়াল।' এসো দোস্ত, শুয়ে পড়ো। কাল ভোরে আমাকে কারখানা যেতে হবে। আমাকে তুমি আজ সত্যিই বেহেস্ত দেখিয়েছ গুরু। মনে হচ্ছিল রাস্তা শেষ না হোক...। চল না হি জিন্দেগী হ্যায়, চলতে হি যা রহি হ্যায়... আজ আমার খুব আনন্দের দিন, বুঝলে দোস্ত। কতদিন পরে যে ভাল লাগছে কী বলব। তুমি সত্যিই আমাকে চাঁদ কে পার নিয়ে গেছ দোস্ত!

দয়ালের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল দিলদার। পাখি ডাকা ভোরে ওঠাই ওর অভ্যেস। পরদিনও সেই সময়েই ঘুম ভাঙল দিলদারের। উঠে বসল সে।

পাশে তাকিয়ে দিলদার দেখতে পায় না দয়ালকে। বাইরে বাথরুম গেছে হয়তো। উঠে পড়ে দিলদার। পাশে রাখা মর্চে রঙের প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পা-হাত-মুখ ধুয়ে ফজরের নমাজ আদায় করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে গিয়ে দেখে মনের আনন্দে ঘাস চিবোচ্ছে ঘোড়া দুটো। ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলদার বলে, 'চল বেটা, কাম পে চলে।'

ঘোড়া দুটোকে গাড়িতে জুতে দিয়ে নিজের আসনে উঠে পড়ে দিলদার। কিন্তু দয়াল কোথায়? কারখানা চলে গেলো নাকি? হতেও পারে। চলো, ফেরার পথে নিশ্চয়ই দিলদারের কাছে আসবে। মানুষটা বেশ ভাল। খামোখা সন্দেহ করেছিলাম, ভাবতে ভাবতে লাগামে টান দেয় দিলদার। এই উমরে এসে ভাল একটা দোস্ত জুটলো। আল্লাতালার মেহেরবানি।

★

এরপর কুড়িদিন কেটে গেছে, দয়াল আর আসেনি দিলদারের কাছে। দিন দুই পরে দিলদার গেছিলো দয়ালের ঘরে খোঁজ করতে। যেভাবে বেরিয়ে এসেছিল দিলদার, ঘরটা ঠিক সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। বেশ অবাক হয় সে। তবে কি দিলদার আর ফেরেনি? গেলো কোথায় লোকটা?

বিশ হাত দূরে একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেছিল দিলদার। 'ভাইসাব, ওই ঘরে দয়াল নামে একজন থাকে, ওকে একটু দোরকার ছিল। কোথায় আছে কুছু বলতে পারবেন?'

দিলদারের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে দোকানদার জবাব দেয়, 'না।' ফিরে আসে দিলদার। দয়ালের অপেক্ষায় থাকে। এমন মানুষ জীবনে দেখেনি সে। কাঁহা গ্যায়ে দোয়ালবাবু!! তাজ্জব কী বাত!

সেই গাছতলায় আজও অপেক্ষা করে দিলদার মিঞা। যদি তার এক রাতের দোস্তের দেখা পায়। কখনও কখনও যেন মনে হয় অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে 'চলো দিলদার চলো...। '

স্বপ্নের ছায়াপথ

দীপান্বিতা রায়

বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল রণিতা। তার ফ্ল্যাটের সব জানলাতেই আধুনিক ধরনে স্লাইডিং গ্লাস বসানো। পুরো জানলাটা খোলা যায় না। একমাত্র এই শোবার ঘরেই প্রায় দেওয়াল জোড়া জানলা বলে আধখানা খুললেও আকাশ দেখা যায়। অবশ্য জানলা খোলার দরকারই বা হয় কোথায়? সব ঘরেই এসি মেশিন বসানো। জানলা–দরজায় ভারী পর্দা। রাত করে বাড়ি ফিরে বেলা করে ঘুমোনোর সময় যাতে বেহিসেবী সূর্যের আলো ঢুকে পড়ে বিরক্ত করতে না পারে। ফ্ল্যাট যখন দেখতে এসেছিল, তখন একবার, 'পূর্ব–দক্ষিণ খোলা ম্যাডাম, দেখুন কেমন হাওয়া পাবেন, এরকম দু–চারটে কথা লোকটা বলেছিল। পরাণ মণ্ডল বোধহয় নাম ছিল লোকটার। মহীনদাই পাঠিয়েছিলেন। তারপর তো এবাড়িতে প্রায় তিন বছর থাকা হয়ে গেল রণিতার। কোনওদিনই জানলা খুলে বাড়ির বাইরেটা দেখা হয়নি। দেখার ইচ্ছেও হয়নি। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। আজকাল নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়ও সে রণিতাই বলে। অথচ তার নাম তো রণিতা নয়, তার নাম হল খেয়া। তার রবীন্দ্রনাথের ভক্ত বাবা, শখ করে নাম রেখেছিলেন খেয়া। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ওটাই তার নাম ছিল। তার স্কুলের খাতায়, পাড়ার লাইব্রেরির কার্ডে, প্রাইজ পাওয়া মেডেলের গায়ে খেয়া ঘোষ লেখা থাকত। সবাই তাকে চিনতও খেয়া বলেই। এখনও তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পাসপোর্ট সবই ওই নামে। শুধু পর্দায় তার নামটা বদলে গিয়ে রণিতা হয়ে গেছ। নামের পিছনে ঘোষও আর নেই। বাবা খুব অবাক হয়েছিল,

অমন সুন্দর নাম পছন্দ হল না তোর প্রডিউসারের।

মাথা নেড়েছিল খেয়া। বাবার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেনি, শুধু পছন্দ হয়নি নয়, নাম শুনে রীতিমত নাক সিঁটকেছেন প্রডিউসার বরুণ গড়াই।

না না ওসব কাব্যি করা নাম চলবে না। সেক্সি নাম দিতে হবে। আমি বলছি ওর নাম রণিতা রাখুন।

টাইটেল দেবেন না। ওনলি রণিতা। দেখবেন পাবলিক কেমন যাবে।

টাকার থলি যার হাতে, তার কথা তো শুনতেই হবে। অতএর খেয়া থেকে রণিতা। রাস্তার হোর্ডিং–এ নিজের নামের পাশে রণিতা লেখা দেখে প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত। তারপর ওটাতেই অভ্যাস হয়ে গেল। খেয়া ঢুকে গেল রণিতার খোলসের ভিতর। কিন্তু সত্যিই কি তাই! আজকাল মাঝে মাঝে কেমন যেন অবাক লাগে তার। এই খেয়া আর রণিতা কি আসলে একজনই? নাকি দুটো আলাদা মানুষকে জোর করে একজায়গায় ভরে দিয়েছে কেউ?

সেই যে খেয়া বলে মেয়েটা, যে গোবরডাঙা পেরিয়ে আরও ভিতর দিকে মতির বিল বলে একটা জায়গায়

থাকত। ওই অঞ্চলে মস্ত একটা বিল আছে। তার নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে মতির বিল। তখন ওদের দরমার বেড়ার ঘর। কাঠের জ্বালে মা রান্না বসায়। সন্ধে হলেই খিদে পেয়ে যেত মেয়েটার।

আর ওমনি ভাত দাও, ভাত দাও, হাঁক পাড়াগাড়ি। ছোট ছোট হাতে ঠাকুমার শাড়ি ধরে টানাটানি। ফ্রিজ বলে যে কিছু আছে জানাই ছিল না। দুবেলাই উনুনে ভাত বসত। টগবগ করে ভাত ফোটার গন্ধে কেমন যেন খিদেটা জোর হত পেটের ভিতর। বাঙাল বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ঝালের ভক্ত। সবুজ সবুজ কাঁচা লঙ্কা বিছানো ট্যাংরার ঝোল দিয়ে ভাত। রাত ঝুঁঝকো হওয়ার আগেই খাওয়া শেষ। তারপর ঠাকুমার তক্তাপোশে শুয়ে অপেক্ষা। খই- দুধ খাওয়া হলে মানদাপিসি পায়ে তেল ঘষে দেবে। তারপর শোবে ঠাকুমা। হারান মাঝির গল্প বলবে তখন। ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসত বাতাবি ফুলের গন্ধ। আলোর সাম্পানে চেপে চাঁদের বুড়ি উঁকি দিত ঘরের ভিতর। আর ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমোত খেয়া।

বাবা হাইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই। মাইনে তো হাতে গোণা। তবে পাড়ায় সম্মান আছে। শুধু পড়াশোনা জানা লোক বলে নয়, ভালো মানুষ বলে। ছোটখাটো ঝামেলায় লোকে উপেনবাবুকে সালিশির জন্য ডাকে। জমি জায়গা অবশ্য কিছু ছিল। বছরের ধান-চালটা কিনতে হত না কোনওদিনই। আর বাড়িখানা দরমার হলেও, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। ছোটবেলায় নিজেদের কখনও গরীব বলে মনে হয়নি খেয়ার। যতটুকু আয় তাতেই নিশ্চিন্তে সংসার চালাতেন মা। পুজোয় আর পয়লা বৈশাখে জামা হত। পাঁচ বছরের জন্মদিনে ঠাকুমা যখন কানের মাকড়ি গড়িয়ে দিল তখন কি ফুর্তি যে হয়েছিল। সে বছর আবার মাথাও ন্যাড়া করে দিয়েছিল মা। ডিগডিগে রোগা। ন্যাড়া মাথা। কানে মাকড়ি। অবিকল পান্ত ভূভের জ্যান্ত ছানার মত চেহারাখানা নিয়ে গরমের ছুটির পর লাফাতে লাফাতে স্কুলে গেছিল খেয়া। ভাবলে এখনও তার পেট গুলিয়ে হাসি পায়।

সেই কানে মাকড়ি বেলা থেকেই, বাবার কাছেই আবৃত্তি শেখা খেয়ার। নিজে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বই-পত্র আর বাগান নিয়েই থাকত বাবা। বন্ধু-বান্ধব কোনওদিনই বিশেষ নেই। তাশ পাশা খেলারও অভ্যাস নেই। চা-মুড়ি খেয়ে খানিকক্ষণ গল্প হত ঠাকুমার সঙ্গে। বেশিরভাগই ফেলে আসা দেশ-গাঁয়ের গল্প। কেমন ছিল সেখানকার বাড়ি-ঘর-দোর। কেমন মোটা আখ হত। কেমন সোনার বরণ মর্তমান কলা। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছিল খেয়ারও। ঠাকুমা সন্ধে দিতে ঘরে উঠে গেলে বাবা বসে বসে কবিতা বলত। রবীন্দ্রনাথই বেশি। মাঝে মধ্যে অন্য কবিতাও। কোলের কাছটিতে বসে শুনত খেয়া। একটু বড় হওয়ার পর বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা অভ্যাস হয়ে গেল। বাবার ভরাট সুরেলা গলার সঙ্গে তার চিকণ শিশু গলা মিলে-মিশে এক অদ্ভুত সান্ধ্য ঐক্যতান তৈরি হত। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ফেরার সময় মায়ের মুখে মিটমিট করত হাসি।

প্রথমবার পুরস্কার পেল ক্লাস ফাইভে। আবৃত্তিতে ফার্স্ট প্রাইজ। সবথেকে ছোটদের গ্রুপে। তার স্পষ্ট উচ্চারণের নাকি প্রশংসা করেছিলেন বিচারকরা। বাড়ি ফিরে মাকে খুব গর্বের সঙ্গে সেকথা বলেছিল বাবা। তখন তার সবে নয় কিংবা দশ। অথচ কলকাতায় আসার পর প্রথম দিন সংলাপ বলার সময়ই শুনেছিল র-এর দোষ আছে। বাঙাল বাড়ির মেয়ে তো। ঠিক করতে হবে। যেরকম স্পষ্ট, গোটা গোটা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিল বাবা, সেসব বাতিল করে সামান্য একটু আদুরে আধো-আধো ভঙ্গিতে কথা বলা অভ্যাস করতে হল। প্রথম প্রথম অস্বস্তি লাগত। এখন ওটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

বাবাই খোঁজ রাখত। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার খবর পেলেই নাম পাঠিয়ে দিত মেয়ের। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। প্রাইজ না নিয়ে ফেরেনি কখনও। মা আর ঠাকুমার চোখ আনন্দে ঝিকমিক করে উঠত। মতিবালা হাইস্কুলেও গেছিল আবৃত্তি করতেই। তাদের জেলার বেশ নামকরা স্কুল। বিচারক ছিলেন মানস ভৌমিক। তখন অবশ্য তার নাম-ধাম কিছুই জানত না তারা। প্রাইজ দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর খেয়াকে ডেকে নাম-ঠিকানা

নিয়েছিলেন। তার কদিন বাদেই গাড়ি নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির। সেদিন সঙ্গে মহীনদাও এসেছিলেন। তখন জানা গেল মহীন রায় হচ্ছেন একজন পরিচালক। টিভিতে সন্ধেবেলায় মা-ঠাকুমা যে মুগ্ধ হয়ে যে সন্ধ্যাতারা সিরিয়ালটি দেখে, সেটা নাকি তিনিই বানিয়েছেন। আর মানস ভৌমিক তাঁর খুব কাছের বন্ধু। মহীন রায় নতুন সিরিয়ালে কাজ শুরু করবেন। ভাতে নায়িকা নাকি গ্রামের মেয়ে। সেই রোলে ওঁদের মনে হয়েছে খেয়াকে মানাবে। তাই বলতে এসেছেন।

কথা-বার্তা শুনে তো আনন্দে ততক্ষণে খেয়ার বুকের ভিতর ধুকপুক করছে। টিভিতে তাকে দেখাবে। সিরিয়ালে অভিনয় করবে। সে তো একেবারে স্বর্গের হাতছানি। মা ভয় পাচ্ছে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ঠাকুমার অবশ্য ভয়-ডর মোটে নেই। বরং সন্ধ্যাতারায় অমন ভালোমানুষ মিনুর বরকে ফুসলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে মেয়েটা তাকে যে মোটেই ঘরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয়নি সে বিষয়ে দিব্যি মহীন রায়কে জ্ঞান দিচ্ছিল। তবে বাবা বেশ আগ্রহ নিয়েই সব শুনল। ওঁরা যদিও বলেই দিলেন। শুধুমাত্র দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই যে চান্স পাবে তা মোটেই নয়। আগে অডিশন হবে। স্ক্রিন টেস্ট হবে। সেসবে যদি উত্তরে যায়, তখন কাজ করতে পারবে। আর প্রতিদিন কাজের জন্য যে টাকা দেবে, সেই অঙ্কটা শুনে তো বাবার চোখ কপালে। চলে যাওয়ার পর ঠাকুমা বলল,

রাজি হইয়া যা উপেন। মাইয়ার বিয়ার জন্য আর টাহার ভাবনা ভাবতি হবে না...

স্টুডিওপাড়ায় অডিশন দিতে এসে অবশ্য খতমত খেয়ে গেছিল বাবা-মেয়ে দুজনে। শুধু তো সে নয়। আরও অনেকে এসেছে। ঝকঝকে জামা-কাপড় পরা, স্মার্ট, ঝরঝরিয়ে ইংরাজি বলতে পারা কিশোরীর দল। সেই প্রথম হীনমন্যতা জেগেছিল খেয়ার। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে গরীব মনে হয়েছিল। অডিশন ভালো হলেও ধরেই নিয়েছিল তার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বাবাও তাই ভেবেছিলেন। ফেরার সময় ট্রেনের জানলার ধারে মুখ শুকিয়ে বসে থাকা মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন,

মন খারাপ করিস না। জীবনে অনেক সুযোগ আসবে। তাছাড়া না পেলে একদিকে ভালই। সবে এগারো ক্লাসে ভর্তি হয়েছিস। এসব করতে গেলে পড়াশোনাটা ডিস্টার্ব হবে।

কিন্তু সে পেল। কয়েকদিন পরে ফোন এল বাবার কাছে। মহীন রায় জানালেন, তাঁর নতুন সিরিয়ালের জন্য খেয়াকেই নির্বাচন করেছেন তাঁরা। আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেছিল খেয়া। স্টুডিও আলোর ঝলমলানিতে পরীক্ষা পড়াশোনা এসবের চিন্তা কোন অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছিল কে জানে।

প্রথমে কিছুদিন চলল গ্রুমিং। কেমন করে কথা বলতে হবে, হাঁটতে হবে, দাঁড়াতে হবে, সাজ-গোজ করতে হবে সেসবের ট্রেনিং। তারসঙ্গে অভিনয়ের ওয়ার্কশপ। চৈতালিদির সঙ্গে সেখানেই পরিচয়। উচ্চারণ থেকে শুরু করে ডায়লগ থ্রোয়িং, মুখের এক্সপ্রেশন সব শেখাতেন চৈতালিদি। পছন্দ করতেন খেয়াকে। একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

তোর মধ্যে পার্টস ছিল রে মেয়ে। অভিনয়টা তোর আসে। এত ছোট বয়সে সিরিয়ালে ঢুকে গেলি। কিছুই আর কাজে লাগবে না।

তখন কথাটার মানে বোঝেনি খেয়া। তবে সিরিয়ালে অভিনয়ের সমালোচনা করছে বুঝে একটু রাগ হয়েছিল। মাস চারেক পরে শ্যুটিং শুরু হল। এতদিন বাড়ি থেকেই আসা-যাওয়া চলছিল। প্রথমদিকে মা কিংবা বাবা নিয়ে আসত। তারপর নিজেই আসা অভ্যাস হয়ে গেল। কিন্তু শ্যুটিং শুরু হতে আর সময়ের কোনও ঠিক নেই। কোনওদিন রাত এগারোটায় প্যাক-আপ হচ্ছে। কোনওদিন ভোর পাঁচটায় কল টাইম। মহীনদা পরিষ্কার বলে দিলেন, কাজ করতে হলে কলকাতায় থাকতে হবে। কিন্তু থাকবে কোথায়? বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা মেয়ে থাকবে সে তো আর হতে পারে না। অথচ বাবার ইস্কুল আছে। মা না থাকলে সংসার অচল। 'কাজটা তাহলে ছেড়ে দেওয়াই ভালো, পড়াশোনাটাই শেষ করুক।' এমন একটা কথা যে বাড়িতে ঘুরপাক খাচ্ছে বুঝতে পারছিল

খেয়া। এটাও বুঝতে পারছিল এই ছয়মাসে সে নিজেও বদলে গেছে অনেকখানি। মতির বিলের স্কুলে এগারো ক্লাসে ভর্তি হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কলকাতার ভাড়াবাড়িতে সে একাই থাকবে। একা থাকার স্বাধীনতাটা তার দরকার।

সিরিয়ালের নাম সাঁঝবাতি। ট্রেলার রিলিজ হওয়ার সময়ই বরুণ গড়াইয়ের ইচ্ছেয় তার নাম বদলে রণিতা হয়ে গেল। আর পঞ্চাশ এপিসোডের সেলিব্রেশন যেদিন চলছে সেদিন রাতে প্রথমবার অনিকেত এসেছিল তার বাড়িতে। সেই প্রথম সঙ্গম, প্রথমবার পুরুষ শরীরের স্বাদ। অনিকেত তার মত আনাড়ি ছিল না মোটেই। বিছানায় মেয়েদের খুশি করতে জানত। তার আদরে ভেসে গেছিল খেয়া। সাঁঝবাতি দারুণ হিট করল। বিজ্ঞাপনের অফারও এল বেশ কয়েকটা। ততদিনে দিনভর শ্যুটিং, লেটনাইট পার্টি, পার্টিতে মদ খেয়ে নাচ, চারপাশে মুগ্ধ পুরুষের ভিড়, মাঝে মাঝেই বদলে যাওয়া শয্যাসঙ্গী এসবে অভ্যাস হয়ে গেছে রণিতার। এমনকি একদিন রাতে বাড়ি পৌঁছতে এসে গাড়িতেই মহীনদাই যখন জড়িয়ে ধরে জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন তখনও কিছুই মনে হয়নি। বরং ইচ্ছে করেই মহীনদাকে আরও খানিকটা লোভ দেখিয় ঘরে নিয়ে এসেছিল। স্টুডিওপাড়ায় মহীন রায়ের সঙ্গে বিছানায় যেতে পারে যে মেয়ে তার যে আলাদা কদর সে তো সবাই জানে।

গোবরডাঙায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল অনেকদিনই। গেলেও হয়তো রাতে গিয়ে পরদিন সকালে চলে আসা। সময় থাকত না। ইচ্ছেও হত না। তাছাড়া অসুবিধাও হত। রোজকার অভ্যাসগুলোও তো বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ। সাঁঝবাতি চলেছিল টানা তিন বছর। এরমধ্যে বাড়ি বদলে ছিল রণিতা। গাড়িও কিনে ফেলেছিল। অনিকেত নয়। তখন তার পার্টনার রাহুল। সাঁঝবাতি শেষ হতে না হতেই ইমেজ প্রোডাকশন থেকে অফার এল। এবারও লিড রোল। টাকার অঙ্কও অনেকটাই বেশি। টেলিকাস্ট শুরু হওয়ার বছরখানেক বাদেই এই ফ্ল্যাটটা কিনল রণিতা। স্টুডিওপাড়ায় যাতায়াত করা এক প্রোমোটারের তাকে চোখে লাগায় ফ্ল্যাটটা সস্তাতেই হয়েছিল। তবে ফ্ল্যাট সাজাতে হাত খুলে খরচা করেছিল সে। রোজগার তো কম নয়। তারমত বয়সে অত টাকা রোজগার কতজন করতে পারে। এই তো সবে জীবনের শুরু। মানুষের মুখে মুখে তার নাম। মবড় হওয়ার ভয়ে রাস্তায় বেরোতে পারে না। সামনে পড়ে আছে অন্তহীন রূপোলি পথ। কতকিছু করবে সে এখন। সিনেমায় নায়িকা হবে। কলকাতায় না পোষালে মুম্বই। শ্যুটিং- এর ফাঁকে ইউরোপ ট্যুর। খুশিমত মার্কেটিং....।

ইমেজ প্রোডাকশনের নয়নতারা বেশ ভালো চলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনবছর পর নয়নতারা যখন শেষ হল, তার হাতে প্রথমটায় কোনও নতুন কাজ এল না। পরপর দুটো মেগা সিরিয়ালে নায়িকা হয়ে সে নাকি দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। সিরিয়াল হিট করানোর জন্য এখন ফ্রেশ মুখ দরকার। যুক্তিটা মাথায় ঢুকছিল না রণিতার। প্রায় ছয়মাস কোনও কাজ নেই। মানুষ যে দ্রুত তাকে ভুলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল রণিতা। রাস্তাঘাটে আগের মত দেখলেই ভিড় জমে যায় না। স্টুডিওপাড়ার সব পার্টিতেও ডাক পায় না। ভিতরে ভিতরে সে যখন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে, তখনই ফিনেস থেকে অফারটা এল। তবে নায়িকা নয়, সেকেন্ড লিড। রাজি হয়েছিল তাতেই। তার ধারণা ছিল অভিনয় দিয়ে সে নায়িকাকে টপকে যাবে। কিন্তু চিত্রনাট্য তো নায়িকাকে ভেবেই লেখা। সে পাত্তা পাবে কেন ? লাভ হল না কিছুই। টাকাটাও অনেক কম। বাড়ি-গাড়ির ইএমআই দিয়ে হাতে তেমন কিছু থাকে না। আর একটা নায়িকার রোলের জন্য রণিতার তখন ডেসপারেট অবস্থা। প্রডিউসার থেকে ক্যামেরাম্যান কারও সঙ্গে বিছানায় যেতেই আপত্তি নেই। শেষ পর্যন্ত সত্যম ঝুনঝুনওয়ালাকে ধরে, তাদের প্রোডাকশন, উনিশ-বিশ-এ ফের পাওয়া গেল লিড রোল। ঋত্বিকের সঙ্গে আলাপও সেই মেগার সেটেই। শ্যুটিং চলছে। সেই সঙ্গে তাদের তুমুল প্রেমও। বড় হাউস। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রিলিজের অনুষ্ঠান। ঝলমলে আলো, মেক-আপ, পার্টি একটু একটু করে আবার জীবনটা ছন্দে ফিরছে ভাবছিল রণিতা। ইতিমধ্যে বছর সাত-আট বয়স বেড়েছে। কেরিয়ারটা একটু দাঁড়িয়ে

গেলেই বিয়েটা সেরে নেবে ঠিক করে ফেলেছিল রণিতা। ঋত্বিক বড়লোকের ছেলে। একবার সাতপাকে বাঁধতে পারলে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের মিল যে হবেই তা তো আর নয়। বছর পেরোনর আগেই টিআরপি পড়তে শুরু করল উনিশ–বিশের। দুবছর অন্তত চলার প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল দেড় বছরের মাথায়। তারপর থেকে প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল হাতে কোনও কাজ নেই রণিতার। ঋত্বিক চলে গেছে অনেকদিন। গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয়েছে। বাড়ির ইএমআই চারমাস বাকি। ব্যাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছে ফ্ল্যাটটা এবার ছেড়ে দিতে হবে। জমানো টাকা তলানিতে। রাস্তায় বেরোলে এখন আর কেউ চিনতে পারে না তাকে। পাঁচতারা হোটেলের পার্টিতে ডাক পড়ে না। ম্যাড়মেড়ে স্কিন। চোখের নীচে কালি। শুকনো চুল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না রণিতা। রণিতাকে না, খেয়াকে তো নয়ই। অথচ এখন তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আবার খেয়া হয়ে যেতে। ফিরে যেতে গোবরডাঙার সেই দরমরা বাড়িটাতে। ফ্ল্যাট কেনার পর গৃহপ্রবেশের পুজোয় মা-বাবা এসেছিল। রাতে থাকেনি। সেও বলেনি থাকতে। কতদিন ফোন করেও জিজ্ঞাসা করেনি, 'কেমন আছ, ঠাকুমা কেমন আছে। বাতের ব্যথাটা কি কমেছে একটু?' নিজের জীবন থেকে স্বেচ্ছায় ছেঁটে ফেলেছিল যাদের, এখন কী করে ফিরে যাবে তাদের কাছে?

জানলার বাইরে আকাশটার দিকে তাকায় খেয়া। কার্তিক মাসের আকাশে জুড়ে তারা ফুটে আছে। কী একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। শিউলি না ছাতিম চিনতে পারছে না। আসলে বড্ড ঘুম পাচ্ছে তার। চোখদুটো ভারি হয়ে আসছে ক্রমশ। নতুন ব্লেডটা সকালেই কিনে এনেছিল পাড়ার দোকান থেকে। তবে রক্ত দেখলে মাথা ঝিমঝিম করে বলে হাতের দিকে আর তাকায়নি। চোখ পেতে রেখেছিল জানলার বাইরে ওই দিগন্তে মেলে রাখা চুমকি বসানো কালো ওড়নাটার দিকেই। ঝিকিমিক সেই ওড়নাটাই নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে একটু একটু করে ঢেকে ফেলছে তাকে। ক্রমশ কমে আসছে বাতাস। ঢেউ ভাঙছে শরীর জুড়ে। রণিতা বুঝতে পারছে তার হাত ধরে খেয়াও ডুবে যাচ্ছে সেই অন্তহীন অন্ধকারের সমুদ্রে।

প্রথম আলো-কে

শুভেচ্ছা

একজন শুভানুধ্যায়ী

নিছক গল্প
ভারতী মিত্র

কোলের কাছের আলোটা জ্বালিয়ে এতক্ষণ একটা বই পড়ছিলেন শিবপ্রসাদ নন্দী। অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শিবপ্রসাদ, বয়েস তেষট্টি।

পাশের সিটের মেয়েটিও প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর তার ল্যাপটপ খুলে মনোযোগ দিয়ে খুটখাট করছিল।

মেয়েটির বয়েস বছর তিরিশের বেশি হবে না। বেশ সুশ্রী। চোখদুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। দাঁতের পাটি ঝকঝকে সাজানো, হাসিটিও ভারি মিষ্টি।

এহেন সহযাত্রী পেলে কার না মন ভাল হয়ে যায়? শিবপ্রসাদেরও বেশ চনমনে লাগছিল।

একটু যা কথা হয়েছিল তাতে জানা গেছে, মেয়েটি টিভির স্পোর্টস রিপোর্টার। আর্জেন্টিনায় এবার যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলা শুরু হবে, আমেরিকার সিয়াটল শহরের একটি লোকাল টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি হয়ে সেই খেলাই কভার করতে তার এই সফর।

নিজের কথা বলতে গিয়ে শিবপ্রসাদ শুধুই বলেছিলেন 'ট্যুরিস্ট'। আর কিছু বলেননি।

ভেবেছিলেন আবার কথাবার্তা শুরু হলে আস্তে আস্তে বলবেন।

কিন্তু মেয়েটি তো এবারে খাবার আসতে দেরি দেখে আলো নিভিয়ে ঘুমোবার যোগাড় করছে মনে হচ্ছে!

তাঁরও কি তাহলে নিজের পার্সোনাল আলোটি নিভিয়ে দেওয়া উচিত? নয়ত মেয়েটির অসুবিধে হতে পারে।

সাতপাঁচ ভেবে শিবপ্রসাদ আলো নিভিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। অন্ধকারে এই সুন্দরীর সান্নিধ্যে বেশ লাগতে লাগল।

প্রথম আলো-কে
শুভেচ্ছা

একজন শুভানুধ্যায়ী

রফিক আজাদ

বৃষ্টি ২

এখন আপনার চিঠি খোলা যায় এই পরিবেশে:
এ কী করছেন! খামে ভরে কেউ কারুকে পাঠায়
গোবি-সাহারার দীর্ঘ হাহাকার, চীনের প্রাচীর?
স্তব্ধ হয়ে থাকি চিঠি প'ড়ে: সারাটা দুনিয়া জুড়ে
মানুষের এ্যাতো দুঃখ,—এর থেকে পরিত্রাণ নেই?
বৃষ্টির প্রপাত শুনে, গাছের সবুজে চোখ রেখে
শিশুদের গালে চুমো খেয়ে আমরা পারি না ফের
এই দুঃখী গ্রহটির অন্তর্গত অসুখ সারাতে?

অসীম সাহা

ম-বর্ণের প্রবল ভ্রূকুটি

বাতাসের প্ররোচনা পেয়ে পেয়ে তিনটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা হেঁটে গেলে
আদর্শলিপির পাতা থেকে ঝরে পড়ে ম-বর্ণের সোনালি পেখম।
ধারালো খুরের ঘায়ে নেশাগ্রস্ত মাতালের ঘুম ভাঙলে
গাওয়া হয় ফেরারি গজল। জয়পুর পার হয়ে দিল্লির পথে পথে
ঠুমরির ঘুঙুরগুলো ফেলে যায় শাবানা ডাগর।

জাবর কাটতে থাকে ব্যাকরণ, ছন্দের বারান্দা থেকে নেমে এসে
শঙ্খ ঘোষ মসৃণ রেলিং জুড়ে এঁকে দেয় পয়ারের অভিনব দোলা;
মহুয়ার ফুলে ফুলে ঘাড় কাৎ করে করে দোল খায় মাধবী-মল্লিকা।

এ কেমন ছায়াচ্ছন্ন রাত? অন্ধকারে শরীরের হেলানো চাবুকে
মসৃণ হচ্ছে যেই নিতম্বের দোলা, জোনাকির পশ্চাতে
প্রাচীন যুগের এক অ্যামিবা-ই জ্বলে উঠে নীল করে তুলছে করোটি!
এরই মধ্যে কালি ও কলম হাতে সীতানাথ বসাকের অযাচিত
বর্ণের প্রলোভন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মেখে দিচ্ছে
গলিত সিসার স্রোত। তারই মাঝে নেংটি ইঁদুরের মতো
দোল খাচ্ছে আরো এক ম-বর্ণের প্রবল ভ্রূকুটি।

সুশীল মণ্ডল

ওম

শীতশেষে আমাদের প্রাঙ্গণে কিছু ওম
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে,যাতে মানুষ
জটলা করতে পারে। চাপান-উতোর খেলতে খেলতে মানুষেরা
রেল লাইন ধরে হারিয়ে যায়
আর আমি নিজের মর্জির মধ্যে ডুবে থাকি।

অনিশ্চিত এলোমেলো জীবনে
ধিকিধিকি বেঁচে থাকার গল্প জেগে থাকে
জীবনের খোঁজে।
যে জীবনে দু-দণ্ড স্মিত হাসি
শেষ রাতের চাঁদের মতো
একটা মায়াময় সম্পর্কের কথা বলে।

পম্পা দেব

দ্বিতীয়মন

দ্বিতীয়মনটি ঘিরে,
সতত সংশয়, তবু
সে কেবল ঘাই মারা মাছ,
নিরিবিলি জলাশয়ে মাঝেমাঝে তীব্রতর হয়,
কোথাও কিছুটি নেই, শূন্য কুয়াশায়
বৃত্ত ভেঙে ভেঙে জন্ম বদলায়,
নির্জন প্রান্তরে সেই জানে শুধু,
বহু যত্নে লুকনো আহির
কখন বাজিয়ে যায় গোপনে নিবিড়ে।

জাহানারা পারভিন

নিমগাছের পরিচয়পত্র

নিমগাছটাকে চিনতেই পারিনি
ভেবেছি সে ছাতিম, সেগুনের সন্তান
সে বলেছে সব হাতেই থাকে কিছু তিতে রেখা
সরু পথ ধরে কিছুটা হেটে আসা যায়
আবার ফিরে আসতে হয় পুরোনো পৃষ্ঠায়
যেমন ফিরে আসে
হুইল থেকে সুতো নিয়ে ছুটে যাওয়া মাছ
শিকারির হাতের নাগালে
পড়ি বিদ্রুপ, বিদ্রোহ,
মুখোশের আড়ালে থাকা মুখ
শিং মাছের ঘাই খেয়ে হেসে ওঠা মানুষ
দেয়ালে টানিয়ে রেখেছি জেদ; ফ্রেমে নিম কাঠ,
যার নাম ধরে ডেকে উঠেছিলাম একদিন...

বিমল মণ্ডল

যতটুকু দেখেছি

তোমাকে যতটুকু দেখেছি, তার কতটুকু বা বুঝলাম?

তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গে যতটুকু ছায়া ধরে ততটুকু আমারও
বাকিটা চাঁদের কাছে তোমার থাক। তুমি চাঁদঘড়ি হয়ে
আমার হৃদয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলের রেখা ধরে
যতবারখুশি ভাষাবাণ ভেদ করে যাও
আমার হৃদয়ের এপাশ-ওপাশ ফুঁড়ে
রেখে যাও স্মৃতিহাঁস।

তোমাকে যতটুকু দেখলাম, তা সবটুকু নয়।

এতো দেখা,এতো কথা তবুও কেন যেন আড়াল
সব শুদ্ধ মনটুকু আশার আলো জ্বালে।

তোমাকে যতটুকু দেখেছি, তা হৃদয়ে অপূর্ণতার চিত্র শুধু

বাকিটুকু ঈশ্বর আয়নায়...

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

এসো সুদিন

এসো সুদিন, অন্তহীন
প্রতিক্ষণ
বাড়াই হাত, সন্ধ্যা–রাত
বসি বিজন

পায়ের শব্দে দুয়ার খুলি
ঝরা পাতা
আঁজলা ভরা শিউলি ফুল
মালা গাঁথা

সবই তুচ্ছ সবই অলীক
তাই কি হয়
বর্ণ আলোর এই যে মেশা
ভুল তো নয়

কালীকৃষ্ণ গুহ

মঙ্গলদীপ

নববর্ষের শুভেচ্ছায়
মনে হলো খুব ভালো আছি
মনে হলো সব গাছপালা
বেড়ে উঠেছিল কাছাকাছি।

কাক পায়রারা ভিড় ক'রে
কত ওড়াউড়ি করেছিল
পিঁপড়েরা এল দলে দলে
আনন্দঘন দিন শুরু।

আনন্দ থেকে প্রকাশিত
যা-কিছু বিশ্বভুবনের
যা-কিছু বিষাদ অর্জিত
একাকী জীবনে নিঃসাড়।

কিছু কথা বলা বাকি আছে
আজো চেনা নয় ঘরবাড়ি
নগ্ন নারীরা জ্বেলেছিল
মঙ্গলদীপ— যত তারা।

রুদ্রশংকর

বহুদিন ঘুমোইনি বলে

বহুদিন ঘুমোইনি বলে
হাত ধরে বহুবার নেমেছি জলে

যদি হয়, হোক আনন্দ বিনিময়
গায়ের ঘাম কখন যে হঠকারী হয়!

কয়েকটা ঢেউয়ে ভেসে যায় পাখি
নাই বা লুকোলে,

যা কথা ছিল বাকি...

দিলীপ চক্রবর্তী

খুঁজে নাও

রোদে শুকিয়ে মরে গেছে সবুজ মাঠ,
আশায় থাকে কবে হবে বারিপাত
বয়ঃভারে ক্লান্ত প্রবীন অপেক্ষায়
থাকে কবে হবে পূর্ণ তার কাঙ্খিত
স্বপ্ন–আকাঙ্খা ও প্রাপ্তির মিলন।

বৃষ্টিস্নাত নব যুবতীর উত্তপ্ত কোমল
শরীর অপেক্ষায় থাকে – কখন হবে
নতুন সৃষ্টির সূচনা।

দারিদ্রে অবহেলায় লালিত ছোট্ট শিশু
অপুস্টি ও জরার শিকার – পীত
চক্ষু নিয়ে খুঁজে বেড়ায় ভালবাসা আর
মাতৃত্বের আশ্রয় – এক টুকরো আস্থার
আকাশ, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বার্থপর পৃথিবীর
তীক্ষ্ণ দাঁত ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় ওর
সে স্বপ্ন, লোভ আর অবিচারের আগুনে
পুড়ে যায় ভালবাসা আর সত্য, থাকে শুধু
অন্ধকার আর বঞ্চনা।

এখানেই আছে দাঁড়িয়ে বিশাল বটবৃক্ষ ওর
অকৃপণ ছায়াঘেরা উষ্ণহৃদয়ের ঈশারা –
এখানে এসো বসো, উপশম করো তোমার
যত ব্যথা বেদনা। বিশাল পৃথিবী এখনও
ছড়িয়ে রেখেছে আশার সবুজ কার্পেট, শুধু বেছে
নাও তোমার পছন্দের টুকরো – ফিরে পাবে
সত্যের আলো, ভালবাসা আর জীবন।

প্রীতি সান্যাল

সংবাদ

There was a stir in Uluberia, Bengal 45 newborn feutuses found in the garbage heaps

আমি কোলকাতা তেমন চিনি না
প্রতিদিন একটু একটু করে দেখা
একটু একটু কানে শোনা
খবরে অনেকটা পড়ে ফেলা তাও।

উলুবেড়িয়া
আমি কখনো যাই নি সেখানে ভাগাড় আছে
কি করে জানব!
অথচ আজ আমি শুনতে পাচ্ছি
কচি শিশুদের কান্না, কাঁচের বয়ামে ধাক্কা
দেখতে পাচ্ছি অদৃশ্য হাতের মুঠো
উঠে আসছে জঞ্জাল ঠেলে
সারি বেঁধে অজস্র ভ্রূণের সারি যারা
বাঁচতে চাইছে
এই বিষাক্ত শহরে
নিষ্ঠুর শহরে।

মনে পড়ে যায় আমার হারানো শিশু
জন্মমুহূর্তে চলে যায় হিমঠান্ডা মৃত্যুভূমিতে বিদেশে
চোখেই দেখিনি
তাকে নাকি আদরে যতনে
পোষাক পরিয়ে কালো কফিনে রাখা হয়
কবরে যাওয়ার সময় সেইখানে যেখানে
জানি না কাদের ভুলে চলে যাওয়া শিশুদের শেষ আশ্রয়।

মনে হয় ছুটে যাই উলুবেড়িয়ায়
ওই শিশুদের মুঠি হাতে চেপে ধরি
মাতৃত্বের আচারে বিচারে ঘুরিয়ে ফেরাই প্রাণ
‘‘বলি ফিরে আয়।’’

ধীমান ভট্টাচার্য

অলীক

একলা ছাদে তোমায় আমায়
ভর দুপুরে আকাশ মাথায়
শাড়ির আঁচল উড়ছে হাওয়া
তোমায় নিজের করে পাওয়া
না বলো না, জড়িয়ে ধরো
উপোসী মন, সবুর করো
ছাড়ো আমায় দেখবে লোকে
কখন কার বা পড়বে চোখে
কথা দাও কবে আসবে বলো
জানি না, এখন নিচে চলো
হয়তো দেখা আর হবে না
বাড়িও না আর বিড়ম্বনা

দিলীপ সাঁতরা

জুতো পালিশ-দুই

আজকেও চলে আসছিলাম
হাত নেড়ে বলেও দিলাম
না
আজকে জুতো পালিশ করব না।

বাবু জুতোর সেলাই খুলে গেছে
আসুন সেলাইটা করে দেব
চেয়ে দেখলাম সত্যি সত্যিই তো
জানতাম না জুতোর অবস্থা।

বললাম তবে দে সেলাই করে
পালিশ করতে হবে না
কালকে করব
ট্রেনের খবর হয়ে গেছে
তড়িৎ সন্দীপ বসার জায়গায় বসে গেছে।

ট্রেন আসার আগেই
জুতো সেলাই করে দিল
আর আমি না বললেও
তাড়াতাড়ি করে জুতো দুটো
ঘষেই চকচকে করে দিল
তবু বললাম পালিশ কালকে করে দিস
আজকে কত দেব
দশ টাকা দেন।

টাকা দিয়েই ট্রেনে উঠলাম
তড়িৎকে অনুসরণ করে
আর ভাবলাম
আজকেও বোধহয় ভাল কাজ হয়নি
তাই এতো কাজ করে
মজুরি নেওয়ার টানাটানি।

কালিদাস ভদ্র

জল

জলের ভেতরে আমি
বেঁচে থাকতে চাই

নদীর ভেতরে সাগরের ভেতরে
যেভাবে জল বেঁচে থাকে
জলের ভেতরে তিমি, কুমির
রুপোলি ইলিশ
আর চারপাশে জনপদ
তীর্থস্থান, শ্মশান
প্রথম আলোয় জেগে ওঠে

জলই জীবন
অহরহ মৃত্যুর চৌকাঠে
দাঁড়িয়ে
দু চোখ নাচায়

জলের ভেতরে আমি
বেঁচে থাকতে চাই
যেভাবে জল চোখের কোণে
বেঁচে থাকে অজেয় কবিতা হয়ে

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

রন্ধনের আগে

পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসা পাথুরে রহস্য
ঘিরে থাকে পান্থশালা, অলৌকিক বিশ্ব
হাতের নাগালে চন্দ্রাহত তরুণীর বেশবাস।
তবু দূরে থাকে যতি চিহ্নহীন কবিতার পাণ্ডুলিপি
একটা ভরন্ত সন্ধ্যা ডালা খুলে বসে
দিন তখনও ঝিমোয় মজা পুকুরের পাড়ে
শানবাঁধানো দিঘিতে কর্ণ বরাবর হেঁটে যায়
দিনান্তের ছায়া
আমাদের হাতে ধরা কবিতার যষ্টি
জীবনানন্দ ও শক্তি
উঠোনজুড়ে বিনয়ের পাশাপাশি উৎপল বসু
দিক বদলের গল্প প্রতিবেশী উনুনের ধোঁয়ায়

ফেরবার আগে একবার প্রদক্ষিণ
বলে আসা কথার সাথে গল্পগুজব
এই তো সন্ধ্যা নামার বর্ণপরিচয়
তবু রাত্রির অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন
শিউলির ডালে ডালে, মাচার পটলে
পাঠশালার স্বীকৃত বেতে।

মেঘহীন আকাশ থেকে বজ্রপাত
একটি প্রবাদমাত্র
লুকানো মেঘের সংবাদ না রাখার দার্শনিক ব্যাখ্যা
আমরা নেই এসব আত্মসমীক্ষায়

মেঘ ও বজ্রের সমীকরণ উলটে
কবিতার জন্য রন্ধনের আয়োজন

কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়

অন্বেষণ

অভিধানে কিছু নিরুদ্দেশ শব্দ খুঁজি
আত্মবীজ লুকিয়ে থাকে যেখানে
অক্ষরের আড়ালে ওরা নষ্টসময় মাত্র
যেখানে ক্রমশ পুড়তে থাকে ইহজীবন

খুঁজি কিছু সঞ্চিত অসাবধানী অজুহাত
অধীনতার অনুপাত যেখানে শূন্য
খুঁজি একটা চতুষ্কোণ চৌকাঠের ওপারে
কিছু দুর্বোধ্য মোড় আর বাকলের স্তর
যেখানে আসা যাওয়া করে বালিকাবিকেল
খুঁজি মৃত পাতার ভিতর ক্লোরোফিলের রঙ

কিছু অনুভূতি কিছু অনুবোধ আসে এভাবে
তখন শহরজীবনের সব ঘ্রাণ অচেনা লাগে
নিরঙ্কুশ শর্তহীন অন্বেষণে ওরা আসে কখনও
সূর্যাস্তের সঙ্গে লেগে থাকা মৃত আলোয়
ঝুল বারান্দায় পড়ে থাকা শূন্য কফির কাপে
অলৌকিক কিছু অতীত নির্মাণের মতো

অনাশ্রিত মৃগয়ার গায়ে দাগ একসময় ফিকে হয়
ধুলোমাখা আয়নার গায়ে লাল টিপ ভ্রূলেখা খোঁজে
তখন শরীর জুড়ে মৌরীফুলের গন্ধ ভাসে
তখন বৃষ্টিশেষে রাতের ভিতর রাত নামে

সমরেশ চৌধুরী

কিছুই পারিনি

বিশ্বাস করো হে বসুন্ধরা আমি পারি না কিছুই

জলের মতো সহজ ভেবে ধরতে চেয়েছি যতগুলো হাত
আঙুলের ফাঁক গলে পড়েছে অশ্রু
যতবার দিয়েছি নতুন নাম ততবার খসেছে ফলক
পারিনি কিছুই পারিনি
গাছেদের আড্ডায় দুই এক কলি গান শুনিয়েছিল যে পাতা
খসে গেছে বিষ বাতাসে
বাতাসের গায়ে প্রজাপতি রঙের পাখনা উড়িয়ে ছুটে গেছি অরণ্যে
পারিনি তবুও পারিনি
আদিবাসী নারীর বক্ষবিভাজিকায় উষ্কির অর্থ সন্ধানের
এই নদীমাতৃক তৃণভূমে কোথাও খুঁজে পাইনি নরম মৃত্তিকা
আমি পারি না জন্ম দিতে ফসলের
ক্ষুধার্ত আবেগের লজ্জার কোষে
ধুয়ে গেছে মেঘ
কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ধূসর গোধূলি আমাকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে নদীর স্থিরতা
প্রবাহের মুখে চুম্বনের নোনতা সুখ কেড়ে নিয়েছে ইহকালের মায়া
পারিনি আমি কিছু পারিনি পারি না আমি
উন্মাদের রিক্ত জঠরে সাবালক হতে!

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কথার কঙ্কাল

আমার সমস্ত কথা শেষ হয়ে গেছে গতকাল
এখন সর্বত্র শুধু কথার কঙ্কাল
কথা শেষ হয়ে গেলে স্মৃতিকথা ভাসে
নদীর মোহনা থেকে ভূর্জপত্র কলার মান্দাসে
ন্যুব্জ হয়ে পথ হাঁটছে দীর্ঘতম মানুষের ভুল
শ্রমণ সতৃষ্ণ চোখে সংগ্রহ করেছে কিছু ভিক্ষার তন্ডুল
আঘাতে বিদীর্ণ এই অস্তিত্বের অভ্যন্তরে কিছু স্বপ্নে ভেসে থাকে তীব্র নিধুবন
যাপনের আলো যেন নিছক মায়ায় গড়ে অলীক বুনন
বেঁচেবর্তে থাকা এক মার্জারের ক্ষিপ্রতায় মৎস্য-সারাৎসার
আহা এভাবেই দিন কাটে, কেটে যায় অনন্ত বিহার/ উৎসবের উদযাপন হয় চমৎকার

মৃণালকান্তি দাশ

শোক

হত্যার কাছে বলেছি, রক্ত নয়,
অশ্রুকে বলি, মুছে ফ্যালো দুই চোখ—
বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে সংশয়,
যা হবার তাই এই মুহূর্তে হোক।

কবিতার খাতা রেখেছি অন্ধকারে,
সেখানে উপমা, চিত্রকল্প নেই—
সুর ভেসে গেছে অলকনন্দা পারে,
এবার কি তার মুক্তি অনন্তেই!

বুকের ভিতরে কালো কালো অক্ষর,
হয়তো চেয়েছে কাঙ্ক্ষিত ছাপাখানা—
যে-পাখি আকাশে কখনও পায়নি ঘর,
ধুলো ঝেড়ে ফেলে ঝাপটায় দুই ডানা।

দূর থেকে আজ দেখে অমর্ত্যলোক—
মৃত্যুর কাছে মন্ত্রমুগ্ধ শোক!

কানাইলাল জানা

সংসার সীমান্তে

অবসর জীবনটা ঢেউ খেলানো দিনের মতো বেশ। যেই মেয়ে বউ বেরিয়ে যায় যে যার কাজে, মেলামেশার ক্ষেত্র যায় পাল্টে। 'আয় আয়' বলে কাছে ডাকে বারান্দার গোলাপ। তাকে সোহাগ করছি দেখে হাতে টান মারে দেয়াল পেন্টিং। কানে কানে বলেঃ 'তোমার থেকেও কত বেশি একাকীত্বে ভোগে জানো আমার সৃষ্টিকর্তা?' নড়ে চড়ে বসে ফাঁকা চেয়ার টেবিল। তাদের গায়ে একটু স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছি কী চাপা আওয়াজ গম্ভীর ফ্রিজের। ডালা খুলতেই হৈ হৈ করে ওঠে দমবন্ধ করে থাকা শাকসবজিঃ 'একটু আদর দাও না প্লিজ', দুহাত বাড়িয়ে সকলেই অস্থির...

আচমকা ঝড় ওঠার পরিস্থিতি। বইঘরে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! হলুদ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে পড়েছে হাজার হাজার চরিত্র। ঢাল তলোয়ার হাতে যাকে বলে সশস্ত্র বিদ্রোহ! পরিস্থিতি সামলাতে নিচু স্বরে সবাইকে বোঝাইঃ 'ফিরে যাও যে যার জায়গায় কারণ বাকি জীবনটা তো কেবল তোমাদের জন্যই' ...

দীপশিখা পোদ্দার

সেইসব ঘোড়াদের

আমাদের সকলের রোদ্দুর থাকে না।
আমাদের ছায়ারাও মাঝে মাঝে
সেরকম গহীন বিকেলে
একলা মনের আশেপাশে চোরকাঁটা ফেলে রেখে
চলে যায় তেপান্তরের মাঠ ছেড়ে
আরও দূর কোনও অচেনা পাথরে,
ঘুমন্ত আগুনের আঁচ শুঁকে শুঁকে দিন যায় তাহাদের।
তখন কোথায় যেন বাঁশি বাজে।
ধু ধু মাঠ দিয়ে একা একা হেঁটে যায় হাওয়া,
হাওয়া কি চোরকাঁটা তুলে ফেলতে জানে?
নইলে কেমন করে রেসের ঘোড়ার চেয়েও দৌড়ে এসে
নিয়ে যায় পরিত্যক্ত বিছানা বালিশ!
তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ রাত ঘুম থাকে
শয্যা থাকে না।
মায়া পড়ে থাকে শুধু
তার কাজল থাকে না।

অঞ্জনা সাহা

এলোমেলো

ভবঘুরে চাঁদকে বেশ রহস্যময় বলে মনে হয়
অথচ পূর্ণিমা ছাড়া তার আলোকিত শরীর
সে কোন্ মায়াজালে ঢেকে রাখে—তার হদিশ মেলা ভার!

চন্দ্রকলার কৃষ্ণপক্ষকালে
ক্রমাগত উন্মোচিত দৃশ্যাবলি দেখে মনে হয় :
প্রতিটি রাত্রিব্যেপে প্রস্ফুটিত হতে হতে
আলোর কুসুমে পরিণত হয়ে গেলে
চন্দ্রভুক রাত খুশিতে ঝলমল করে ওঠে!
চরাচরে শান্তি নেমে আসে!
নদী তার বুক ভাসিয়ে দেয় জোয়ারের জলে।
শাশ্বতকালের এই মহামিলনের খেলা
বয়ে চলে আবহমান আকাশ-সমুদ্দুরে!

জয়তী চ্যাটার্জি

পরমপ্রাপ্তি

আসলে কি চায় কেউ জানে না এই ভূমন্ডলে,
পেয়ে খুশি হওয়া টাই আসল গন্ডগোলে।
ভাবি বসে ওই পাওয়াটাই ছিল আমার সেরা,
পাইনি বলে মনে হাহাকার—
জগৎ দিশেহারা।
পেলেই পরে মনেকরি এটাই পাওয়ার ছিল,
আমার জন্য এটা কি খুব আহামরি হলো—
হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে বসি- না পাওয়ায় লিষ্টি,
হাতে নিয়ে খাতা কলম, একি অনাসৃষ্টি।
এইটা চাই, ওই টা চাই, চাই ছি সবার কাছে,
ভাবছি নাতো আমার জন্য কি বা রাখা আছে।
রইল না হয় খানিক খালি, নাই বা হল ভরা,
যে টুক্ আছে সেরা আছে মন আনন্দ করা।
ঈশ্বর আজ যা দিয়েছেন কৃপা পাওয়াই সার,
পরমপ্রাপ্তি হলেই ঘুচবে সকল অন্ধকার।

অমিত কাশ্যপ

সকাল

এক একটা সকাল কেমন অন্যরকম লাগে
একটা গল্প বলতে বলতে পাল্টে যায় যেমন
হরিমুদি দোকান খুলে বসে সকাল সকাল
হরিবাবু আবার সকাল সকাল বাজার যান
হরিস্যার সাইকেলে যান ছাত্র পড়াতে
সকাল এমন ঝমঝম করে শুরু হয়

রবিবার, রবিবার সকাল মানেই পাল্টে যাওয়া ভোর
মনে পড়ে ছোটবেলার শীতের সকাল
পিঠোপিঠি ভাইবোন অনেক, গোল হয়ে
দিনের সঙ্গে সব কেমন ছোট হয়ে গেল
রেলগাড়ির মতো পেরিয়ে যাওয়া স্টেশন
একটা সকালের পাশে আরেকটা খুলে যাচ্ছে

সিদ্ধার্থ সিংহ

বর্ষাদিন

আমাকে দেখলে ও ভাবে মুখ ফিরিয়ে নাও কেন?

আকাশে রামধনু উঠলে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে
রামধনু কাউকে বলে না—
তাকিয়ে আছ কেন গো?
পুকুরে থোকা-থোকা কচুরিপানা ফুটলে
তার ছটা সকলের নজর কাড়ে
কেউ কেউ পা ডুবিয়ে জল থেকে তুলে আনে
একটা-দুটো,
কাউকে অপছন্দ হলেও
একটু তফাতে সরে গিয়ে কখনও কচুরিপানা বলে না—
আমাকে একদম ছোঁবে না।
ঝলসে যাওয়া পৃথিবীতে যখন ঝিরঝির করে বর্ষা নামে
সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে
বর্ষা কাউকে বিমুখ করে না।

তুমি স্কুলবাসে যাও, আসো
মাঝে মাঝেই দাঁড়াও ঝুল-বারান্দায়
আমাকে দেখলে ও ভাবে মুখ ফিরিয়ে নাও কেন?

গৌতম ভরদ্বাজ

স্বেচ্ছায় কঠিন লিখি না

খুব সোজা করেই তো লিখতে চাই।
এতো সোজা সহজ সরল
তৃতীয় শ্রেণির বাচ্চা বলবে— কাকু বুঝে গেছি।
শব্দের জটিল বিন্যাস শ্লাঘার তো নয়,
বরং অনর্থক অনভিলষণীয়।

এদিকে অ-এ অজগর আসছে তেড়ে
আ-এ আমটি খাব পেড়ে— সহজপাঠ
রাম আর অযোধ্যার মতোন,
ঈ-এ ঈগল-এর পাছে ধরার দিনও নেই;
না আছে ই-এ ইঁদুর ছানার ভয়।

আজব হুল্লাহুচুং ছিরিবিত্তিরি সময়ে বসবাস।
বামপন্থীর জানা নেই ইদানীং-শোষণের
অপ্রকট মানে।
দক্ষিণপন্থীও কী জানে শোষকের
অফলন-আধিপত্য শোষণ এষণা!

আর্থ-প্রযত্ন কবি তো বিপন্ন বড়।
কোনো দিক জানা নেই, অকুল পাথার!

জোকারদের দখলে তাঁবু, পাঁচ খুঁটি।
কবি দোলে— উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমে
পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে
কট-কবালা শব্দের ট্র্যাপিজে।

রাজা রাজড়াও যত দুখি বাঘ হাতি—
কোন শর্তে পোষ মানা,
না জেনেছে তাঁরা, না তাঁদের চোদ্দপুরুষ; তাঁবুতে
ঢুকতেই কবিরা ট্র্যাপিজ ছেড়ে
সবিনয় নমস্কার অন্তে তাঁবু ছাড়ে।
রিং মাস্টার-এর অধিকারে অন্তঃস্থ
মঞ্চ গোলক তখন, তার চাবুক প্রম্পটার।
রোমহর্ষক অভিনয় শুরু হয়।
দর্শক সাধারণ, পয়সা উসুল; ঘরে ফেরে।

সোজা করেই তো লিখতে চেয়েছি অবিরত।
এতো সোজা সহজ সরল
তৃতীয় শ্রেণির বাচ্চা বলবে— কাকু বুঝে গেছি।

সংসার ভর এত আঁতকানো জটিল বিন্যাস
রবি ঠাকুর হে,
সত্যকে নেওয়া বড় কঠিন, সহজ ঝরঝরে।

সুমিত সেনগুপ্ত

খেরোর খাতা

সায়াহ্নে আলোআঁধারির কথাবার্তা শুনতে
গিয়ে বুঝতে পারি জীবন তৃষ্ণা বেড়ে চলেছে।
এই মুহূর্তের জন্য বাঁচতে বা সুখ খুঁজতে না
পেরে হয় ফিরে তাকাই বা কান পেতে শুনতে
চেষ্টা করি আগামী দিন কী বলছে?
মনের মধ্যে কি পাহাড়,সমুদ্র,নদী এসব
চিরদিন যায় থেকে না এক সময় যায় মিলিয়ে?
একটা কবিতা বরাবর দাগ টানলে, বোঝা কি
যায় ছন্দ কেটে গেলে শব্দ থাকবে কি নিয়ে?
ভালোবাসা আর মহাকাল স্থির চোখে
তাকিয়ে থাকে একে অপরের দিকে,
হিসেবের খাতা খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই হঠাৎ
ঠান্ডা হাওয়া এসে যেন বলে যায় 'অস্তিত্বের
নামতা কি নিয়ছো শিখে?'

বিপ্লব পাল

ছোটবেলা

রোদের সঙ্গে খেলছে শিশির
এক্কা দোক্কা মজার খেলা,
ভোর আকাশে উড়ছে হাওয়ায়
হারিয়ে যাওয়া ছোট্টবেলা।

আলো অনেক আলোর কণা
নোলক পরা সবুজ ঘাসে,
নানান রঙের ছোট্ট বেলা
স্মৃতির কোণে কেবল ভাসে

ভাসছে কিন্তু যায় না ধরা
ছোট্টবেলা অনেক দূর,
হাতের মুঠোয় কঠিন জীবন
গায়না পাখি আর সে সুর।

সৌমিত্র দেব

দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার

সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরুর দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার
ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামে সংখ্যালঘু মুসলমানের ওপরে হামলা হয়,
হামলাকারীরা কি জানে না
কয়েক কিলোমিটার দূরে সীমান্ত পার হলেই বাংলাদেশ!
সেখানে মুসলমানেরাই সংখ্যাগুরু।
রাতের অন্ধকারে নড়াইলের সংখ্যালঘু হিন্দুদের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিল
সহিংস বালকেরা
তারা কি বোঝে না মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে সীমান্ত পার হলেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ
সেখানে সংখ্যাগুরু এই হিন্দু সম্প্রদায়।
কক্সবাজারের রামুতে আক্রান্ত হলো সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের গ্রাম
কে না জানে মাত্র কয়েক কিলোমিটার পার হলেই মিয়ানমার
বৌদ্ধরা যে দেশের সংখ্যাগুরু।
মানুষের লোভ গ্রাস করছে একটু একটু করে তামাবিলে খাসিয়াদের পুঞ্জি
বিপন্ন হতে হতে বিলুপ্তির পথে এই সংখ্যালঘু খ্রিস্টান খাসিয়ারা
জেনে রাখুন, ডাউকি সীমান্ত পার হলেই মেঘালয় রাজ্য
মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে তারা সংখ্যাগুরু।
সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু র মাঝখানে আছে নদী,
পাহাড় আর কাঁটাতার।

আশিস চৌধুরী

ভালোইতো ছিলাম

ভালোইতো ছিলাম
সকালে বিবিধ ভারতীতে শিপ্রা বসুর গান শোনা,
কেষ্টদার দোকানের চায়ে চুমুক দেওয়া,
পাশের বাড়ির সবিতা মাসির ডালে সম্বারের গন্ধ,
দুপুরের রাস্তার একা এক ফেরিওয়ালার ডাক,
ঠেলা গাড়িতে সস্তার লাল নীল বরফ কুচি আর বুড়ির চুল,
এতেই তো ছিলাম।
স্কুল পালিয়ে প্রথম ছবি মন্থন দেখা,
পাকড়াশী বাড়ির ছোট মেয়েকে নীল শাড়িতে প্রথম দেখা,
বন্ধুদের সাথে ভিক্টোরিয়ায়
গোল হয়ে আড্ডা দেওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা,
অ্যাকাডেমিতে Group Theater-এর নাটক দেখার প্রথম
হাতেখড়ি,
এগুলো নিয়েই তো বেশ ছিলাম।
সারারাত জেগে টিকিটের অপেক্ষায় থাকা
শম্ভু মিত্রের শেষ অভিনয় "দশচক্রর" জন্য
সারারাত জেগে
ডোভার লেন music conference এ
বিবেকানন্দ পার্কে ভোরবেলায় বিসমিল্লার সানাই,
বেশ ছিলাম...
জমিয়ে ছিলাম।
এখনো আছি...
আমার মতোন করে
প্রতিদিন আমার মতোন করে...
মাঝে মাঝে এখনো ঘুমের ঘোরে
চলে যাই খালি পায়ে,
চক্রবেড়ের সেই পুরোনো পাড়ায়
দেখি আমার ফেলে আসা সময়
আমারই মতোন করে বলছে,
"কেষ্ট দা, এক ভাঁড় চা আর দুটো চারমিনার, এই টেবিলে!!!"

কৃষ্ণপদ দাস

মনে পড়ে

মনে পড়ে আজ কেন তাকে
অজানা ব্যথার সুনিপুন আলিঙ্গণে
ফিরে চাই, পিছন ফিরে চাই—
মনে পড়ে—আহাঃ কেন যে মনে পড়ে যায়।

কবে কোন্ দিন দেখেছি
তাতো মনে নেই
আজ শুধু মনে পড়ে
গভীর ব্যথার আনন্দে।

যাব চলে দূরে—বহুদূরে
ভাবি, খাঁচা-ছাড়া পাখি হয়ে
উড়ব হালকা শরীরে
ঘর বাঁধবো অনন্দ নিকেতনে।

কিন্তু কেন যে হায়—
মনে পড়ে যায়
তোমাকে, শুধু তোমাকে—
সেকথাই ভেবে দিন চলে যায়।

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

পাপ-পাপী ও ভগবান

তুমি আগুনের কথা বলেছিলে
আমি বলেছিলাম, জলের কথা
তুমি যৌবনের কথা বলেছিলে
আমি জীবনের কথা বলেছিলাম
আজ বার্দ্ধক্যের পাতায় এসে বলছ
যৌবন আর আগুন কত কিছু শোষণ করে নিল
আমাকে বোকা বানিয়ে
আমাকে আসামী করে চলে গেল

কালচক্র এর নাম
মায়া এর নাম
পিশাচীর ছায়া দেখিনি কখনও
মা বলেছিল, ছায়া নিজেকে দেখতে পায় না
পিশাচীও নিজেকে দেখতে পায় না

আজ নিজেকে বড় বেমানান লাগে
পাপ নিবারণের জন্য মন্দিরে যাই
কাঁসর ঘন্টার সাথে মিতালি স্থাপন হয়
সাত পাড়ার পাপ ও পাপীদের সাথে
মনোভাব আর মহাভাবের মিলন হয়
সকলেই ভাবি আমরা সমান সমান।
ঠাকুর সব বোঝে। তিনি বুঝেই নিয়েছেন
পাপীরাও তো আমারই সন্তান
জীবনের শেষলগ্নে এইটুকু বারান্দা রাখি যেখানে
পাপীরা নিজেদের চিনে নিতে পারে
আরেক পাপীর আয়নাতে...

মামুন রশীদ

অনুভব

আদালতে সত্য বলার অঙ্গীকারে, তুমিও তো তার
সাক্ষী তৌহিদা। তবু তুমি মিথ্যা বলো? অপেক্ষায়
রাখতে রাখতে, মুছে ফেলতে ফেলতে দাগী
অপরাধীর মতো, পালিয়ে-
এভাবে কি কেউ হারায়?

অথচ কতজনকেই আমরা মৃত্যুর আগেই মুছে
ফেলি।হয়তো অস্থির হই। তোমার স্পর্শটুকু আমাকে
আলোড়িত করে শান্ত পুকুরে হঠাৎ নড়ে ওঠা মাছের
ঘাইয়ের মতো। আমি বারেবারে, রিকশার ছুটে চলার
ভেতরে, তোমাকেই অনুভব করি।

দিশা চট্টোপাধ্যায়

পুনর্জন্ম

বেলুনটা উড়তে উড়তে
থেমে গেল জনপদের স্বরবৃত্তে।
সেই সময় স্বয়ং ঈশ্বর
নেমে এসেছিল সমতলে।
তারপরও হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে
বিষের ফণা এঁকে যাচ্ছিল সাবলীল দর্পণে!
মেঘ, রোদ, জলের বিজ্ঞাপন দেখে
শ্যাওলার স্যাঁতসেঁতে জীবনে
শুয়ে থাকে একতারার শরীর।
দিগন্তে ঘুমিয়ে পরা
অন্ধকারের আদিম ঘ্রাণে কেঁপে ওঠে।
স্বয়ম্ভু
ফুসফুস থেকে আগুন ঠিকরে আসে
শরীরে
এরপর, মানব দেহে লেগে থাকে
চাঁদের পুনর্জন্ম।

তাপস রায়

কেন যে রোজ রোজ সূর্য কাঞ্চনজঙ্ঘার পেছনে শুতে যায়

আমার ইচ্ছের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই, অনেকেই যায়
ইচ্ছের বাড়িতে থাকে ডালমুট, আমের আচার
অনেকেই ইচ্ছের বাড়িতে গিয়ে হাত-পা টান টান করে
‘ক’বাবু সে বাড়িতে গিয়ে হাঁকডাক মেলে চা খায়
পুরনো দিনের কথা কিনে নিয়ে আসে

এই সেই লুকনো রোদ্দুর, ফুলেদের মেলে দিই আমি
অনেক ভেবেছি, রোদ্দুর এই সব ফুলেদের লোভে লুকিয়েচুরিয়ে আসে
আমি কেন সেধে তার মনোরঞ্জন করতে বা যাব
দোতলার জানালায় বসে কথোপকথনরত মাধবীলতাদের
আমি আজকাল ঈর্ষা করি, আমার কথাবার্তা ক্রমেই ফুরিয়ে আসে

আমাকে ফ্রেমের ভেতর রেখে যে বা যারা মজা লোটে
পাগল হ্রদের পাশে গিয়ে বসে, দেখেছি
কেন যে অভিশাপও খরচ করতে পারি না আর ধুনুরিদের
দিকে চেয়ে থাকি, শীতকাল নিয়ে আসবে তারা
কাঠ-কুটো জ্বেলে উবু হয়ে আগুন পোহাতে বেশ লাগে

ত্রিদিবেশ চৌধুরী

আলো ছায়া

অপেক্ষায় আছি, যুগ যুগ ধরে
অপেক্ষায় আছি—কবে যে অনন্ত দুহাতে ফোয়ারা নিয়ে আমাকে ডাকবে—
অফুরন্ত কাজ নিয়ে বসে আছি—শেষনাগের বংশধরকে নিয়ে যতবার
বলি প্রভুর কথা—তারা প্রেমিকাদের কথা বলে—কোথায় পাবো তারের
মতো— উপন্যাসের ঝাঁপি খুলে বসি—দেখি আমার প্রেমিকারা - বাতাসে
মেঘলা চুল উড়িয়ে—আমাকে ডাকছে—নন্দনকাননের রাস্তায় উর্বশী-রম্ভা
আমাকে পথ দেখিয়ে আলোছায়ায় পথ দেখাচ্ছে—কে কে যাবে—

পঙ্কজ সাহা

মেঘ শতক

তুমি আর কোনোদিন ফিরে আসোনি,
এখন শিলঙের পাহাড়ের মাথায় মাথায়
মেঘ জড়িয়ে রেখেছে স্মৃতি,
পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে যৌবনের গাঢ় সবুজ,
ঝিরি ঝিরি নদীর সুবাতাসে ফিসফিস
আমরা বলেছিলাম
নুড়িপাথরের মতো সে-সব কথা,
তারপর কবে হারিয়ে গেল
আমাদের দেখাশোনার পারাপার।

আমি নদীর এপার থেকে
তোমার ছায়া ঘাটের দিকে
ভাসিয়ে দিয়েছিলাম পাতার ভেলা,
কলাবতী ফুল ছিল তাতে,
হয়তো ভুল ছিল ক্ষণিকের!

আজ পাহাড়ের ঘূর্ণিপথে
আমি এক স্মৃতি-টিলায়,
ঝরনার অশ্রু ঝরে পড়ছে
কেন পৃথিবীর এই কোণে!

ছায়া মাঠ গাছের স্নেহ
মেঘ বিন্দু বৃষ্টি শরীর
হাওয়া তির অধীর কম্পন

আমি আজ ফিরেছি চেরাপুঞ্জিতে
কারা ধার করে নিয়ে গেছে
সেই সব মেঘ,
খিলখিল যে-সব মেঘেরা
একসাথে ভিজিয়েছিল আমাদের
আজ চেরাপুঞ্জিতে উদাসীন মেঘেরা
মাথার উপরে ছাতা
একটি মেঘও
আলিঙ্গন দিল না আমাকে,
আমি নিশ্চিত জানলাম
তুমি কোনোদিন ফিরবে না।

শশাঙ্কশেখর অধিকারী

একদিন হেঁটে যাবো

একদিন হেঁটে যাবো সহস্র পদ্মের পরাগ মেখে
এই ঘুমঘোর শিশির জোৎস্নায় ফুল হয়ে
ফুটে থাকবো চন্দ্রমল্লিকার কিরণে
ঘাসের শরীর থেকে জেনে নেব সহিষ্ণুতার পাঠ
মন্দাকিনীর পূত ধারায় ধুয়ে নেব
আমার সমস্ত হৃদয়
হিমালয়ের মৌনমুখর উচ্চতায়
বোধির তপস্যায় বেজে উঠবে জীবন সংগীত
রাঙামাটির পথে একতারা হাতে
যে বাউল গাইছে নির্বাণ
আমি তার পদচিহ্ন ধরে হেঁটে যাবো
অনন্ত মুক্তির উড়ানে...

নমিতা চৌধুরী

নকশি কাঁথার লিপি

কান্না গিলেছি আমি কান্না চেটে খাই
তবু বাতাস এনেছে যাদুর ফাঁদ
কুয়াশা জড়ানো বিষণ্ণ কার্নিসে
লুকিয়ে রেখেছে চতুর্দশীর চাঁদ

ঝরিয়ে দিয়েছে বৃক্ষের যত পাতা
তির তির করে কাঁপে নিসঙ্গ হাওয়া
শোকের ভিতর নীরবে বসত করে
গোপনে গভীর মায়া

শীতের সকালে নকশি কাঁথার লিপি
কুড়িয়ে এনেছে হারানো দিনের গান
সুর টুকু শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিলে তুমি
কাছে টেনে নেয় লৌকিক আঘ্রাণ।

দেবযানী বসু কুমার

নীল

নীল নদের পশ্চিম কূলে দাঁড়িয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধ
মন বলছে প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।
ঊষা ভোরে পূর্ব গগনেরা উদ্ভাসিত
তার রক্তিম আভায় চরাচর রক্তাক্ত
নীল নদের জলে নীলের ঘনত্ব
মনে প্রশ্ন জাগায় জলের রং এত নীল এও সম্ভব?
দুপাশের শস্য ক্ষেত ফিস ফিস করে কানে— নামকরণ সার্থক তাই নীল নদ।
টাঙ্গানাইকা হ্রদে জন্ম,
তানজানিয়ায় নীল নদ তখন শিশু
তারপরেই দুরন্ত এক বালক উগান্ডায়
ছটফটে এক কিশোর
সুদানে
ইথিওপিয়ায় সুদর্শন এক যুবক
মিশরে যখন তখন প্রৌঢ়ত্ব আগুয়ান
তাতে কি? তখনও নীল নদ এক টগবগে জোয়ান
বইতে বইতে বার্ধক্য গ্রাস করে
শ্রান্ত পদক্ষেপ তখন নিঃশব্দে মিশে যায় ভূমধ্যসাগরে
নীল নদ নারী নয় বলশালী পুরুষ
তাইতো মরুভূমির মাটিতে ফসল ফলে
নীলনদ আফ্রিকা মহাদেশের জীবন রেখা
কত দেশ উপদেশের বুকের ওপর দিয়ে নীল নদ বহমান
দুহাতে আগলে রাখে নিজের সন্তান
বর্ষায় দ্বিগুণ হয়ে ভাসিয়ে দেয় চারপাশ
ফেলে রেখে যায় কালোসোনার পলিমাটি
বালি মাটিকে করে উর্বর, চারিপাশ হয় ওঠে শস্যশ্যামল
নীল নদ ইতিহাসের গল্প বলে
কত সভ্যতার উত্থান পতনের সাক্ষী
নীল জলস্রোতে কান পাতলে শোনা যায়
হাজার হাজার বছরের কথকথা
নীল নদ সৃষ্টি দেখে উল্লসিত হয়েছে বারংবার
আর অসহায়ের মত নীরবে দেখেছে নিষ্ঠুর ধ্বংসের খেলা
রাজা হয়েছে ফকির,আমআদমি শাহেনশা
নারীর জন্য সাম্রাজ্য গেছে রসাতলে
ক্ষমতার লোভে বার বার মাটি ভিজে গেছে রক্তে
আবার পত্তন হয়েছে নতুন নতুন নগরের নীল নদের দুই তীরে।।

শান্তশ্রী চৌধুরি

অনুসন্ধান

গঙ্গার জলে ভেসে যায়
অনেক মৃতদেহ
তাদের কি হয় মোক্ষ
সমুদ্রের গভীরে কত প্রাণহীন দেহ
তারা কি আবার জন্ম নেয়
এই কঠোর দেশে
নামহীন,শব
হয়নি সৎকার বিধি
তবু কি তারা জন্ম নেবে
এই পৃথিবীর কোলে
কি তাদের ধর্ম
আত্মাটা কি চলে গেছে
অতৃপ্ত হয়ে
খোলসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণ
সে তো অমর
মৃত্যু শুধু দেহটা
ফেলে গেছে
আবার গর্ভগৃহে
জন্ম নেবে নতুন রূপে
সেটা কি সত্যি
তাহলে কেন জন্ম হয়নি
চলে যাওয়া অবতাররা
সময়ত এসে গেছে
তাদের আসার
এতো গ্লানি এতো মিথ্যাচার
সুন্দর পৃথিবীটা মলিন হয়ে গেছে
অত্যাচারের আগুনে
মানুষ বাঁচতে চায়
আলোকময় জীবনে
আনন্দ লুকিয়ে আছে তারার দেশে
চাঁদটা চুপি চুপি কথা বলে
পূর্ণিমার রাতে
পৃথিবী হাসবে আবার
পাখিরা উড়বে মুক্ত আকাশে তাই তো দূরের
চিলটা দেখে অবাক বিস্ময়ে....
গুনতে থাকে দেহগুলো
প্রাণহীন গোলাপের মতন
শুধু রক্ত চারদিকে
থেমে যায় বসন্ত
প্রাণহীন গাছগুলো দেখে
অন্যায়ের আগুনে জ্বলে পুড়ে
দাঁড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি নিয়ে
নিঃশ্বাসে বিষ
ক্লান্ত আকাশ
ছড়িয়ে গেছে দূষণের হাওয়া
চারদিকে শুধু কান্না আর হাহাকার

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

মুখ তুলে চাও বৃষ্টিবাহন

মাটির বুকে তৃষ্ণা বপন
ফাটলফুটোল আঁকিবুঁকি
জ্বলছে পুড়ছে ভিতরবাহির

মানুষ এখন চাইছে রমণ
বৃষ্টি এবং এই- মাটির

মাঠ ভরানোর প্রতিশ্রুতি
সবুজ আলোর সবুজ দ্যুতি
ঝালমলাবেই জীবনযাপন

আমরা তোমার চাইছি মরণ
সেই মরণে বাঁচতে পারি, বাঁচতে পারি
জলের তিলক দাও এঁকে দাও
দাবদাহন কপালখানি

আমরা এখন চাইছি রমণ
বৃষ্টি এবং এই-যে মাটির
শেখড়ছেঁড়া তৃষ্ণা লালন
জ্বলছে ভেতর, জ্বলছে বাহির
বাড়ছে জ্বালা হাজার কাহন
মুখ তুলে চাও, মুখ তুলে চাও
মুখ তুলে চাও, বৃষ্টিবাহন.....

প্রণতি ঠাকুর

জীবন-রেডিও

জীবন রেডিও চলে নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে
মনের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ না করলে
বেসুরো বাজে সম্পর্কের সরগম।

বৃত্ত ছোট করতে শুরু করি
পরিসর বড় হলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল
ক'জন থাকুক জীবনের এই পড়ন্ত বেলায়।

খট্ খট্ খটাং খট্, তাঁতি বুনে চলে
কাপড়ের ওপর আলপনা
টানা আর পোড়েন ঠিকঠাক না হলে সরে যায় সুতো
দুটো হাতে সব্যসাচী তাঁতি সৃষ্টি করে বসন।

একজন চাই, শুধু একজন
মনের খিদে জুড়োয় যার কাছে থাকলে
নিজেকে নতুন করে দেখতে পাই তার চোখে, তার
কথায়, তার গানে,
সেই একজন এসেছিল
বলেছিল কথা-অমৃত-সমান
মন- যমুনায় তরঙ্গ উঠেছিল তার সুরে
আর একবার চাই,
শেষবারের মতো একবার।

সেবন্তী ঘোষ

শালিমার বাগ

কোনও যুদ্ধ বা উদ্যত তরবারি নয়
কোনও পাথর বা কুঠার নয়
গোলাপের গন্ধ মেরে ফেলেছে ক্রমান্বয়ে
এই পাহাড় লতাগুল্মময় বরফ চাদর
ফার্ন আর মসৃণ মসের মতো শরীর
ঢেকে দিয়ে গেছে কাঁটা ও সুগন্ধ
গোলাপের ক্ষতবিদ্ধ এই উপত্যকা
লিডারের জলে ভেজা কান্নায় মায়াময়
মেঘ আর ছায়ার নুনে জাড়ানো বিষন্ন টাগরায়,
মৃত্যুও যেন তেমন প্রার্থনীয় নয় আর—
কোন যাদু বা তিরের অব্যর্থ যোজনায় নয়
কোনো বেয়নেট ছেদনের ভল্লে নয়
মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে প্রতিবাদী
যে রক্ত গন্ধে ফুটিয়েছে ফুল
তার সুগন্ধই যেন আজ চতুর্দিকে
ডেকে গেছে স্ফীত স্পর্ধায়
কোন ছুরিকা অন্তর্ঘাত নয়
এই বৃষ্টি ও নিরাশার দেশে
বীরের সুগন্ধে আমি মাতোয়ারা
মরেছি স্রেফ বীর ভজনায়

সমুদ্র বসু

এ কোন আমি?

অদ্ভুত কুয়াশা এক, নির্লিপ্ত সুখ দুখ,
চেনা অচেনার ভিড়ে আবছায়া মুখ।

অন্তর্জালে মিশে থাকি, সীমাহীন ঠায়,
ঘুচে যায় বাস্তব, সাজানো মিথ্যার মহিমায়।

অনুভূতিগুলো ভোঁতা আজ, নেই কোনো উত্তাপ,
দিন রাত্তির সকাল সন্ধ্যে ইঁদুর দৌড়ে দিই আমি ঝাঁপ।

বিষাদগাথা, গল্পকথা, আলো আঁধারির গলি,
ভিড়ের মধ্যেও একাকী আমি মরীচিকার পিছে চলি।

ক্রমে টেনে নেয়, গিলে খায় শেষে সাজানো চোরাবালি,
আমি নেই আমিতে, মিশে গেছি স্রোতে, সবটা আজ খালি।

এভাবেই কাটে, সময় যায়, তাসের ঘরেই আছি,
মিথ্যে জেনেও, বাস্তব ভুলে, মিথ্যে আঁকড়েই বাঁচি।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

অলীক অক্ষপথ

কবিতা, যদি এমন হত! তোমার অক্ষরের দীপ্র
আলোয় থমকে যেত ধেয়ে আসা ধুমকেতু! কবিতা যদি
এমন হত! তোমার বোধের তীব্র অহংকারে যাবতীয়
আবর্তন ভেঙে স্তব্ধ হত ঘূর্ণনক্লান্ত অসময়ের
স্রোত?কবিতা যদি এমন হত! তোমার পদ্যছন্দে বাজত
গদ্যময় যাবতীয় রিক্ত যাপনের খেদ? প্রতিটি খিদের
প্লেটে শুভ্রজুঁই ফুল ভাত! ফুটপাথের কালো হাতগুলোয়
শ্লেটমুছে যেত স্থবির জীবনের রোগশোকরাতজাগা
মেয়েটার চোখে স্বপ্নরঙিন শুর্মা তবে ক্ষুব্ধদিনের যাবতীয়
অভিযোগ ভেসে যেত এক অলীক অক্ষপথে...

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দ

বাংলার ভাষা থেকে রোজই আমি দুচারটে শব্দ নিই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে
এই যে কবিতা লিখি
জলে ও পাথরে শিখি,
ভাবি, দেখি, দুঃখ পাই—
দিন মাস বছরের ঢেউয়ে পারহীন ভেসে চলে যাই।

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

একটা জীবন

একটাই জীবন আমার
দেখি পাখি একা ওড়ে, দিগন্তে হারায়
হলুদ পালক খসে, ভাসে নদীজলে

তোমার ঘুমের মধ্যে চলে যাবো জেনো একদিন

শোক বলে কিছু নেই, ক্ষত ব্যর্থ প্রেমের কবিতা!

ঘরবাড়ি

অলৌকিক কিছু একটা ঘটছে জীবনে!
দরজায় টোকা দিলো অন্যমনে কেউ
অর্গল খুলেছি, দেখি, তুমি নও, চাঁদ
হেমন্তের রাতে এসে বলছে আমাকে

যে গেছে সে যাক, যদি ফেরে কোনোদিন

ঘরবাড়ি রেখো রম্য কবিতার মতো!

স্বপন শর্মা

দেখা সিরিজের কবিতা— ২৩

তৃতীয় চোখ দেখে
জীবন থেকে জীবনের বিয়োগ
আধার ও আধেয় শূন্য
তবু রয়ে গেছে এক আড়ালগামী বিধ্বস্ত পথ।

হৃদয় কাঁপে বৃষ্টির শব্দে
বন্দি সময় নাচে
শব্দদের রতির ফলে
নিরালা বেজে ওঠে শিশুর প্রথম কান্নায়।

প্রশ্ন যেমন উত্তর চায়
অন্ধকার আলো, মোহ শেষে নির্মোহ
বিস্ময়ে ভরা ব্যর্থ আড়ালের জন্য
এক ব্যাকুল পথ।

ব্যস্ত পথ আজও শোনে
হারানো অতীতের ঝুমঝুম
যার হৃত লয়ে হেঁটে যায়
আজও এক নেশাতুর।

দেখার তৃপ্তিতে আজ তৃতীয় চোখেও জল
চিরপিপাসিত ভাবে দেখা তবে কি সফল?

হারিসুল হক

যা জমিয়েছিলাম

এক্কাদোক্কা খেলেছিলাম তোমার উঠোনে
দৃষ্টিহারা ওষ্ঠ এখন স্মৃতি চয়নে

তুমি আমি দু'জন তখন নকল ইশ্‌কুলে
সময়গুলো নিচ্ছি সেঁকে ভাঁটের আগুনে
নিখোঁজ হবার জুতোজোড়া মেঘের কাবার্ডে
লুকিয়ে রেখে শান্ত হতাম নিদাঘ বৈশাখে

চোখের খেলায় মেতেছিলাম সে কোন মৌসুমে

এখন আমার পা বেড়েছে উঠোন ছড়াছড়ি
খেলার আসর পাল্টে গেছে বন্যতাড়াতাড়ি

নষ্টনদীর কিনার ঘেঁষে ধুঁয়ো ওঠা গ্রাম
লোপাট করে নিল আমার যা জমিয়েছিলাম

পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়

পোষা টিয়া

বাড়ির আদুরে মেয়ের পোষা টিয়া
মেলা থেকে কেনা খাঁচা সমেত।

টিয়া খাঁচায় বসে দোল খায়
সারাদিন শোনে মানুষগুলোর
ক্লান্তিহীন অযথা বকবকানি।
মাঝে মধ্যে এক আধটা শব্দ
তার ভারি পছন্দ হয়
সে তখন সেটা বারবার বলে।

কখনও কখনও অতিষ্ঠ হয়ে
সে ডানা ঝাপটায়।
এইটুকু খাঁচায় বড্ড স্থানাভাব।
তখন সে শুধু ক্যাঁ ক্যাঁ করে।
তার ডাক পৌঁছবে না সঙ্গিনীর কাছে।
আকাশের দিকে চায়
দলের বাকিরা কোথায়?
এরকমই নিয়ম।
কেউ ধরা পড়লেও বাকিরা উড়ে যাবে
প্রজাতি বাঁচাবে।
তার সঙ্গিনী কি এখন
অন্য টিয়ার সঙ্গে জোড় বাঁধা?
নাকি সেও পড়েছে ধরা জালে?
অন্য কোনো ঘরে আটকে সেও?

টিয়া তার মুখ গুঁজে দেয় ডানার আড়ালে।
তাতে কি রক্ষা আছে নাকি?
বাড়ির আদুরে মেয়ে খোঁচায় তাকে।
সে বুঝতে পারে তাকে এবার বলতে হবে
ওদের প্রিয় শব্দ ক'টি—
'এই ছুটকি কোথায় গেলি?'
ছুটকি হাততালি দিয়ে হাসে।
বুঝতে পারে না তার পোষা টিয়া
মনে মনে কাঁদছে তখন।

সুজিত ভৌমিক

মন্ত্র

দূরে চলে যায় যে পৃথিবী
কাছে এনে তার সাথে সখ্য বাড়াই,
কাছের পৃথিবী পাশেই আছে
দূরের পৃথিবীও কাছেই আসুক।
টেনে ধরি, কাছে আনি শূন্য পৃথিবী
কাছে টেনে ধরি আপন জগৎ
শূন্য থেকে মহাশূন্য দেখি
চোখ রাখি সেই মহাশূন্যেই।

অনেক ওপরে অনেকখানি
ঘোর কেটে যায় হঠাৎ হঠাৎ
এক হয় তবু দুই পৃথিবী
দুই স্বপ্নও এক হয়ে যায়।
রাতের স্বপ্নে সব দেখাদেখি
সুন্দর পৃথিবী, আরও সুন্দর হয়
সুন্দর জীবন, আরও সুন্দর হোক
সুন্দর হোক হাত ধরাধরি
সুন্দর হোক সবার জীবন।

তপনদেব চট্টোপাধ্যায়

পরিস্থিতির শিকার

ভাবছো তুমি এসব কথা
বলছি—
কেমন করে নিজেই যখন
টলছি।
এ কথা ঠিক এমনি করেই
চলছে,
দুনিয়াটা সবসময়েই
টলছে।
কেউই তো নয় নিজের পায়ে
শক্ত,
সবাই এখন অন্যায়েরই
ভক্ত।
চায়নাতো আর কোন কিছুই
মানতে,
ব্যস্ত সদাই ঝোলটা কোলে
টানতে।
দুর্নীতিতে নাইকো কারো
বিকার,
আমরা এখন পরিস্থিতির
শিকার।

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

২০২২, অন্ধকার

আমি আমার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি
মাঝে মাঝে পথ ভুল হয়ে যায়, দুর্দান্ত সব ঢালাই মেশিন
মগজ ডুবে যায়,, খুব ভয় লাগে আর মুহূর্তরা শেষ হয়ে যাচ্ছে ভেবে
ধুকপুক বেড়ে যায়। এরপর কী হতে পারে?
এরপর তুমি গড়িয়াহাটের শেষ ব্রিজ ধরতে পারো
আমি গল্পের মাঝখানে কবিতাকে চুমু খেতে পারি
আমাদের কিছু করার নেই। যা হবার হবে। শিরদাঁড়ায় পোকা নাচবে
বাবা বাজারের ব্যাগে ভুল করে ব্রহ্মান্ড রেখে দেবে, মা বকাবকি করবে
এরপর খুব অন্ধকারে দীপাবলী হবে, আমরা ভূত তাড়ানোর চেষ্টা করব

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

তোমার জন্য

হৃদয় নিয়ে বসে আছি
বিলিয়ে দিতে চাই
কে নিবিগো আয়না ছুটে
কোন নিষেধ নাই।
হৃদয় দিলে যায় যে পাওয়া
আরেকটা হৃদয়
তাইতো আমি বসে আছি
নিয়ে মুক্ত হৃদয়।
আগল আমার খুলে গিয়েছে
অনেক আগে
জানি না হয়তো কেবা
আমার জন্য রাত্রি জাগে
পারবো না আর থাকতে বসে
এমন করে
মনটা আমার বিপর্যস্ত
শুধু তারই তরে।
দিনের শেষে অন্ধকার
আসলো নেমে
নিদ্রাবিহীন রাতের পরে
নতুন আশা জাগলো মনে।
আশা প্রায় হারিয়ে ছিলাম
তোমায় ফিরে পাওয়ার
নতুন একটা সকাল হয়ে
ফিরে এলে তুমি এবার।
আমার মনের সব কিছুই
তোমায় ঘিরে
তোমার আসা আমার ঘরে
আলো হয়ে পড়লো ঝরে।

কিশোর ভট্টাচার্য

ফিরবো তোমার দেশে

সেই কতদিন আগে দুজনে হেঁটে ছিলাম
সেদিন শিশির ভেজা রাত্রি ছিল।
মাথার উপর ম্লান চাঁদের আলো
দুজন দুজনের কাছাকাছি
আনন্দের জোয়ার শিরায় শিরায়
বাস্তবতা ভুলে কল্পনার ঘন জালে স্বপ্নেরা হেঁটেছিল
অন্ধকারের বুক চিরে হাতে হাত রেখে
হেঁটে চলেছি অনেকটা পথ
সময় অল্প হলেও নিয়েছি অমৃতের স্বাদ
শ্যাওলা ধরা প্রতিদিনের জীবন
কারখানার ঘোলাটে স্বপ্ন।
সময় অসময়ে অতিথির আগমন
আজকাল হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ
সেই প্রাণের টানে বারবার ছুটে আসা
এ পথ বারবার কাছে টানে
কানে কানে বনবাণীর শপথ আসে
এই মাটি, এই পথ, এই নির্জনতা হোক শেষ ঠিকানা।
এখানকার আকাশ, বাতাস প্রমাণ দেয়
শেষ হয়নি বেলাশেষের গান।
প্রাণের মানুষ, আপনজন সে আছে সীমাহীন অপেক্ষায়
গুলঞ্চফুলের গন্ধ মেখে কাছে টানার আমন্ত্রণ।
উষ্ণ বুকে মাথা রেখে শান্তি আসে কিছুক্ষণ।
সে আছে, সে থাকুক সারাজীবন
দিনরাত্রি সোনালি আলোয় বিভোর থাক
এই ভাবেই সময় অসময়ে হেঁটে চলি সোনাঝুরির পথে
অপেক্ষায় থেকো তারাভরা আকাশের তলায়
সময় হলে অবশ্যই ফেরা হবে তোমার দেশে।

অচিন মিত্র

আজকে নদীর কাছে মৃদু জোছনায়

অনেক দিনের পরে
আজকে নদীর কাছে মৃদু জোছনায়
উপত্যকার প্রান্তরে
ঘাসের মলাট ঢাকা পথটি ঘুমায়

বকুল ছিল পথের বৃষ্টিস্রোতে
গন্ধ বিলীয়মান
পথভোলা ঠিক পথটি খোঁজার ব্রতে
গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘে স্নান

অনেক দিনের পরে
আজকে আবার সেই সরণি সাজানো
বাঁশি বাজে গাঢ় স্বরে
কেন দেবী তুমি জানো?

সপ্তর্ষি চ্যাটার্জি

শীতঘুম

ধুলোর ভিতর উড়ছে আমার সাবেককালীন ক্ষত,
তাদের দিকে চাইছি ইতস্তত;

বুকের নদী হারাচ্ছে স্রোত, জাগছে নতুন চরা,
আবার সেসব ক্লান্ত ওঠা-পড়া।

দেখছি সবই, দেখছি না তাও কিছুই তেমন ক'রে,
স্মৃতিও যেমন অনন্তকাল পোড়ে;

সে উত্তাপের রেশ লেগেছে মনখারাপের গায়ে,
কাঁটার মত রুক্ষতা জাগায়।

মাটির তলায় লুকিয়ে রাখি জীবন্মৃত আবেগ,
বরফচাপা অশ্রুবারির মেঘ।

শীতঘুমে সব ইচ্ছেমিছিল সরীসৃপের মত,
প্রাচীন খোলস ফেলছে ছুঁড়ে যত।

বুবুসীমা চট্টোপাধ্যায়

একুশের কবিতা

আমার একুশের কবিতা মানেই মা'য়ের পলাশ পলাশ মুখ। সাদামাঠা মা আমাদের, পরনে সবুজ ধনেখালি, আদিগন্ত ফসলের মাঠ আর অশোক রঙের পাড়! আঁচলে যেন শিমুলে শিমুলে শহিদের রক্তে আঁকা নানা রঙের বর্ণমালা। মায়ের হাসিতে, এমনকি কান্নাতেও কখনও অন্য কোনো ভাষা পড়িনি, পদ্মের পাপড়ির হয়ে ঝরে পড়তো ওপার বাংলা, এপার বাংলা। আবার রাঢ় বাংলার রুক্ষভূমির
পলাশের মত ফুটে উঠতো মানভূম,
আমার মাতৃভাষা। আমি বলতাম "মা তুমি হাসলে, তুমি তাকালে,তুমি ধীর পায়ে এ ঘর থেকে ও ঘর গেলেও কত কথা নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়.."
মা বলতেন,"তোরা বলিস 'একুশে ফেব্রুয়ারি'
আমি বলি 'আটই ফাগুন'! পলাশে আর শিমুলে—রফিক, সালাম,শফিক, বরকতদের রক্তে রক্তে ভেসে যাওয়ার দিন।" আমি বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখতাম মায়ের মুখে বর্ণমালা'র ছবি,
আমি দু'হাত বাড়াতে গিয়ে দেখি বুকে এসে লগ্ন হয়ে গেছে আমার বাংলাভাষা। আমার গরবিনী বর্ণমালা'র প্রতিটি উচ্চারণে আমার মাতৃভাষা, আমার বুকের ভাষা,আমার মুখের ভাষা।

মুহাম্মদ সামাদ
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে

একাত্তরে ৭ই মার্চে রেসকোর্স
বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ—
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
বীর বাঙালি শপথ করে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে।

বটতলায়, বত্রিশে, পল্টনে বাড়ির ছাদে,
কারখানাতে, ক্ষেতের আলে
লাঠির আগায় হাতে হাতে—
স্বাধীনতার নিশান ওড়ে।

পঁচিশে মার্চ কালরাতে
ঝাঁকে ঝাঁকে নামে কনভয়
ঘুমন্ত মানুষ কেঁপে ওঠে!
এ যেনো খুনের নেশার
যমদূতের হিংস্র কড়া নাড়া।
নবজাতকের আর্তনাদে
হায়, স্তব্ধ হয়ে যায় পাড়া!
লেলিহান শিখায় শহর বস্তি
ছাত্রাবাস যায় পুড়ে।

আহা, আমার সবুজ দেশে
হলোকাস্ট বা ভিয়েতনাম আজ
গণহত্যার উপমা হয়! তবু নেই ভয়—
কৃষক শ্রমিক জনতার সংগ্রামে
প্রতিরোধ জাগে–প্রতিরোধ দেশময়।

পাখির পাখার হাওয়ায় হাওয়ায়
গাঁয়ে গঞ্জে মাটিতে পাহাড়ে
পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে
ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে
উত্থাল ঢেউয়ে সারা দেশ

শেখ মুজিবের ডাক আসে।
মুক্তি পাগল ভাইরে আমার
মুক্তি পাগল বোনেরা আমার
এক হও জোট বাঁধো
কণ্ঠে তোলো জয় বাংলা
হাতে নাও যার যা আছে—
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
জয় বাংলা স্বাধীন করো।

সেই বসন্তে ঝরাপাতায়
রোদ জলে দিনে রাতে
অস্ত্র কাঁধে অস্ত্র হাতে
মুক্তিযুদ্ধ ছুটে আসে।

মুজিবনগর আমবাগানে
ইতিহাসের নতুন পথে
স্বাধীনতার সোনার রথে
পলাশীর সেই রক্ত–শপথ
সারা বাংলায়– সারা বিশ্বে
ডাক দিয়ে যায় প্রাণে প্রাণে।

পথে ঘাটে বন বাদাড়ে
নদীর বুকে ঝড় বাদলে
বাংলা মায়ের রুদ্র মেয়ে
জীবন দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে
গুলি বন্দুক গ্রেনেড ছুড়ে
যুদ্ধ করে... যুদ্ধ করে...
বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে মুক্ত দেশে
রক্তমাখা পুব আকাশে
আলোয় আলোয় স্বপ্ন ফোটে
ঘাসে গাছে ফুলে ফুলে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে।।